মা আনন্দময়ী

VOL. 1 JANUARY 1997 No. 1

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P.
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, Gujarat
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009
U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road,
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P.
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel:426575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P.
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী--অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ–১ জানুয়ারী, ১৯৯৭ সংখ্যা–১

সম্পাদক মণ্ডল

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারতে–৬০/- টাকা
বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা
প্রতি সংখ্যা –২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

★ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে । পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয় ।

★ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য । অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে । নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে ।

★ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক । কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক ।

★ বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্নলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম ঃ
Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c

★ পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে–

Managing Editor,
Ma Anandamayee—Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221001

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ–
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা––২০০০/- বাৎসরিক ।
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা –– ১০০০ বাৎসরিক ।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী–২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী–১০ হইতে মুদ্রিত । সম্পাদক–শ্রী পানু ব্রহ্মচারী ।

বিষয় সূচী

মাতৃ বাণী

সংকলক - চিত্রা ঘোষ

"আনন্দময়ী মা" কে ? আনন্দময়ই বা কে ? তিনিই ঘটে, পটে, সর্ব্ব হৃদয়ে, নিত্য বিরাজিত। সর্ব্বত্রই তাঁর বাস, তাঁকে দেখলে, তাঁকে পেলেই সব দেখা যায় সব পাওয়া যায় অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় হওয়া যায়।

● ● ●

কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা হতে আসে ? এই শরীরটার কাছে তো আসা যাওয়া নাই। তখনো যা এখনো তা। মরা বাঁচা আবার কী ? মারা গিয়েও যে আবার তাঁরই মধ্যে।

● ● ●

সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ নিয়া ২৪ ঘন্টা কাটাবার চেষ্টা তিনি কখন কোন অনুভবরূপে, কোন ভাবে কি আকারে — তাঁহার জন্যই উন্মুখতা — চোখের জল রূপেও তিনিই স্পর্শ দ্যান।

● ● ●

মায়ের নাম করা — মায়ের ধ্যান করা — মাকেই সর্ব্বময় দেখতে চেষ্টা করা। মা-ময় হওয়ারই দিক্ নেওয়া।

● ● ●

ভগবানকে ভালবাসতে পারলে আর দুঃখ নেই। তাঁর জন্য যে বিরহ তা - সুখই। বিরহ মানে কী ? ভগবান যার মধ্যে বিশেষভাবে রহেন — তারই বিরহ হতে পারে।

● ● ●

যে শক্তি সঞ্চারিত হলে দীক্ষা — সেই শক্তি সঞ্চারিত হলেই হলো। গুরু-শক্তির প্রকাশটা স্বপ্নেই হোক্ বা বাহ্যেই হোক, ভিতরে খাঁটী প্রকাশ হ'লে তখন আর বাইরের অভাব থাকে না।

● ● ●

জপ করে অর্পণ করতে হয় অর্পণের মন্ত্র গুরু বলে দ্যান। এ অর্পণ না করে যদি নিজের কাছেই রাখা হয় — ভাল জিনিষের বোধ না থাকায় তার দ্বারা সেই জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। নিজের কাছে রাখলেও কতকটা ফল হবে। তবে রক্ষার পূর্ণাঙ্গীন ফল পাবে না।

সাধু ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণীদের পরচর্চা, পরনিন্দা, হাল্কা কথা, গল্প, হাসি ঠাট্টা একেবারে বর্জ্জন। সদ গ্রন্থাদি ব্যতীত জাগতিক নভেল গল্পাদির মাসিক বা বার্ষিক পুস্তকাদি পড়া একেবারেই নিষেধ। ইহাতে সাধন পথের বিঘ্নাদি দেখা যায়।

● ● ●

সাধু জীবন যাহাদের তাহাদের ঠাকুরের ভোগের বাসন ও নিজেদের বাসন মাজা ইহা সর্ব্বদাই চলিতে পারে। ঠাকুর সেবার কাজ, বাজার করা, রান্না করা, বাসন মাজা, তরকারী কাটা, সব যে হাসিমুখে করিতে পারে, তাহার স্বাস্থ্য ও মন দুই ভাল থাকে। ঠাকুর সেবার কাজে চিত্ত শুদ্ধ হয়:

● ● ●

২৪ ঘণ্টা রুটীন মাফিক বাঁধিয়া লইলে সাধু জীবনে মনটা কলুষিত চিন্তা করিবার সময় পায় না। রাগ, অভিমান, এসব এ পথের অনুকূল নয়। স্বচ্ছলতা তো গৃহস্থাশ্রমে তোমাদের অনেকেরই ছিল। অভাবের ভিতর দিয়াই ভগবানের উপর নির্ভরতা আসে। লক্ষ্মী ছেলেদের মতন ভগবৎ ভাব নিয়া দিবারাত্র কাটাইলে তো আনন্দের কথা।

● ● ●

শ্রীশ্রী মার বিজয়ার বাণী—

নিজলক্ষ্যে জয়যুক্ত হ'বার জন্য সব সময় বিজয় প্রার্থনা হওয়া।

■

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

—শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

গল্পের সাহায্যে তত্ত্বোপদেশ

২৪ শে কার্ত্তিক, রবিবার

আজও সকাল বেলা ছয় অধ্যায় গীতা পাঠ হইল এবং বিকাল বেলা গোপালদাদা কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। রাত্রি ৭।। টার সময় যখন আশ্রমের হলঘরে গেলাম তখন ঐখানে একজন পাঞ্জাবী সাধুকে দেখিতে পাইলাম। একটু পরেই মা হলঘরে আসিলেন। মা আসিয়া সাধুকে বলিলেন, "পিতাজীর কথামৃত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।" এমনভাবে মা আবদার করিয়া কথা বলেন যাহা শুনিয়া লোকে ঐ কথানুসারে কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না। মায়ের কথা শুনিয়া সাধুটি কলিযুগে ভগবানের নাম কীর্ত্তনই যে একমাত্র সাধনা এই সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, "কলিযুগে লোকের পরমায়ু স্বল্প, বড় জোর ১০০ বৎসর। ইহার অর্দ্ধেক সময় রাত্রি বলিয়া ৫০ বৎসর লোকের নিদ্রাতেই কাটিয়া যায়। বাকী যে ৫০ বৎসর থাকে উহার অর্দ্ধ বাল্যকাল এবং বার্দ্ধক্য গ্রাস করিয়া বসে। সে সময় সাধন ভজন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ ১২।। বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগরিতই হয় না। কাজেই ঐ অবস্থায় সাধন ভজন সম্ভব হইবে কি প্রকারে? বৃদ্ধ বয়সে অর্থাৎ ৮৭/৮৮ বৎসর বয়সে লোকে নিজ দেহ লইয়াই বিব্রত। তখনও সাধন ভজনের সামর্থ্য থাকে না। বাকী রহিল মাত্র ২৫ বৎসর, কিন্তু ইহার মধ্যেও রোগশোকের আক্রমণ আছে। ভোগ তৃষ্ণা আছে। কাজেই কলিযুগে যাগযজ্ঞ তপস্যার সময় কোথায়? সেইজন্য বলা হইয়াছে ভগবানের নামকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম এবং ইহার দ্বারা লোকে দিব্য জীবন লাভ করিয়া থাকে।" এই প্রসঙ্গে তিনি একটি গল্প বলিলেন। তিনি বলিলেন, গুজরাটে এক ধনী শেঠ ছিলেন। কিছুদিন পর তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। ভগবানের নাম করিবার মানসে তিনি গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া সংসার ত্যাগের মনস্থ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার অনুগামিনী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে এখন তিনি ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে-দেশে ভগবানের নাম করিয়া বেড়াইবেন। কাজেই এ অবস্থায় তাঁহার স্ত্রী যদি তাঁহার অনুগামিনী হয় তবে তিনি কেবল কষ্টই ভোগ করিবেন। তা'র চেয়ে গৃহে থাকিয়া তাঁহার পক্ষে সুখ ভোগ করাই শ্রেয়। কিন্তু স্ত্রী বলিলেন যে, স্বামীকে ছাড়িয়া তিনি সংসারে কোন সুখই পাইবেন না। স্বামীর অনুগমন করাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। তখন শেঠজী স্ত্রীকে লইয়া সংসার হইতে বাহির হইলেন এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়া তিনি নানাস্থানে ভগবানের নাম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে গমন করিতে লাগিলেন সেইখানেই লোকদিগকে একা বা সঙ্ঘ বদ্ধ ভাবে নাম লইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেকেরই নামে রুচি জন্মিতে লাগিল।

একদিন তিনি নাম করিতে করিতে চলিয়াছেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন এক সুন্দরী যুবতী মাথায় জলের কলসী লইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার এই কমনীয় রূপ দেখা যাইতেছে, তুমি কি ভগবানের নামকে তোমার সঙ্গী করিয়াছ?" যুবতী ঐ দেশের সংস্কারানুসারে উত্তর করিল, "আমি ত আর বিধবা নই যে আমি ভগবানের নাম লইব? আমার স্বামী বর্তমান। তিনিই আমার সব।" ইহা শুনিয়া শেঠজী বলিলেন, "স্বামীর বর্তমানে যদি তোমার ভগবানের নাম লওয়ার অন্তরায় হইয়া থাকে তবে আমি উহা দূর করিয়া দিতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। এই বলিয়া শেঠজী ভগবানের নাম গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে যুবতী গৃহে আসিয়া দেখে যে তাহার স্বামীর জীবনান্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিল। ঐ চিৎকার শুনিয়া অন্যান্য লোকজনও আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ যুবতীকে শেঠজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া ছিল। তাহারা তখন পরামর্শ করিল যে সাধুর শাপে যখন এই ব্যক্তির প্রাণান্ত হইয়াছে তখন ইহাকে লইয়া সাধুর কাছে গিয়া যদি প্রাণদানের জন্য প্রার্থনা করা যায় তবে ফল হইতে পারে। এই মনে করিয়া সকলে মিলিয়া ঐ মৃত দেহ লইয়া শেঠজীর কাছে গেল। এই সংবাদ পাইয়া আরও অনেক লোক ঐখানে গিয়া জড় হইল। যখন সকলে মিলিয়া সাধুকে বলিল যে তাঁহার শাপেই এই ব্যক্তির প্রাণান্ত হইয়াছে এবং তিনি দয়া করিয়া ইহার প্রাণদান করুন। তখন সাধু বলিলেন, "আমি ত ইহাকে কোন শাপ দেই নাই। স্ত্রীলোকটি যখন আমাকে বলিয়া ছিল যে স্বামী বর্তমানে সে কখনও ভগবানের নাম করিতে পারিবে না, তখন আমি ভগবানের নিকট তাহার এই অন্তরায় দূর করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। আচ্ছা, এই যুবতী যদি প্রতিজ্ঞা করে এবং তোমরাও যদি প্রতিজ্ঞা কর যে তোমরা আজ হইতে সকলেই ভগবানের নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিবে, তবে যাহাতে এই মৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করিতে পারে সে চেষ্টা আমি করিয়া দেখিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি সকলকে ঐ মৃতদেহের চতুর্দিকে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন এবং নিজেও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্, আমি ত শাপ দিয়া ইহার প্রাণ নাশ করি নাই। সকলে যাহাতে নির্বিঘ্নে নাম করিতে পারে এই সুবিধাই আমি তোমাকে করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তোমার নামের গুণে মৃত ব্যক্তি যে জীবন লাভ করে ইহাত আমার জানা আছে। তাই তুমি এই মৃত ব্যক্তির প্রাণসঞ্চার করিয়া দাও।" এই বলিয়া সাধু ঐ মৃত ব্যক্তির গায়ে কিছু জল ছিটাইয়া দিলেন। উহার ফলে মৃত দেহে প্রাণ আসিল এবং লোকটি উঠিয়া বসিল। সে নিজকে এক নূতন স্থানে অপরিচিত লোক দ্বারা পরিবৃত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তখন সকলে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে তাহার দেহত্যাগ হইয়া গিয়াছিল এবং এই সাধুই ভগবানের নাম করিয়া তাহার প্রাণদান করিয়াছেন।

তাই দেখা যায় যে কলিতে নামকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম এবং উহাই জীবন স্বরূপ।

সাধুর এই ভাষণ শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। মা একটি পশ্চিমী মহিলাকে দেখাইয়া

বলিলেন, "এ আজ সকালে আমাকে বলিয়া ছিল, মাতাজী তুমি যদি হিন্দীতে কথা বল তবে আমরা সকলেই বুঝিতে পারি।" তখন আমি উহাকে বলিয়াছিলাম, "এখন এখানে সব বাঙ্গালী বাবুরা উপস্থিত কাজেই এখন হিন্দীতে কথা বলা হইবে না।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খেয়ালে আসিয়াছিল যে যদি কোন পশ্চিমী সাধু আসেন তবে তাঁহাকে কিছু বলিতে বলিব। সন্ধ্যাবেলা দেখি যে এই বাবাজী আসিয়া উপস্থিত। বাবাজী আমার সহিত দেখা করিয়াই বিদায় হইতে চাহিয়া ছিল। তখন আমি বলিয়াছিলাম, "পিতাজী একটু বসিবে না? আমরা তোমার কথামৃত শুনিতে চাই।" তা'ই পিতাজীর নিকট এই সব সুন্দর সুন্দর কথা শুনা গেল।

এমন সময় কে যেন বলিল, "মা, তুমি নাকি গল্প বলিতে চাহিয়াছিলে, তাহা এখনই বল না!" মা বলিলেন, "উহা ত হাসির গল্প। উহা কি এখন বলিব?" সকলে উহা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় মা বলিলেন, "আচ্ছা তবে বলি; কিন্তু উহার পূর্ব্বে আরও একটি গল্পের বিষয় খেয়ালে আসিতেছে উহা বলিয়া পরে ঐ হাসির গল্প বলিব। এ দেহ একবার যখন পাঞ্জাবে হরিবাবার সঙ্গে ছিল, হরিবাবার দলের লোক একটা লীলা করিয়া দেখাইয়া ছিল। সেই লীলার গল্পটি এই—

এক শেঠ ছিল। তাহার এক মাত্র পুত্র। (সাধুকে দেখাইয়া) পিতাজী এক শেঠের গল্প বলিল না? তাই এই গল্প খেয়ালে আসিয়া পড়িয়াছে। শেঠজী তাহার পুত্রের বিবাহও দিয়াছিল। শেঠ নিজে সৎসঙ্গ করিত না এবং তাহার ছেলে যে কোন সৎসঙ্গ করে তাহাও পছন্দ করিত না। এদিকে ছেলেটির ধর্ম্মের দিকে একটু ঝোঁক ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া এক মহাত্মার কাছে যাতায়াত করিত। একদিন সে মহাত্মাকে বলিল, "আপনার কাছে আসিতে এবং থাকিতে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু আমার বাবা যদি ইহা জানিতে পারেন তবে তিনি আমার এখানে আসা বন্ধ করিয়া দিবেন।" মহাত্মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসার তোমার কেমন লাগে?" সে উত্তর করিল, "সংসার ত ভালই লাগে, কারণ সেখানে সকলেই আমাকে খুব আদর করে, কিন্তু উহার চেয়ে আপনার এখানেই আমার বেশী ভাল লাগে।" মহাত্মা বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমাকে একটি প্রাণায়াম শিক্ষা দিতেছি যাহার সাহায্যে সংসার তোমাকে কেমন ভাল বাসে তাহা জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া মহাত্মা তাহাকে যোগের এক প্রক্রিয়া শিক্ষা দিলেন যাহা করিলে দেহটি মৃতের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞান সম্পূর্ণই থাকে। তিনি যুবককে গৃহে গিয়া এই যোগক্রিয়া করিতে বলিলেন। তদনুসারে যুবকটি গৃহে ফিরিয়া গিয়া একদিন এই যোগক্রিয়া আরম্ভ করিল যাহার ফলে তাহার দেহখানি মৃতের মত মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া বাড়ীর সকলেই মনে করিল যে ছেলের বোধ হয় কোন গুরুতর অসুখ হইয়াছে। তখন তাহারা ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিল যে ছেলেটির দেহান্ত হইয়াছে। তখন বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। ঐ শব্দ শুনিয়া অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হঠাৎ একজন সবল, সুস্থকায় লোকের দেহান্ত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

যখন বাড়ীতে ঐভাবে কান্নাকাটি চলিতে ছিল তখন ঐ মহাত্মা ঐ বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া কেহ কেহ গিয়া তাঁহাকে বলিল যে তিনি যেন দয়া করিয়া একবার ঐ ছেলেটিকে দেখিয়া যান। তাহাদের বিশ্বাস যে মহাত্মা ইচ্ছা করিলেই ছেলেটির প্রাণদান করিতে পারিবেন। এই সকল লোকের অনুরোধে মহাত্মা শেঠজীর বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শেঠজী প্রভৃতি তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলেন এবং তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে যদি ঐ ছেলেটির প্রাণ রক্ষা হয় সে ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তাহাদের এই কথা শুনিয়া মহাত্মা তাহাদিগকে এক গ্লাস দুধ আনিতে বলিলেন এবং ঐ দুধ মন্ত্রপূত করিয়া ছেলেটির চারিদিকে ঘুরাইয়া বলিলেন, "এই দুধ যিনি পান করিবেন তাহারই মৃত্যু হইবে, কিন্তু ছেলেটি ইহার ফলে বাঁচিয়া উঠিবে।" এই বলিয়া তিনি শেঠজীর নিকট ঐ গ্লাস ধরিলেন। শেঠজী তখন বলিলেন, "যাহা হইবার তাহাত হইয়া গিয়াছে। আমি প্রাণ দিলেই যে ছেলে প্রাণ পাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? আর আমি মরিলে এই সব বিধবাদেরই বা কে দেখিবে?" এই বলিয়া তিনি ঐ দুধ পান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শেঠানীকে ঐ দুধ পান করিতে বলা হইল। শেঠানী বলিলেন, "আমি মরিলে এই বৃদ্ধ শেঠের সেবা কে করিবে? যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা সহ্য করাই ভাল।" যুবকের স্ত্রীকে যখন ঐ দুধ পান করিতে বলা হইল সে বলিল, "যাহা হইয়াছে তাহা ত হইয়াছেই উহার জন্য আবার আমি মরিতে যাইব কেন?" যখন কেহই প্রাণ দিয়া ছেলেটিকে বাঁচাইতে রাজী হইল না তখন ঐ মহাত্মা ছেলেটিকে এক ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "এখন দেখিলে ত সংসারে কে তোমাকে কি ভাবে ভালবাসে? এখন চল আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া তিনি ঐ যুবককে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশ:)

■

জগদীশ্বরী মা আনন্দময়ী

— ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

(১)

'স্বয়ং জগদীশ্বরী মা আনন্দময়ী' প্রসঙ্গে (অমৃতবার্তা, জুলাই ১৯৯৬) মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার দীক্ষা হয়েছে কি না। নেওয়া হয় নি, শুনে বলেছিলেন, 'দীক্ষা অবশ্যই নেবেন। দীক্ষা না নিলে শরীর শুদ্ধ হয় না। দীক্ষা নিন, নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন।'

দীর্ঘকাল ধরেই মনের মধ্যে গুরুবরণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু 'গুরু' পাই কোথায়? এই গুরু সন্ধানে ঘুরেছি অনেক, শেষে ঠাঁই দিয়েছেন জননী জগদীশ্বরী, তাঁর পরমপদকমলে। এই গুরু-সন্ধানের কালে যখনই কোন মহাত্মার খবর পেয়েছি, ছুটেছি সেখানে। এমনি ভাবেই একদিন পৌঁছেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর পদপ্রান্তে।

সম্ভবত: সেটা ১৯৬৭/৬৮র শেষ। একদিন আমার প্রবীন বন্ধু বিনয় কুমার ঘোষ (সাহিত্য জগতে 'ভবঘুরে' নামে পরিচিত) এসে বললেন, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী দিল্লীতে এসেছেন। অতএব দেরী কিসের? পৌঁছে গেলাম আমরা তিন বন্ধু (ভবঘুরে, অমিয় মোহন চক্রবর্তী, আই.ই.এস সহ) দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন মন্দিরে। দূর থেকে দর্শন হ'ল স্বামীজীর। অসংখ্য জনতার ভীড়। ইতিমধ্যে ভবঘুরে এসে জানালেন, মহারাজের সঙ্গে যদি একান্তে মিলিত হ'তে চাই, তা হ'লে দিল্লী মিশনের সম্পাদক (তৎকালীন) স্বামী বন্দনানন্দজীকে অনুরোধ করলে হ'তে পারে। স্বামীজী অনুমতি দিলেন পরদিন বেলা ৩টার সময়। যথা সময়ে আমরা তিনজনে উপস্থিত হ'লাম স্বামী বন্দনানন্দজীর কাছে। তিনি আমাকে যেতে বললেন নির্দিষ্ট কক্ষে। আমরা তিনজনে অগ্রসর হলাম। স্বামীজী বাধা দিলেন। বললেন, 'এই সময় নির্দিষ্ট হয়েছে শুধু আপনারই জন্য, অন্য কারুর জন্য নয়।' আমি বন্ধুদের ছেড়ে যেতে চাই না। স্বামীজী বললেন, সে ক্ষেত্রে উপরের হলঘরে স্বামীজী মহারাজ বসবেন এবং অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের তিনি যেতে বলবেন সেখানে। আমরও কোন আপত্তি নেই। অতএব অচিরে হলঘর ভরে গেল। আমরা তিনবন্ধু মহারাজকে প্রণাম করে বসলাম তাঁর পদপ্রান্তে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কোন প্রশ্ন আছে কি না। আমার প্রথম প্রশ্ন নিবেদন করলাম তাঁর কাছে। গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

বড় স্নেহমধুর কণ্ঠে স্বামীজী মহারাজ বললেন, 'বাবা, লেখাপড়া শেখার জন্য অ-আ শেখার আমল থেকেই গুরু ধরেছেন। বিদ্যার রাজ্যে যেমন গুরুর প্রয়োজন, তেমনি বিশাল ধর্মজগতে প্রবেশ করতে চাইছেন, সেখানে গুরু বিনা কি এগোনো যায়? মানবজীবনে, ধর্মরাজ্যে প্রবেশের জন্য, গুরুকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। হঠাৎ স্বামীজী মহারাজ একেবারে আমার

ব্যক্তিগতজীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, 'বাবা, এই যে আপনি, সঙ্গীত শিক্ষা করছেন। গুরু ধরেই তো? শুধু ধর্ম জগতে গুরু বিনা এগোবেন কি করে? তা কি সম্ভব? আমার পাশে বসা আমার বন্ধু অমিয় মোহনের দিকে চেয়ে বললেন, — 'বাবা, আপনি, আপনি তো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। এই চিকিৎসা বিদ্যা আপনি যথা-বিধি শিক্ষা করেন নি। চিকিৎসার বিভ্রাট ঘটলে তার পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু আপনার। বিনা বিধিবৎ শিক্ষায় এই বিদ্যার প্রয়োগ উচিত নয়।' স্বামীজী মহারাজের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্ময়-স্তম্ভিত! সাধারণ মানুষেরা ভাবছেন, স্বামীজী মহারাজ আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে জানেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত!

আমার পরবর্তী জিজ্ঞাসা। গুরুর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রাখার কথা শুনেছি। কিন্তু গুরু যদি কফো (শ্লেষ্মা যুক্ত) গুরু হন এবং ভোজন কালে দয়া পরবশ হয়ে উচ্ছিষ্ট দেন প্রসাদ হিসাবে, তখন তো আমার উভয়-সংকট। আমি যদি গ্রহণ করি তবে সেই প্রসাদ না পারবো গিলতে, না পারবো ফেলতে। সে ক্ষেত্রে, আমার গুরুকরণ কি আর সম্ভব হবে?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর বাণী এখনও যেন মনের মধ্যে বাজছে। মধুর কণ্ঠে বললেন, — 'বাবা, সব রুগীর কি একই পথ্য? যার যেমন সয়। গুরু তো আসতে পারে স্বপ্নে, গ্রন্থরূপে, বন্ধুরূপে। নানারূপে তিনি প্রয়োজনানুসারে আসতে পারেন। গুরু হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর। গুরুর জন্য প্রার্থনা করলে তিনি আসবেনই। পথ তিনিই পরিস্কার করিয়ে নেবেন। দেখিয়ে দেবেন নির্দ্ধারিত পথ।'

এর পর অসীম করুণা ভরে মহাত্মন্ মহারাজ জানতে চাইলেন আমার আরও কোন জিজ্ঞাসা আছে কি না। আমার ধৃষ্টতার সীমা নেই। মনের ভার চেপে না রেখে জানতে চাইলাম তাঁর কাছে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে এই যে অসংখ্য মানুষ শতে শতে দীক্ষা লাভ করছেন, এর মূল্য কতখানি? দীক্ষা দান বা দীক্ষা প্রাপ্তি মাত্রেই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্মৃতি-পর্যায়ে রয়ে যায়। গুরু তাঁর শিষ্যকে চিনতে পারবেন না। শিষ্য শুধুমাত্র ফটোর মাধ্যমেই গুরুকে স্মরণ করবেন। এই ব্যবস্থাটিকে কি 'ব্যবসায়' ভাবা অন্যায় হবে?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর অধরে স্মিতহাস্য। দৃষ্টিতে সদাপ্রসন্ন স্নেহধারা। বচনে মাধুর্যের অমৃত-ক্ষরণ। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন তা আজও মন্দ্রিত হচ্ছে আমার অন্তরে — 'বাবা, যে জায়গাতে এখন আমি বসে আছি, মিশনের আচার্যরূপে, সেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতিরেকে বসা সম্ভব নয়। তিনি এই দেহকে আশ্রয় করে শতে শতে অসংখ্য মানুষকে দীক্ষা দান করেন, কৃপা করেন। এ তাঁরই পরম করুণা। যাঁরা এই পরম-করুণার আশ্রয় লাভ করেছেন, তাঁদের জীবনে গুরু-শরীরের সঙ্গে পরিচয়-অপরিচয়ের কোন প্রশ্নই নেই। কারণ, ধর্মজগতে এই গুরুমন্ত্রই তাঁদের চালনা করেন গুরুরূপে। এই মন্ত্র যে সিদ্ধমন্ত্র। এই সিদ্ধমন্ত্রই ধর্মজগতের সকল সংকট থেকে করবে ত্রাণ, এগিয়ে দেবে প্রার্থিত লক্ষ্যে।'

প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে ফিরেছিলাম সেদিন দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। এই আলোচনার কালে এক দৈবিক-নৈ:শব্দের মধ্যে যে অমৃত-বর্ষণ হয়েছিল তাতে মুগ্ধ চিত্ত হয়েছিলেন উপস্থিত ভক্ত-সমাজ।

(২)

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের সস্নেহে নির্দেশ পেয়েছিলাম স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর পথ-রেখায়। এখন সানন্দে স্মরণ করা যেতে পারে আমাদের জননী জগদীশ্বরী 'গুরুকরণ' প্রসঙ্গের অমৃত-বর্ষণ।

প্র : কেহ কেহ বলে যে ধ্যানের সাথে জপ করা উচিত। ইহা কিরূপে সম্ভব ?

মা — জপও এক প্রকারের ধ্যান। মন্ত্র মানে যে মনের ত্রাণ করে। এক হইতে অধিক অক্ষর মিলাইয়া মন্ত্র হয়। অক্ষর মানে যাহা ক্ষর হয় না। অক্ষর ভগবানের বিগ্রহ। কাহারো জপ না করিলে ভগবানের রূপ আসে না। কেহ কেহ ধ্যানের সময় মন চঞ্চল হইলে জপ করে।

প্র : ধ্যানের সময় কাহার ধ্যান করা উচিত ?

মা — নিজের নিজের ইষ্টের ধ্যান করিবে। নিজের গুরু যেমন বলিয়াছেন তেমন ধ্যান করিবে।

প্র : যাহার গুরু নাই সে কি করিবে ?

মা — যাহার গুরু নাই সে ভগবানের যে নাম ভাল লাগে তাহা জপ করিবে। আর যাহার ভগবানের নাম করিতেও ভাল লাগে না, সে চুপচাপ একান্তে বসিয়া চিন্তা করিবে যে আমি কে ? নিজেকে জানার চেষ্টা করা উচিত। যাহার গুরু নাই, তাহার গুরু করা উচিত।

প্র : কেহ কেহ বলেন যে গুরু তোমাকে খুঁজিয়া নিবেন। ইহা কি সত্য ?

মা — গুরু আমাকে খুঁজিয়া নিবেন এরূপ যে ইচ্ছা ইহাও তো ধ্যানই হইল। পরামর্শ করিয়া তো কিছু হইবে না। ভিতর হইতে যখন নিজ হইতেই গুরু বিনা কাজ হইতেছে না এইরূপ ব্যাকুলতা হইবে তখন গুরু স্বয়ং প্রকট হইয়া থাকেন।

(আনন্দবার্তা ১৯৮০, পৃ: ২৫-২৬)

প্র : দীক্ষা নেওয়া খুব আবশ্যক কি ? মনে মনে গুরু করিলে কাজ হইবে না কি ?

মা — মনে যদি গুরুর প্রকাশ হইয়া যায় তবে দীক্ষার ক্রিয়া হওয়া উচিত। মনে করিয়া হউক অথবা মন্ত্রের দ্বারা হউক। গুরুশক্তি প্রাপ্ত হওয়া উচিত যে প্রকারেই হউক। দীক্ষা নানা প্রকারের হইয়া থাকে — দৃষ্টিতেও হয়, স্পর্শেও হয় এবং মন্ত্রদানেও হয়। বহু প্রকার রহিয়াছে। আসলে গুরুশক্তি প্রাপ্ত হওয়া উচিত। (আনন্দবার্তা ১৯৮০, পৃ: ৩৪)

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, মহাত্মা গোপীনাথ কবিরাজ ব্যক্তিগতভাবে গুরুকরণ প্রসঙ্গে যে নির্দেশ দিয়াছেন তা বলবার চেষ্টা করেছি। জননী জগদীশ্বরীও গুরুকরণ তথা গুরুশক্তি প্রাপ্তির জন্য বার বার বলেছেন। আর গুরুকরণের মূল চাবিকাঠিটি রয়েছে 'শুধুমাত্র প্রার্থনায়।'

জননী জগদীশ্বরীর পরমপদ মেলে শুধুমাত্র প্রার্থনাতেই। আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিবশেই তাঁর সাক্ষাৎ-কৃপায় অভিস্নাত হয়েছি, ধন্য হয়েছি আমরা। আমাদের, প্রতিটি সন্তানেরই জীবনে এমন কিছু মধুর স্মৃতি-কণা গাঁথা হয়ে রয়েছে যার অমৃত-ক্ষরণে দেহ মন এক অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে জননী আমার, বিশ্বজননীর রূপটি প্রকাশ করেন। এ ঘটনা যেমন একান্তে ঘটেছে, তেমনি সহস্র মানুষকে একই মুহূর্তে দুর্লভ দিব্য-চেতনার জগতে নিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং জগদীশ্বরী মা আমাদের। মায়ের কৃপার প্রসাদে দেহশুদ্ধির যথার্থ অনুভূতি কি ভাবে মুহূর্তে সমগ্র সত্তাকে প্লাবিত করে তা শুধুই অনুভবগম্য। মাকে যখন বলেছিলাম, 'মা আমি যদি তোমাকে ভুলে যাই বা ভুলে যেতে চাই, তুমি যেন আমায় ভুলে যেও না।' আমার এই প্রার্থনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের শরীরের সেই অভাবনীয় পরিবর্তন তথা মায়ের সেই বিস্ময়কর দিব্য-প্রকাশ। সেই আবেশ-মন্দ্রিত কণ্ঠে তাঁর বরাভয়বাণী: 'আমি কাউকেই ভুলি নি। আমি যে সবাইকে ধরে রেখেছি। আমি কাউকেই ভুলি নি, ভুলবো না।' মায়ের সেই অপরূপা-দিব্য-আবেশ-বাণী নিত্য ঝংকৃত হচ্ছে আমার স্মরণে, মননে। আমাদের মার্গ নির্দেশ করেছেন, 'গগন মার্গ।' 'গগন মার্গে'র পথ নির্দেশে বেদান্তের বাণীকেই প্রতিষ্ঠা দিলেন তিনি আর তিনিই শরীরীরূপ ধারণ করে অবতীর্ণ, সে কথাটিও সিদ্ধ করলেন পরম করুণা ভরে অনুভূতির তন্ত্রীতে দু:সহ অমর্ত্ত প্লাবনের বেগ সঞ্চারিত করে।

এই অহৈতুকী কৃপার অঘটন ঘটিয়েছেন তিনি বারম্বার। গুরুপ্রিয়া দিদিকে মা বলেছিলেন, 'আমার পাশ ফেরবার জায়গা নেই।' সর্বব্যাপক, বিরাট বিভুর সত্যই কি পাশ ফেরবার জায়গা আছে? (মহাপ্রয়াণে মা - বগলাচরণ বসু, আনন্দবার্তা, ১৯৮৩, পৃ: ৩৮)

(৩)

কনখলে অনুষ্ঠিত ৩২ তম সংযম মহাব্রত হয়েছিল মাতৃ-সন্নিধানে। এই মহাব্রতের প্রতিটি ঘটনা সঞ্চালন করেছিলেন মা। মাতৃ-সন্নিধানে সেই মহামিলনোৎসবের মধুর স্মৃতি জীবনব্যাপী এক অক্ষয় আনন্দ-ভাণ্ডার। নানা গল্পের হাস্যোজ্জ্বল বর্ণনার ধারায় মা আমাদের অমৃত-বর্ষণ করতেন অনুক্ষণ। বলতেন, — "হাসো, হাসো। একটু পরে আবার বললেন, আরো হাসো। আবার বললেন, আরও জোরে হাসো।" (আনন্দবার্তা ১৯৮২, পৃ: ৫৫) "সর্বদা যত পারিস খুব হাসবি, এতে শরীরে জড়গ্রন্থিগুলি খুলে যাবে। বাহিরের হাসি কিন্তু হাসি নয়। বাহির ভিতর এক যোগ করে হাসতে হবে। সে হাসি কি রকম জানিস তাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাড়া দেয় এবং শরীরের কোন্ অংশ থেকে এ প্রবলরূপে স্ফূর্ত্তি পায় তা ধরা যায় না। তোরা তো মুখে হাসিস, মনে চাপা থাকিস্। আমি তোদের কাছে মুখভরা, বুকভরা প্রাণভরা হাসি চাই।" (সদবাণী ৩০)।

হাসবার মন্ত্র দিয়েছেন জগৎ-জননী। তাঁর দিব্য-হাসির প্রকাশ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলতে পারেন, জননীর সেই হাসি যথার্থই 'ব্রহ্মহাসি।'

জননী জগদীশ্বরীর উপস্থিতি-ধন্য সংযম সপ্তাহের শেষ সন্ধ্যার মহামিলনোৎসব। তখন কি কেউ কল্পনাও করেছি আমরা, এই মাতৃসঙ্গই জননীর মর্ত-লীলায় সংযম মহাব্রতের শেষ অনুষ্ঠান? শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে মায়ের কথামৃতের অপরূপ বর্ষণে সকল চিত্ত আনন্দ-মুগ্ধ। এরই মধ্যে স্বতন্ত্রানন্দজী যেন সকলের আকাঙ্ক্ষার বাণী-মূর্ত্তি প্রকাশ করলেন জননী-জগদীশ্বরীর দরবারে। তিনি বললেন — শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর চতুর্ভুজা মূর্ত্তি দেখিয়েছেন। আপনি আমাদের দেখান।

মা — শ্রীকৃষ্ণ যতটা দেখাবেন, ততটা অর্জুনকে চক্ষুদান করেছেন।

স্বতন্ত্রানন্দজী — সংযমে সব তৈয়ারী আছে। দিব্যচক্ষু দাও।

মা — এই অমৃত-বর্ষণ সবাই ধরে রাখে তবেই তো। সকলের জ্ঞাননেত্র আছে, সেটা শুধু খুলতে হবে। (আনন্দবার্তা ১৯৮২, পৃঃ ৫৫)

মাতৃ-সন্নিধানে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এক অলৌকিক দিব্য-আবেশ সংযম সপ্তাহের ঐ পুণ্য লগ্নটিকে কেন্দ্র করে মুহূর্ত্তে মর্তে যে জ্যোতির্জগৎ রচনা করেছিল, সেখানেই গড়ে উঠেছে পরবর্ত্তীকালের নিত্যধাম 'জ্যোতির্পীঠম্।' স্বরূপতঃ আনন্দধামে মানবসন্তানের নিত্য অভিষেক!

জননী জগদীশ্বরীর লীলার পার নাই।

■

নামান্তর

—শ্রী শৈলেশ

দ্বিপ্রহর অবসান, অপরাহ্ন বেলা,
দিনান্তের দিবাকর পশ্চিম গগনে।
বহিতেছে মৃদুমন্দ সুগন্ধ সমীর,
সন্মুখের পথ ঢাকা তৃণ আচ্ছাদনে।

সেই পথ বহি' চলে জননী নির্মলা,
জ্যোতিষ ও ভোলানাথ তার-ই অনুগামী।
চলেছে আপন মনে নির্বাক নীরবে,
চিত্তে ব্যগ্র কৌতূহল জাগে থামি-থামি।

দিবসের তাপ ক্রমে যেতেছে মিলায়ে,
আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া নামিছে ভূতলে,
সহসা নির্মলা দেবী দাঁড়ালেন আসি'
সিদ্ধেশ্বরী প্রাঙ্গণের অশ্বত্থের তলে।

এই সেই সিদ্ধেশ্বরী মহাতীর্থ পীঠ,
বহু সাধনার ধারা মিলিত যেখানে
কত যোগী, কত ঋষি সূক্ষ্ম দেহ ধরি'
আজো যেথা নিত্য মগ্ন গভীর ধেয়ানে।

তার-ই প্রাঙ্গণে হেরি হোমকুণ্ড এক,
দীর্ঘ দিন জ্বলে নাই যেথা হোমানল।
চকিতে নির্মলাদেবী, কী লীলা খেয়ালে
তারি মধ্যে বসিলেন, আনন্দ বিহ্বল!

জ্যোতিষ বিস্ময়ে হেরে, মুদিত নয়নে
সেথা বসি' দেবী এক, অপরূপ রূপ।
আনন্দ মথিত দেহ আনন্দ নন্দিত,
ললাটে আনন্দ জ্যোতি আনন্দ স্বরূপ!

হেরি' সে আনন্দ মূর্ত্তি জ্যোতিষ বিস্ময়ে
সহসা পুকারি ওঠে, "পিতাজী, পিতাজী,"
আনন্দ গঠিত এই আনন্দ প্রতিমার
'আনন্দময়ী' নাম হোক্ হতে আজি।

যেমনি সে কথা বলা তরু তৃণ রাজি
শিহরিল। বিহগ কণ্ঠে জাগিল কাকলী।
পশ্চিমের সন্ধ্যা সূর্য্য স্বর্ণিম কিরণে
জানায়ে প্রণতি গেল অস্তাচলে চলি।

সেই দিন হ'তে বিশ্বে নির্মলা জননী,
আনন্দময়ী নামে হ'ন পরিচিত।
সেই দিন হ'তে নিত্য গগন-পবন
'আনন্দময়ীর জয়ে' চির মুখরিত।।

■

শক্তি-স্বরূপ, শক্তিরূপ : শ্রী দুর্গা

— ডক্টর শুকদেব সিংহ

বেদে পুরুষ দেবতাদেরই প্রাধান্য। তবে বাক্, সরস্বতী, রাত্রি, স্ত্রী প্রভৃতি দেবীদেরও নাম পাওয়া যায়। এঁদের প্রাধান্য তেমন নেই।

মুষ্টিমেয় ক'জন দেবী ভারতী, সরস্বতী, ইলা প্রভৃতি আপন অধিকারেই পূজা পেয়েছেন, তাই তাঁদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। স্বাতন্ত্র্য, প্রাধান্য ও গৌরবের দিক থেকে সব দেবীকে অতিক্রম করে গেছেন অদিতি।

অদিতিকে নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ সূক্ত না থাকলেও বিভিন্ন সূক্তে অন্তত ৮০ বার তাঁর উল্লেখ রয়েছে।[১]

অগ্নিষ্টোম একটি ঐকাহিক সোমযাগ। এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের সুরুতেই অদিতির উদ্দেশে যজ্ঞ, দেবতারা অদিতিকে নাকি এ রকম বরই দিয়েছিলেন। এতে অনুমান হয় অদিতি এক সময় প্রধান দেবতা ছিলেন।

বৈদিক ঋষি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন অদিতি দৌ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, পিতা পুত্র, সমস্ত দেবতা অদিতি, পঞ্চজন অদিতি, যা জন্মেছে তা অদিতি, যা জন্মাবে তাও অদিতি। এখানে 'দৌ' ও 'অন্তরীক্ষ' শব্দ দুটি চৈতন্যবাচক, সুতরাং অদিতি চিতিরূপিনী। তিনি মাতা, পিতা, পুত্র। সৃষ্টিকর্ত্রী তিনি, আবার সৃষ্টিও তিনি। সমস্ত দেবতা অদিতি, অর্থাৎ সমস্ত দেবতা অদিতিরূপিণী ব্রহ্মময়ীর কোন না কোন রূপ।

অদিতি শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থে এখন অভিনিবেশ করা যাক্। দু-ভাবে 'অদিতি' শব্দ পাওয়া যায়।

'দো' খণ্ডিত করা সীমিত করা। তাই যা খণ্ডিত বা সীমিত, তাই 'দিতি।' ন দিতি = অদিতি, অর্থাৎ যা খণ্ডিত বা সীমিত নয়। সায়ণাচার্য সে জন্য অদিতি শব্দের অর্থ করেছেন 'অখণ্ডনীয়া'।

অন্যভাবেও 'অদিতি' শব্দ সিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে শ্রীঅরবিন্দ অদ্ ধাতু থেকে অদিতি শব্দ নিষ্পন্ন বলেছেন। অদ্ = গ্রাস করা বা খাওয়া। যিনি গ্রাস করেন (প্রলয় কালে) তিনি অদিতি। অর্থাৎ অদিতি ধ্বংসকারিণী শক্তি। বেদে বলা হয়েছে, অদিতি রুদ্রদের মাতা, বসুদের দুহিতা, আদিত্যদের ভগ্নী, অমৃতের আবাস-স্থল, অপাপবিদ্ধ জ্যোতিষ্মতী গাভী, তাঁকে হিংসা করো না।

কথাগুলির নিগলিতার্থ হচ্ছে এই অদিতি দেশকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিশ্বাত্মিকা, আবার

তার অতীত বিশ্বোত্তীর্ণা, চিদানন্দময়ী সত্তা।

সাধারণ লোকের বোধগম্য করার জন্য এই সত্তাকে বিভিন্নরূপে রূপায়িত করা হয়েছে।

ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে অদিতি দক্ষের কন্যা, আবার মাতাও। রুদ্রদের তিনি মাতা। ঋতের পত্নী, 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য, সত্যই ব্রহ্ম। সুতরাং অদিতি ব্রহ্মরূপিণী।

যজু: ও অথর্ব বেদে অদিতিকে কল্যাণকারিণী রক্ষাকারিণী দেবীরূপে আহ্বান করা হয়েছে। এমন কি ঋগ্‌বেদেও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে বিপদাদি থেকে ত্রাণ ও শান্তিলাভের জন্য অদিতির কাছে প্রার্থনা করার মন্ত্র রয়েছে। সমৃদ্ধিদায়িনী অদিতি।

শুক্ল যজুর্বেদে অদিতিকে দৈবী তরণী বলে অভিহিত করা আছে। সংস্কৃতে শক্তি স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু পরমার্থত শক্তিকে পুরুষ বা নারী দুই কল্পনা করা যেতে পারে। পরম দেবতার এমনি দুটি রূপ পুরুষ বা নারী। অদিতি এমনি পরম দেবতা। ঋকের দুটি সূক্ত — রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্তে এর অভিব্যক্তি রয়েছে।

বৈদিক যুগের এক গভীর কালরাত্রির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন ঋষি কুশিক। বাহ্য ব্যাপার তাঁর অন্তরের উপলব্ধিকে জাগ্রত করে তুললো। তিনি ব্যক্ত করলেন, অমর্ত্য রাত্রিদেবী বিরাট অন্তরীক্ষকে প্রথমে অন্ধকারে পরিপূর্ণ করেন। পরে আপন তেজে নীচু লতাগুল্ম থেকে উঁচু গাছ প্রভৃতিকে করেন আবৃত। গ্রহ-নক্ষত্রের জ্যোতিতে তম: নাশ করেন। তাঁর প্রসাদে আমরা সুখে গৃহে বাস করি। পাখিরা বাস করে বৃক্ষ কোটরে। বাঘ-বাঘিনী থেকে বাঁচিয়ে তিনি আমাদের রক্ষা করেন।

অত:পর দেবীসূক্ত। অম্ভৃণ-ঋষির কন্যা বাক্। একদিন তিনি পরমাশক্তিকে নিজ আত্মারূপে প্রত্যক্ষ করে হলেন ব্রহ্মরূপিনী। তিনি শক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বললেন — আমি একাদশ রূদ্ররূপে, অষ্ট বসুরূপে বিরাজমান। আরও বিরাজমান দ্বাদশ আদিত্য, সকল দেবতারূপে। আমি সর্ব জগতের ঈশ্বরী।... আমি কারণরূপে বিশ্বভুবনের উৎপত্তিস্থল, আবার বিশ্ব ভুবনরূপেও বর্তমান।.... ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে আমি আকাশকে অতিক্রম করে গিয়েছি, আবার পৃথিবীতেও ব্যাপ্ত রয়েছি।

সুতরাং পূর্বে আমরা অদিতিকে যে সত্তায় দেখেছি, মনে হয় তারই পরবর্ত্তীরূপ এই রাত্রি বা দেবী। তারও পরে এসেছে সর্বদেবতার শক্তির সমন্বয়ে গঠিতা দেবী দুর্গা।

বেদের পরে উপনিষদ্।

'কেনোপনিষদে' গল্পটি রয়েছে। দেবতারা অনেক যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছেন অসুরদের উপর। তাঁরা ভয়ঙ্কর রণক্লান্ত, শুধু যুদ্ধজয়ের আনন্দ বড় কম নয়, রীতিমত গর্বই হচ্ছে তাঁদের। সকলের মনে হচ্ছে নিজেদের শক্তিতেই তাঁরা জয়ী হয়েছেন। ঠিক এমনি যখন মনের অবস্থা,

তখন হঠাৎ দেবতারা দেখলেন আকাশের গায়ে অদ্ভুত এক পূজ্যমূর্তি। কে ইনি, কেনই বা উদিত হয়েছেন? দেবতাদের মন মুহূর্তে প্রশ্নাকুল হয়ে উঠলো। অগ্নি গেলেন প্রথমে পরিচয় জানতে। পূজ্যমূর্ত্তির কাছে নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বেশ একটু গর্বভরেই বললেন — 'আমি হুতাশন, জগৎ দগ্ধ করতে পারি।' পূজ্যমূর্ত্তি বুঝি স্মিত হাসলেন, ধরলেন এক খণ্ড তৃণ। অগ্নি কিন্তু এবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাতে আগুন ধরাতে পারলেন না। অগ্নির মুখে তাঁর ব্যর্থতার খবর শুনে এগিয়ে গেলেন বায়ু। ঝড়ের দাপটে তিনি হেঁকে বললেন — 'আমি বায়ু, উড়িয়ে দিতে পারি জগতটাকে।' 'তাই নাকি! তবে ওড়াও এই তৃণখণ্ড।' মূর্ত্তি তৃণখণ্ডটি মেলে ধরলেন। ওড়ানো তো দূরের কথা, তৃণটিকে সামান্য একটু নাড়াতেও পারলেন না। বায়ু হার মানলেন।

এবার এগোলেন দেবরাজ ইন্দ্র। কিন্তু তিনি যেতে যেতেই পূজ্যমূর্ত্তি হলেন অন্তর্হিত। তবু মূর্ত্তিটির স্বরূপ না জেনে দেবরাজ ফির্‌বেন না, তাই আকাশ পথে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। অবশেষে তিনি দেখলেন, যেখানে পূজ্য পুরুষমূর্ত্তিটি ছিলেন। সেখানেই শোভা পাচ্ছেন হিমালয়-দুহিতা হৈমবতী উমা।

দেবী উমা আত্ম পরিচয় দিয়ে বললেন, দেবাসুর সংগ্রামে তিনিই দেবতাদের জয়ের কারণ, তাঁদের নিজেদের শক্তি নয়। রাত্রিসূক্ত বা দেবীসূক্তে যা বলা হয়েছে এখানে 'কেনোপনিষদে' তারই প্রতিধ্বনি।

ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে, অদিতি দক্ষের কন্যা ও রুদ্রগণের জননী। দক্ষের কন্যা যখন তখন দাক্ষায়ণী দুর্গা, আর রুদ্রগণ শিবের সন্তান, সুতরাং রুদ্রের জননী বলে অদিতি শিবজায়া। বেদ ও উপনিষদে ব্যক্ত হয়েছে, তিনি দেবগণের মূলীভূতা শক্তি, তাই ব্রহ্মময়ী দুর্গা আর শাক্তদের উপাস্যা মহাদেবী।

অদিতি ভিন্ন বেদে মুষ্টিমেয় আরও ক'জন দেবীর উল্লেখ্ আছে, তাঁরা বাক্, ভারতী, সরস্বতী, ইলা, আরও পুরন্ধি, রাকা, সিনীবালী, লক্ষ্মী।

বাক্, ভারতী, সরস্বতী, ইলা মূলে স্বতন্ত্র দেবী ছিলেন, পরে সরস্বতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। সায়ন ইলা, ভারতী ও সরস্বতীকে অগ্নির মূর্ত্তি বলে ভাষ্য রচনা করেছেন। আবার 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে আমরা দেখি, দেবগণের তেজ:পুঞ্জ থেকে দেবী দুর্গার উৎপত্তি, তাঁকে অগ্নিবর্ণা বলে স্তুতিও করা হয়েছে। সুতরাং সরস্বতী বেদের কালের পরে হয়েছেন মহাসরস্বতী। এ মন্তব্যের পক্ষে রয়েছে সরস্বতীর সিংহবাহনা মূর্ত্তি।

পুরন্ধি, রাকা, সিনীবালী ও লক্ষ্মী মূলে প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের স্বতন্ত্র দেবী, পরে রূপ ও স্বরূপের অভিন্নতার দরুণ এক দেবীতে পর্যবসিত হয়েছেন। সর্বপ্রকার শক্তির আধার মহাদেবী দুর্গা, তাই চণ্ডীতে দেবীই মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী।

'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে দেবীর তিনটি চরিত্র। প্রথম চরিত্রে তিনি দশভুজা ও দশচরণা মহাকালী। দশভুজে তাঁর নয়টি অস্ত্র ও নরমুণ্ড। প্রলয়ের পরে সমস্ত পৃথিবী যখন কারণ সমুদ্রে পর্যবসিত তখন ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত নাগের শয্যায় শায়িত হয়ে যোগনিদ্রাভিভূত। নিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে দুই অসুর মধু ও কৈটভের হয় জন্ম। তারা জন্ম লাভ করেই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে বিষ্ণুকে জাগ্রত করার জন্য তাঁর (বিষ্ণুর) নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া বিশ্বেশ্বরী ভগবতীর স্তব করেন। স্তবে ভগবতী তুষ্টা হন। তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ব্রহ্মাকে দেখা দেন এবং বিষ্ণুকে করেন জাগ্রত। বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে সম্মুখে ব্রহ্মার প্রতি ধাবমান মধু ও কৈটভকে দেখে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রত হন। পাঁচ হাজার বছর চলে যুদ্ধ। মধু-কৈটভ সমস্ত পৃথিবীকে জলমগ্ন করে দেয়, বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে যেখানে জল নেই, সেখানেই যেন তাদের বধ করা হয়। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলে তাই করেন, নিজের জঙ্ঘার উপর রেখে তাদের বধ করেন। 'দেবী ভাগবত' মতে মধু কৈটভের মেদে কারণসমুদ্র পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে জল থেকে আবির্ভূত হয় পৃথিবী। তাই পৃথিবী দৈত্য মেদে গঠিতা বলে নাম হয় মেদিনী।

চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে তিনি মহালক্ষ্মী। তাঁর আঠারো খানি হাতে রুদ্রাক্ষের জপমালা, কুঠার, গদা, শর, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, ঘন্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন চক্র।

একশো বছর তুমুল যুদ্ধ করেও যখন মহিষাসুরকে কোনক্রমে পরাস্ত করতে পারছেন না ইন্দ্র, দেবতারা সুখের স্বর্গরাজ্য হারিয়ে পৃথিবীর এখানে ওখানে ঘুরছেন হতভাগ্য ছন্নছাড়ার মতো, তখন একদিন ব্রহ্মার নেতৃত্বে সকলে মিলে গিয়ে দাঁড়ালেন বিষ্ণু ও মহাদেবের সামনে। বিবৃত করলেন তাঁদের মর্মন্তুদ দু:খের কথা। দেবতাদের সেই দু:খের কথা শুনে বিষ্ণু আর মহাদেব ভীষণ কুপিত হ'লেন। তাঁদের ভ্রূকুঞ্চিত কুপিত কুটিল মুখ থেকে নি:সৃত হলো এক মহৎ দীপ্তি। ইন্দ্র প্রভৃতি অন্য দেবতাদের দেহ থেকেও তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হয়ে সেই দীপ্তির সঙ্গে হলো সম্মিলিত। তখন চারদিক ধাঁধিয়ে তোলা তেজোরাশিকে দেবতারা সবিস্ময়ে দেখলেন প্রজ্বলিত পর্বতের মতো। ক্রমে সেই তেজ:পুঞ্জ সংহত হয়ে হলো এক নারী মূর্ত্তি। তিনিই মহাশক্তি দুর্গা।

নারীরূপিণী মহাশক্তিকে দেবতারা দান করলেন নানান আয়ুধ ও বেশবাস। দেবী সুরাপান করে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন অন্য দেবতাদের আত্মগত শক্তি। প্রথমত, অন্য দেবতাদের শক্তি মহাশক্তি দেবীর প্রক্ষেপমাত্র, কারণ দেবী ব্রহ্মরূপিণী। দ্বিতীয়ত, পশুশক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সম্মিলিত দৈবী শক্তির প্রয়োজন।

যা হোক্, দেবী নানা রূপধারী মায়াবী মহিষাসুরকে শেষ পর্যন্ত শূলে বিদ্ধ করে বধ করেন।

দেবী তৃতীয় চরিত্রে মহাসরস্বতী। তিনি অষ্টভুজা। তাঁর হাতে ঘন্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুসল, চক্র, ধনু ও বাণ।

শুম্ভ-নিশুম্ভ দুই অসুর তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে বর পেয়েছিল যে, দেব ও মানব সব পুরুষের অবধ্য হবে তারা। তবে অযোনিজা, পুরুষের স্পর্শরহিত কোন নারীর প্রতি তারা যদি প্রলুব্ধ হয়, তা হলে সেই নারীর হাতেই হবে নিহত।

স্বর্গ-বিচ্যুত দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী পার্বতী তাঁর দেহকোষ থেকে অম্বিকাকে নির্গত করলেন। দেবীর দেহকোষ থেকে উৎপন্ন বলে সদ্যোনির্গতা দেবীর নাম হলো কৌশিকী। শুম্ভ-নিশুম্ভের দুই অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড দেবীকে দেখে আকৃষ্ট হলো, তারা শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে গিয়ে এই অপরূপা নারীর বর্ণনা করলো। তাতে প্রলুব্ধ হলো অসুর ভ্রাতৃদ্বয়। তারা পাঠালো তাদের দূত দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। দেবী তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাতে রুষ্ট হয়ে শুম্ভ যুদ্ধ সুরু করা মনস্থ করলো। পাঠালো ধূম্রলোচনকে। দেবী যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধূম্রলোচনকে মুহূর্তে ভস্মীভূত করে দিলেন। তখন শুম্ভ-নিশুম্ভ পাঠালো চণ্ড ও মুণ্ডকে। দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁর মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। তখন কৃষ্ণবর্ণ দেবী-ললাট থেকে বহির্গতা হলেন খড়্গ ও পাশহস্তা দেবী, কালী বা চামুণ্ডা। তিনি রথ সহ রথীকে, অশ্বসহ অশ্বারোহী অসুর সৈন্যদের মুখে পুড়ে চিবাতে লাগলেন। চণ্ড এ সব দেখে ক্রোধভরে দেবীর দিকে ধাবিত হ'লে দেবী তাকে কেশে ধরে খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করলেন। এভাবে মুণ্ডও হলো নিহত। যুদ্ধে এবার প্রবৃত্ত হলো শুম্ভ। দেবতাদের শক্তি এবার একে একে দেবীপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। রক্তবীজ অসুরপক্ষে বড় যোদ্ধা, তার রক্ত মাটিতে পড়লে অসংখ্য অসুরের জন্ম হবে, তাই দেবী চামুণ্ডাকে আদেশ করলেন রক্তবীজকে নিধন করে তার সমুদয় রক্ত মুখ দিয়ে পান করে নেওয়ার জন্য। চামুণ্ডা তাই করলেন, সেজন্য তাঁর নাম হলো রক্তদন্তিকা। এ সবের পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধে এলে দেবী প্রথমে নিশুম্ভকে বধ করেন, পরে বধ করেন শুম্ভকে। এইভাবে তৃতীয় চরিত্রে মহাভীষণা দেবী মহাসরস্বতী অসুরকুলকে নিধন করেন।

(ক্রমশ:)

গুরুপূর্ণিমা ও গুরুমাহাত্ম্য

— তাপস

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তদপদম্ দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।" (গুরুগীতা-২৭)

[যাঁহার দ্বারা অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর জগৎ ব্যপ্ত হইয়া আছে, তাঁহার স্বরূপ যিনি দর্শন করান, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।]

ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার আদিতে আমরা দেখতে পাই অধ্যাত্মজীবনে "গুরু" একটি বিশেষস্থান অধিকার করে আছেন। লৌকিক শিক্ষা লাভেও গুরুর প্রয়োজন। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে জ্ঞান উন্মেষের জন্য আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় ও কৃপা লাভ বিশেষ প্রয়োজন। আয়াস সাধ্য শাস্ত্রপাঠে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। গুরুর নির্দেশে সাধন ভজনে, গুরুকৃপায় হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; শিষ্য মুক্তিপথে এগিয়ে চলে। উপনিষদ ও পুরাণে তার অনেক নিদর্শন আছে। মণ্ডুকোপনিষদে বলা হয়েছে, "তদবিজ্ঞানার্থম্ গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ।" (১/২/১২) তাঁকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে।

গুরু শিষ্যের নিত্য আরাধ্য, স্মরণীয় ও পূজনীয়। তবুও শাস্ত্রকারগণ বছরের একটি বিশেষ দিনকে গুরুঅর্চনার, স্মরণ-মননের দিন ধার্য্য করেছেন। সেটা হল আষার মাসের পূর্ণিমা তিথি। কেহ বলেন সেটা ব্যাসদেবের জন্ম তিথি। তাই এদিনটাকে "ব্যাসপূর্ণিমা" বা "গুরুপূর্ণিমা" বলা হয়। ব্যাসদেব হলেন প্রচলিত রীতিতে আদি গুরু, যদিও পরমেশ্বরই আদি গুরু। (মহাভারতের রচয়িতা) ব্যাসদেব বেদ চার ভাগে বিভক্ত করেন, আঠারটি পুরাণ ও আঠারটি উপপুরাণ রচনা করেন। সেই অমূল্য জ্ঞানরাশির বিশেষ প্রচারের জন্য শিষ্য পরম্পরাক্রমে শিক্ষা দান করে গুরু শিষ্য ধারাটি প্রচলন করেন।

আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন ব্যাসদেব কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। বেদবিদ্যা ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রকে সহজ সরল করবার জন্য যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কাজ করে গেছেন তারা সকলেই ব্যাস নামে পরিচিত। তবে বেদ বিভাগ ও পুরাণ রচনার পর থেকেই বাদরায়ণ ব্যাসদেব আদি গুরুরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছেন। প্রাচীনকালে শিষ্যগণ চার্তুমাস্য ব্রত উদ্‌যাপনের প্রথম দিনে অনধ্যায় (অধ্যয়ন বিরতি) পালন করে আদি গুরু ব্যাসদেব ও নিজ নিজ গুরুদেবের পূজা করে পুনরায় পঠন-পাঠন ও সাধনা করতেন। সেই থেকে আষাঢ় পূর্ণিমা 'ব্যাসপূর্ণিমা' বা 'গুরুপূর্ণিমা' বলে প্রচলিত। (উদ্বোধন ৯০/৭)

বর্তমানে প্রায় প্রতি আশ্রমে ও প্রতিষ্ঠানে গুরুপূর্ণিমা পালিত হয়। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের অনেক আশ্রমেই এদিন গুরু ও শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষভাবে অর্চনা ও স্মরণমনন করা হয়।

অনিত্যজগতে ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। সেই নিত্য বস্তু লাভের জন্য, পরমজ্ঞান লাভের জন্য সদগুরুর স্মরণ মনন, তাঁর সেবা ও নির্দেশ পালন কর্তব্য।

গুরু কে? দীক্ষা কি? —এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী এক সময় বলেছিলেন— "গুরু অর্থাৎ গুরুতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের সাথে যে যুক্ত আছে, তাহা যিনি জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু। একমাত্র তিনিই তাঁকে জানান ত! দীক্ষা অর্থাৎ গুরু বা ইষ্টই দীক্ষারূপে প্রকাশিত হন, কারণ ইষ্ট মন্ত্র ও গুরুত একই।" (উপদেশামৃত ১/৩০৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "গুরুর কাছে (তত্ত্বের) সন্ধান নিতে হয়। গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি করতে নেই। সচ্চিদানন্দই গুরু।" (কথামৃত)

শৈবগণ বিশ্বাস করেন গুরু শিবরূপে সিদ্ধিদান করেন। বৈষ্ণবরা গুরু ও হরিকে অভেদ মনে করেন। 'যা মন্ত্র তাই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি।' শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানীরা গুরু ও ইষ্টকে অভেদ মনে করেন।

গুরু শব্দটি এসেছে 'গু' ধাতু ও 'রু' প্রত্যয় সংযোগে। 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, 'রু' শব্দের অর্থ আলো যা অন্ধকারের নিবারক। গুরু অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে শিষ্যকে জ্ঞানের আলোর সন্ধান দেন। (গুরু গীতা-১৯)

'বিশ্বসার তন্ত্রে'র অন্তর্গত গুরু গীতায় গুরুতত্ত্ব ও গুরুমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলা আছে। ভগবান শিবের কাছে দেবী পার্বতীর প্রশ্ন— "কেন মার্গেন ভো স্বামিন্ দেহীব্রহ্মময়োভবেৎ"— হে স্বামী কোন পথ অবলম্বন করে দেহী (আত্মা) ব্রহ্মময় হয়ে ওঠে।" (গুরুগীতা-৪)

এই প্রশ্নের উত্তরেই গুরু গীতার সৃষ্টি। গুরুর উপাসনাই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গুরুর স্মরণ, মনন, তাঁর সেবা, পূজা, অর্চনা, আরাধনা, নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন, গুরুমন্ত্র জপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তাঁতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও তাঁরই নির্দেশিত পথে চলা এইগুলিই সেই পথ যাতে মুক্তি মেলে, আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাই ভগবান শিব বলছেন—

"গুরুমূর্ত্তিং স্মরেৎ নিত্যং গুরুর্নাম সদা জপেৎ
গুরু বিশ্বেশ্বর: সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্" (গুরু গীতা ১৩,১৪)

(সর্বদা শ্রী গুরুর মূর্ত্তির ধ্যান করবে। নিত্য তাঁর দেওয়া নাম জপ করবে। কারণ গুরুই সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং তিনিই তারকব্রহ্ম।)

আবার ভগবান শিব পার্বতীকে গুরুমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলছেন—

"গুরুব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নম:।" (গুরু গীতা ২৫)

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুদেবই মহেশ্বর, গুরুই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, সেই গুরুদেবকে প্রণাম।

আবার নিরাকার পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুর ধ্যানের কথা বলছেন—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিতং বিমলং অচলং সর্বধী সাক্ষীভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তম্ নমামি।" (গুরু গীতা ৪৮)

(ব্রহ্মানন্দ ও পরম সুখদাতা শুদ্ধজ্ঞানমূর্তি দ্বন্দ্বাতীত আকাশের সদৃশ "তৎত্বম্অসি" মহাবাক্যের লক্ষ্য, অদ্বিতীয়, নিত্য, বিমল, অচল (স্থির), যিনি সকল জ্ঞানের দ্রষ্টা, ভাবাতীত, সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের ঊর্ধ্বে স্থিত সেই সদগুরুকে প্রণাম করি।)

এইরূপে গুরুর সগুণ নির্গুণ স্বরূপের কথা বলেছেন ভগবান। এই গুরুর নিত্যধ্যানে দেহী ব্রহ্মময় হয়ে ওঠে। গুরু কৃপাতেই আত্মারাম অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

শুধু গুরু গীতা নয়, শ্রীমদ্ভগবতে, শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতে, উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রে গুরু মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। গুরু ও ইষ্ট অভেদ। এই গুরুই স্বয়ং ভগবানের সচল বিগ্রহ। তিনিই শিষ্যকে সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন।

শঙ্করাচার্য বলছেন—

"বিচারণীয়া বেদান্তা, বন্দনীয় সদাগুরু।
গুরুণাম্ বচনম্ পথম্ দর্শনং সেবনং নৃণাম্।" (তত্ত্বোপদেশ-৮৪)

(বেদান্ত বিচার করবে কিন্তু গুরু সর্বদাই বন্দনীয়। গুরুর আরাধনা ও সেবাতে মানুষ পরমপদ লাভে সমর্থ।)

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী বলেন—"স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে প্রকাশ হন। বিশ্বাস কর, তাঁকে ডাক।" (বাং মা ১)

"গুরুশক্তিতেই সব হয়, আবার সর্বনাম তাঁরই নাম। সর্বরূপ তাঁরই রূপ। একটি নিয়ে বসে যাও। আবার তার নাম নাই রূপও নাই-অনামী, তিনি নিরাকার। নাই আছে, দুই তাঁর মাঝে সম্ভব। যতক্ষণ গুরু না মেলে, যে রূপ, যে নাম ভাল লাগে, তাই নিতে থাক। আর নিত্য প্রার্থনা, তুমি আমার কাছে সদ্গুরুরূপে প্রকাশ হও। গুরুত অন্তরে, সেই অন্তর গুরু না মিললে হল না কিন্তু।" (আ:বা: ৩/৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে—

"আচার্য্যং মা বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েৎ সর্বদেবময় গুরু:।" (ভা: ১১/১৭/২৭)

(গুরুকে সাক্ষাৎ আমি বলিয়াই জানিবে। কখনও তাহার অবমাননা করিবে না। মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া কখনও অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্বদেবময়।)

শ্রীশ্রী মা আবার বলছেন—

"গুরু যদি বলো তবে বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি যেমন রাখতে নাই, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি রাখবে না। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখবে। যদি মনুষ্যবুদ্ধি করত তোমার গুরু-করণ হোল না। কারণ মানুষ কি কখনও গুরু হতে পারে? গুরুমানেই জগৎগুরু। জগৎগুরু মানে মৃত্যুর গতি থেকে যিনি অমৃতের দিকে গতি দেন। সেই গতি যিনি দেন, তিনিই হলেন অন্তরগুরু।" (বাং মা ১)

সাধারণভাবে যাঁরা আধ্যাত্মজীবনে শিষ্যকে দীক্ষা দেন ও সাধনপথের নির্দেশ দেন, তাঁদের 'গুরু' বলা হয়। তাঁরাও ভগবানের প্রকাশ। তবে কুলগুরু, মানবগুরু, সদ্‌গুরু ও অবতারের শক্তি প্রকাশের তারতম্য আছে। কুলগুরু ও মনুষ্য দেহধারী মানবগুরুরা তাঁদের স্থিতি ও শক্তি প্রকাশ অনুযায়ী শিষ্যকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করেন মন্ত্র দীক্ষা ও উপদেশ দ্বারা। পরম সত্যকে না লাভ করলেও তাঁরা ভগবানকে জীবনের সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন। গুরু বলে অভিমান তাঁদের নেই। তাঁরা অনেকটা আচার্য্যের কাজ করেন। ভগবানকেই পরম গুরু রূপে মানেন। পরম্পরাক্রমে গুরুজনদের কাছ থেকে যে সাধন ধারা পেয়েছেন, তাই শিষ্যকে দেন। কিন্তু কিছু নকল গুরুও আছেন, যাঁদের মধ্যে সিদ্ধাইর প্রকাশ দেখা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ বিচার করে জিজ্ঞাসু শিষ্যকে গুরুকরণ করা উচিত। নইলে ক্ষতির সম্ভাবনা। গুরু স্বয়ং অগ্রসর না হলে শিষ্য অগ্রসর হতে পারে না।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষরা বলেন, গুরু যেমনই হোক গুরুর প্রতি ভক্তিই শিষ্যকে সাধনমার্গের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। সে ভক্তি ব্যক্তিগুরুর প্রতি নয়। ব্যক্তিতে প্রকাশিত গুরুশক্তির প্রতি—পরমেশ্বরের প্রতি।

সদ্‌গুরু হলেন, "যিনি বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, বিষয় তৃষ্ণা রহিত, ব্রহ্মবিদ, বহ্মে সমাহিত চিত্ত, নির্বিকার, সদ্‌ব্যক্তিগণের প্রতি দয়াবান।" (বিবেকচূড়ামনি ৩৩)

অনেক সদগুরুর জাগতিকভাবে শাস্ত্র পাঠ ও জ্ঞান না হলেও ভগবত কৃপায় তাঁরা ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ। তাঁদের কথা ও আচরণে শাস্ত্রের মর্মার্থ ব্যক্ত। তাঁরা ভগবানের বিশেষ প্রতিনিধি। সদ্‌গুরু শিষ্যের স্থিতি অনুযায়ী তাতে শক্তি সঞ্চার করেন, মন্ত্রের দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, দৃষ্টির দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা।

শঙ্করাচার্য্যের দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রে আছে—

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধা শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরুস্তু মৌন ব্যাখ্যানম্ শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়া:।।"

(বটগাছের নীচে যুবক গুরু মৌন অবস্থায় ধ্যান নিমগ্ন। জিজ্ঞাসু বয়স্ক শিষ্যগণ শান্ত সমাহিতভাবে বসে আছেন। গুরু মৌন থেকেই তাদের সব জিজ্ঞাসার সমাধান করে তাদের সংশয় দূর করে দিচ্ছেন।)

শ্রীশ্রী মা বলেন, "সদ্গুরু সদ্গুরু বলা হয়, গুরু কি আবার অসৎ হয়? গুরুমাত্রেই সদ্গুরু। দেখ জগৎগুরুইত গুরু, এক ঈশ্বরই গুরু।.. স্বভাবে যিনি স্থিত তিনি সদ্গুরু, আবার যিনি স্বভাবে স্থিত হইতে যাইতেছেন তিনিও সদ্গুরু। স্বরূপ পাওয়ায় যিনি সহায়ক হন তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরু স্বয়ংই শিষ্যকে আশ্রয় দেন এবং অনুসন্ধান করাইয়া লন। জগৎগুরুর স্বভাবই এই করুণা। ইষ্ট গুরু, মন্ত্র তিনইত এক, তাই এই।" (উপদেশামৃত ২/১৯০,২২০)

অবতারের আবির্ভাব যুগ-প্রয়োজনে। অবতার যখন আসেন তাঁকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ ভাব তরঙ্গ বইতে থাকে যা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁদের ভাবধারা মানুষকে লক্ষ্যপথে পরিচালিত করে। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, হজরৎমহম্মদ ও আরও অনেক ঈশ্বর প্রেরিত মহামানবগণ কালোপযোগী, স্থানোপযোগী বিশেষ ভাবধারার তরঙ্গ তুলে দিয়েছেন যাতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় মানব জীবনে, যাতে জগদ্বাসী উদ্বুদ্ধ হয়। বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী ধরাধামে এসেছিলেন মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি বলেন, "সর্বধর্মই একধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।" (মাতৃদর্শন)

তিনি চেয়েছেন সকলে যেন নিজের স্বরূপ জানতে পারে। তাই 'মা' বলেন— "অমরপন্থী হও, মৃত্যুপন্থী না। সত্যস্বরূপ ভগবান তোমার মধ্যেই না? এই জন্য আপন চিন্তন— আপন ধ্যান ছাড়া না। আপন বস্তু আপনাকে পাওয়ার জন্য।" (বাং মা ১)

সর্বজনে পরমসত্য ও চির শান্তির সন্ধান উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রী মায়ের ব্যক্ত লীলা। মাকে অনেকেই বলে- "তুমি আমার গুরু।" মায়ের উত্তর-"তোমরা যে যা বলো তাই। বিশ্বব্যাপক, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান যাকে বলা হয়, ঐত সকলের মা।" (বাং মা ১)

এই সব ক্ষণজন্মা পুরুষদের প্রভাব অব্যক্তস্থিতি থেকেও ব্যক্তে আসে। গুরুর প্রভাব ও ক্রিয়া অব্যক্ত স্থিতি থেকেও চলে। শ্রীশ্রী মা বলেন—

"আরেক কথা হলো গুরু চলে গেলেও তুমি যদি দেহেতে তাঁকে নাও দেখ, সর্বদা সর্বক্ষণ যতক্ষণ তোমার লক্ষ্যপূর্ণ না হবে, ততক্ষণ তোমার যা প্রয়োজন, তোমাকে তিনি সেই রাস্তা ধরে দেবেন। দেবেন মানে কি? তিনি যাবেন কোথায়? যাওয়ার প্রশ্নই নাই, প্রকাশিত হবেন।" (বাং মা ১)

শিষ্য কি রূপ হবে ? আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য শিষ্যকে সাধন চতুষ্টয়ের (মুমুক্ষতা, বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধন ও গুরুকৃপা) অধিকারী হতে হবে। সেটা সম্ভব গুরু নির্দেশ পালনে। সম্ভব ক্ষেত্রে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে গুরুর সেবার দ্বারা। কিন্তু সেটাত সহজ নয়। তবে উপায় ? গীতায় শ্রী ভগবান বলছেন আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থীও জ্ঞানী এদের আছে ভগবান লাভের অভীপ্সা। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা প্রয়োজন। শিষ্যকে আসুরিক গুণাবলির রূপান্তর করে গীতোক্ত দৈবী সম্পদের অধিকারী হতে হবে (অভয়, অহিংসা, সত্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি ছাব্বিশটি গুণের অধিকারী।) কায়মন বাক্যে শিষ্যকে গুরু সেবা করতে হবে, নির্দেশ পালন করতে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—
"শিষ্য অভিমানশূন্য, অমৎসর (পরশ্রীকাতরতা বর্জিত), অনলস, মমতা রহিত, (গুরুর প্রতি) সৌহার্য্য বিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থজিজ্ঞাসু, অসূয়াশূন্য ও বার্তালাপ রহিত হবেন। আর স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন, ধন সমুদয় বিষয়ে উদাসীন হয়ে নিজের জিনিসের ন্যায় সকল পদার্থকে সমভাবে দর্শন করবেন।" (ভা: ১১/১০/৬৭)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করবেন। শ্রদ্ধাবান ও জিতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু সাধক অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কববেন ও এই জ্ঞান লাভ করে শাশ্বত শান্তি লাভ করবেন।" (গীতা ৪/৩৪, ৩৯)

প্রাচীন কালে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে গুরু-সান্নিধ্যে শিষ্যের আধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হোত। তাতে গার্হস্থ্য আশ্রমও যথাযথ পালিত হোত। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের জীবন মানুষকে লক্ষ্যপথে চালিত করত। বর্তমানে সমাজে ব্রহ্মচর্যের ভিত্তি নেই। গার্হস্থ্য আশ্রম ভোগেই পর্যবসিত। তাই মহাপুরুষরা ভোগে ত্যাগে সেবা ও শমদমের মাধ্যমে মানুষকে গার্হস্থ্য জীবন পালন করতে বলেন। উপদেশ ও মন্ত্রদীক্ষা দ্বারা শিষ্যকে ধীরে ধীরে তৈরী করে নেন।

শ্রীশ্রী মা বলেন,—"সেবা মন্ত্রজপই গৃহস্থের সাধনার উপায়।" আবার বলছেন, "শুধু নাম, আমি জানি নামেই সব হয়।" "গুরুকৃপাই সব, গুরুমন্ত্র ভিতরে ভিতরে স্পন্দিত হইলে তাহাতে অঙ্কুর হয়, গাছ হয়। তারপর ফুলে ফলে ভরিয়া উঠে। ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন, পাঠ ও সৎসঙ্গ এই পাঁচটির যে কোন একটি নিয়া থাক।" (উপদেশামৃত ১/২৩, ৯০, ৩২৪)।

গুরুশক্তি এমনই যে শমদম সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধালু শিষ্য শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী না হলেও গুরুকৃপায় আধ্যাত্মজীবনে উন্নত হয়, পরমজ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্র বলে সদগুরুর আশ্রয় পেলে একজন্মে না হলেও তিনজন্মে মুক্তি সম্ভব।

গুরুশক্তির মাহাত্ম্য সকল-ধর্মপথেই স্বীকৃত। তবে বৈদিক ধর্মে স্মরণাতীত কাল থেকে গুরুকে উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে। সেটা বৈদিক হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মচেতনার ঐতিহ্যের একটা বিশেষ

বৈশিষ্ট্য। কাল প্রভাবে সেটা ম্লান হলেও হিন্দুর গুরুবাদ আজও স্বীকৃত ও পরীক্ষিত সত্য। গুরুই শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারেন; শক্তি সঞ্চার করতে পারেন। অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচনে শাস্ত্রও তপস্যা সাহায্য করে মাত্র। শিষ্যের কর্তব্য নির্বিচারে গুরুর আনুগত্য ও সেবা। শিষ্যকে সমদর্শী হতে হবে। তাকে সবার ভিতর তার গুরুর প্রকাশ দেখতে হবে। তবে যতদিন অন্তর গুরু জাগ্রত না হন, ততদিন বহির্গুরুর নির্দেশ পালন ও আনুগত্য প্রয়োজন।

শ্রীশ্রী মা বলেন—

"তোমাদের গুরু যিনি, জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি তোমাদের গুরু তিনি। তাঁর অনন্তরূপ, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত অপ্রকাশ; গুরু ইষ্ট মন্ত্ররূপে ওই-ইত। যেখানে মন প্রাণ বিশ্বব্যাপক এক আত্মাইত।" (বাং মা ১)

আজ এই পুণ্যতিথিতে জগজ্জননী শ্রীশ্রী মাকে প্রণাম জানাই। প্রণাম করি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা ঋষি ব্যাসদেবকে। আমরা নিজ নিজ গুরুদেবকে জগৎগুরুরূপে প্রণাম জানিয়ে বলি—

"মন্নাথ: শ্রী জগন্নাথো, মদগুরু: শ্রী জগদ্গুরু:
মমাত্মা সর্বভূতাত্মা, তস্মৈ শ্রী গুরুবে নম:।"(গুরু গীতা ৩৪)

(আমার নাথই শ্রী জগন্নাথ, আমার গুরুই শ্রী জগদ্গুরু, আমার আত্মাই সর্বভূতের আত্মা, সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার।)

শ্রীশ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর বাণী:—"মহাপুরুষদের চেনা ও তাঁদের লীলা বোঝা সাধারণ জীবের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় যদি না তাঁহারা কৃপা করে ধরা না দেন বা না চেনান। তাঁহাদের উপদেশ অনুসরণ করলেই মঙ্গল। ভগবত ইচ্ছা ও লীলা বুঝতে হোলে তাঁহার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই। (বারাণসী ১৭/১/৭০)

■

শ্রীশ্রী মায়ের কৈলাশ যাত্রা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—*শ্রী শিবানন্দ*

মা চলেছেন এগিয়ে। যাত্রাদলের অনেকের মুখে চোখেই একটা ভয় বিহ্বল ভাব। দস্যুদের রাজ্য আর কত দূর। কিন্তু না, আর কিছুটা অগ্রসর হতেই সকলের দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠল এক অপরূপ দৃশ্য। সম্মুখে ক্ষীণ কুঝমটিকার এক পারদর্শী আবরণ। তারি মধ্যে দৃশ্যমান এক অপূর্ব চিত্র। সম্মুখে স্থির বিস্তৃত এক বিশাল জলরাশির নীলাভ প্রান্তর। তারি উপরে ধূমায়িত হচ্ছে অতিক্ষীণ শুভ্র বাষ্পের ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নীলাম্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সে যেন প্রতিনিয়ত এক কল্পলোকের সৃষ্টি করে চলেছে। সে দিক থেকে দৃষ্টি আর ফেরান যায় না। গাইড বল্‌ল — 'ঐ দেখা যাচ্ছে মানস সরোবর।'

'মানস সরোবর!' যাত্রীদলের কর্ণকুহরে শব্দটী প্রবেশ করতেই কোথায় উধাও হয়ে গেল দস্যুভয়, কোথায় হারিয়ে গেল যাবতীয় পথের দু:খ কষ্ট।

এ পথ নির্জন, কোথাও আর জন মানবের সাড়া নাই। ইতস্তত: গুল্ম ও তৃণের সারি। মা ছিলেন অশ্বপৃষ্টে। অকস্মাৎ মা অশ্ব পৃষ্ট হতে অবতরণ করলেন, মায়ের অদূরেই ছিলেন গুরুপ্রিয়া দিদি, ভোলানাথ এবং জ্যোতিষ বাবু ও আর সব রয়ে গেছে বেশ কিছু ব্যবধানে।

মা হঠাৎ দিদিকে বললেন, 'খুকুনি তোমরা তিন জন এগিয়ে যাও। তোমাদের তাবুর নিকট অপেক্ষা কোরো। আমি যারা পিছনে তাদের নিয়ে আসি।'

মাকে এ ভাবে এক জনমানবহীন বিজন প্রান্তরে একা রেখে যেতে গুরুপ্রিয়াদির আপত্তি, কিন্তু মায়ের আদেশ, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা অগ্রসর হলেন। এদিকে মানস সরোবরের তটে গাইড এবং পর্বতীয় তাঁবুর ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। তাঁরা তাঁবুর নিকট উপস্থিত হয়ে মার অপেক্ষায় রইলেন।

মানস সরোবর। বিশাল এক তরল নীলিমার আস্তরণ-কী অপূর্ব! চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন উচ্চতার পর্বতমালা এবং পর্বতাকার বালুকাস্তূপ। পীতাভ বালুরাশির এবং নীলাভ জলরাশির কী অদ্ভুত বর্ণ সম্মিলন। তদুপরি এই বিশাল জলরাশির তটে উপবিষ্ট হয়ে অন্তরে যে গাঢ় আনন্দরস উদ্বেল হয়ে ওঠে তা কিন্তু সত্যই চিত্তকে সমাহিত করে।

মানস সরোবরের তীব্বতি নাম, 'তাসো সোবাং।' সরোবরে কয়েকটী বিভিন্ন বর্ণের হংস বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। জল নির্মল এবং নিষ্কলঙ্ক, তলদেশের প্রতিটি প্রস্তর স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে।

মায়ের সঙ্গীরা একে একে সকলেই সরোবরের জলে স্নান সমাপন করলেন। মা তখনো

এসে পৌঁছান নাই।

জ্যোতিষ বাবু মানস সরোবরে অবগাহনান্তর উত্থিত হয়েই কেমন যেন একটা ভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ তিনি তাঁর পরিহিত বস্ত্রখণ্ড সরোবরের জলে নিক্ষেপ করে ভোলানাথের নিকট এসে উপস্থিত। ভোলানাথ তখন সরোবরের তটেই দণ্ডায়মান। জ্যোতিষবাবু ভোলানাথের নিকট উপস্থিত হয়েই তার চরণদ্বয় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা, খুবই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আমি এ স্থান হতেই অবধূত হয়ে বিদায় গ্রহণ করি," বলেই মানস সরোবরের তটের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, — "বাবা, আপনি আমাকে অনুমতি করেন, আমি ঐ দিকে চলে যাই।"

ভোলানাথ জ্যোতিষবাবুর সে অবস্থা দর্শন করে অত্যন্ত বিব্রত এবং বিচলিত হয়ে পড়লেন। বললেন, — "না, না, এ কি কথা! তোমার মাতো এখনো এসে পৌঁছান নাই। শীঘ্র কাপড় পর।"

ভোলানাথের আদেশে জ্যোতিষ বাবু গায়ের পশমী চাদরটি পরিধান করে মায়ের আগমনের অপেক্ষায় সেস্থানেই উপবিষ্ট হয়ে রইলেন।

এদিকে মা অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে প্রায় এক ঘন্টাকাল পরে এসে উপস্থিত হলেন। মা উপস্থিত হয়ে দেখেন জ্যোতিষবাবু এবং পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন, তাদের সকলের স্নান সম্পন্ন হয়ে গেছে। মার সঙ্গে যারা, তারাও এক এক করে স্নান শেষ করে আপন আপন নিত্য ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। সরোবর তটে রয়ে গেলেন শুধু মা, ভোলানাথ এবং জ্যোতিষ বাবু। মায়ের কী খেয়াল হ'ল, মা ইঙ্গিতে ভোলানাথকেও তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সরোবরের তটে মা কেমন যেন ব্যস্ততার সঙ্গে পদচারণা করতে লাগলেন।

অকস্মাৎ জ্যোতিষবাবুও গাত্রোত্থান করে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে পদচারণা করতে করতে ভোলানাথকে যা বলেছিলেন, পুন: পুন: সে কথা বলতে লাগলেন এবং প্রণাম করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার বললেন, 'মা আমার ইচ্ছা হয় যে ক'দিন থাকি, এ দিকেই কোথাও থাকি। আমাকে আদেশ দিন, আমি যাই' বলেই করজোর করলেন।

মার পদচারণা যেন একটু দ্রুততর হ'ল। সামান্য ক্ষণ পরেই মা জ্যোতিষবাবুর সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই মায়ের শ্রীমুখ হ'তে নানা বিধ মন্ত্র জাতীয় শব্দ স্বত:স্ফুরিত ভাবে নির্গত হতে লাগল। তাঁর মধ্যে সন্ন্যাস মন্ত্রও ছিল। সে মন্ত্র উচ্চারিত হ'তেই সম্মুখে দণ্ডায়মান জ্যোতিষবাবু বসে পড়লেন। বসে পড়েই মায়ের চরণ দুটি দুই হাতে ধরে গদ-গদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মা এযে সন্ন্যাস মন্ত্র। আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি। আমি যে পেয়ে গেছি" বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠের যজ্ঞোপবীত মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করে মায়ের মুখ নি:সৃত সেই মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই সরোবর তটে বসে আরো যেন কি করে, মায়ের শ্রীচরণে তিন

অঞ্জলি সরোবরের জল অর্পণ করে প্রণাম করলেন।

মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞোপবীতটী তাকে ধারণ করতে আদেশ করলেন।

মায়ের আদেশ পালন করে তিনি পুনরায় করজোরে মায়ের নিকট নিবেদন করলেন, 'মা আমার একটা নিবেদন আছে, আপনি আদেশ দিন, এখন হতে আমি মৌন হয়ে যাই।' তাঁর নিবেদন শুনে মা বলেছিলেন, 'যাত্রার পথে মৌন হওয়াটা ঠিক হবে না। তবে আজ যখন তোর এই ভাবে এই সব হ'ল এবং তোর মৌন হবার ইচ্ছাও জেগেছে, তখন তোর নাম হ'ল 'মৌনানন্দ পর্বত'।

মানস সরোবরের উত্তর পশ্চিম কোণে গাইড দেখান একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। উষ্ণ প্রস্রবণের তপ্ত জলরাশি নিকটেই একটি কুণ্ডে একত্রিত হচ্ছে। সে জলে গন্ধকের উৎকট গন্ধ। ওর দর্শনে স্মরণে আসে বক্রেশ্বর, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রীর এবং বদ্রীনারায়ণের স্মৃতি। সে সব স্থানেও উষ্ণ প্রস্রবণ বা ধূমায়িত তপ্ত জল কুণ্ড।

প্রস্রবণের ধারে পর্বতের গায়ে গায়ে আছে গোটা কয়েক গুহা মঠ। গুহাকে এদেশে গুম্ফা বলে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গুম্ফাটীর নাম 'জু-গুম্ফা।' অদূরেই একটি ক্ষুদ্র ধারা মানস সরোবর হতে নির্গত হয়ে অপর এক বিশাল সরোবর রাবণ হ্রদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

যাক্। মায়ের সঙ্গীগণের সকলেরই স্নান-আহ্নিক সমাপ্ত হয়ে গেছে। মা শুধু সরোবরের জল স্পর্শ করেন।

পার্বতীর গভীর আকাঙ্ক্ষা যে তিনি ভোলানাথের নিকট হতে দীক্ষা প্রাপ্ত হ'ন। তিনি মায়ের নিকট সে কথা ব্যক্ত করতেই মায়ের আদেশে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। তারপর সকলের বিশ্রামের আয়োজন।

মানস সরোবর হ'তে কৈলাসের পথে অপর একটি তালাও। তার নাম রাক্ষস তালাও বা রাবণ হ্রদ! তার তিব্বতী নাম 'নাং বো', ভুটিয়ারা বলে 'পা গাং।' মানস সরোবর যেমন তীর্থ রূপে ব্যবহৃত হয়, রাক্ষস তালাও সেরূপ নয়। বরং গাইড বলল, অধিকাংশ তিব্বতবাসীদের নিকট সে তালাও অপবিত্র। তার চতুর্দ্দিকে চোরা বালুকা ক্ষেত্র, সুতরাং তার নিকটবর্ত্তী হলেই প্রাণ নাশের ভয়। ভোটিয়াগণ বলে ওটা রাবণ রাজার হ্রদ, রাবণ রাক্ষস, একারণেই এ তালাও এত বিপদ সঙ্কুল। এ স্থানের উচ্চতা ১৫০০০ ফিট্।

এ স্থানে দস্যুদের উৎপাতের কথা প্রসঙ্গে গাইড জানান এ এলাকায় তাদের উৎপাত আরো অধিক। কারণ এ স্থানের রাজা-প্রজা সকলেরই ঐ পেশা। খাদ্য দ্রব্যের এ অঞ্চলে অতীব অভাব। সুতরাং ঐ রূপ না করলে তাদের জীবনধারণ সম্ভবই নয়।

রাক্ষস তালাওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থলে বহু প্রকার ঐদেশীয় জলচর, স্থলচর দেখা গেল।

সরোবরের নিকটবর্ত্তী প্রায় সমতল প্রান্তরে এক ঝাঁক চড়াই জাতীয় বিহঙ্গ। ওরা আকারে আমাদের দেশীয় চড়াই পাখী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদাকার এবং বর্ণটীও তরল পিঙ্গল বর্ণ। ধূসর বর্ণের গুটি কয়েক খরগোসকেও এক প্রকার কন্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পল্লব বিশিষ্ট কন্টকলতার মধ্যে বিচরণ করতে দেখা গেল। এ ছাড়া এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ব্রহ্মচক্ষু দণ্ডবায়সেরও দর্শন হল। আর জল চরের মধ্যে চক্রবাক্ ও কালীহাঁসই প্রধান।

এদিকে সূর্য্য প্রায় অস্তের মুখে। ঘড়িতে ৬॥ ঘটিকা। 'জু গুম্ফা' নামক এই স্থান মায়ের পূর্ব পড়াও হ'তে দশ মাইল দূরবর্ত্তী। এ স্থানও মানসেরই তটবর্ত্তী। আজ এ স্থানেই যাত্রার বিশ্রাম। যথারীতি গাইড ও শ্রমজীবিগণ তাঁবু বন্দোবস্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

(ক্রমশ:)

■

সংযম মহাব্রতের অনুকণা

[এক]

— দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

জন্মশত বার্ষিকীর সংযম সপ্তাহ ক্রমিক সংখ্যায় ছিল ৪৬ তম। পুণ্যভূমি কন্‌খল আশ্রমে ৩১ শে অক্টোবর থেকে ৬ ই নভেম্বর পর্য্যন্ত পালিত হয়েছে। আনন্দজ্যোতিপীঠমে এই মহাব্রতে অংশ নিতে পেরে এ জীবনের জন্ম সার্থক মনে করেছি।

৩০ শে অক্টোবর এই মহাব্রতের উদ্‌ঘাটন পর্ব্বের সুরু। উদ্‌ঘাটন উৎসবে বিশেষভাবে সজ্জিত মঞ্চে বিরাজমান ছিলেন স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরী, স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি, স্বামী চিদানন্দ (দিব্য জীবন সংঘ), স্বামী আশিসানন্দ, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী শ্যামসুন্দর দাস।

গিরিধর নারায়ণপুরী মহারাজ তাঁর আশীর্ব্বচনে বললেন, "মা এই সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের প্রবর্ত্তন করেছেন। মা বলতেন সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম।" তিনি মায়ের সুরে এই ভজন করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে সুর মেলালাম। তিনি বললেন, "ঘর বাড়ী ছেড়ে সংসারের মোহ ছেড়ে সাতদিন এখানে উপবাস, গঙ্গাজল পান, বিষয় আশয় ভোগ সব কিছু ছেড়ে কচ্ছপের মত নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়ে গিয়ে অন্তর্মুখী মন দিয়ে বড় বড় বিদ্বান পূজ্য মহাত্মারা যা বলবেন তা আপনারা শুনবেন, হৃদয়ে ধারন করবেন, মা এই চেয়েছেন।"

স্বামী বিদ্যানন্দ মহারাজ বললেন — ৪৫ বৎসর যাবৎ এই সংযম সপ্তাহ মহাব্রত চলছে। এই বছর ৪৬ তম ব্রতের প্রারম্ভের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় বিদ্বান মহাত্মাগণের মুখারবিন্দ থেকে আপনারা সংযম সম্বন্ধে শ্রবণ করছেন। আত্মা সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, কিন্তু কোনও কারণে আমরা তা দেখতে পাইনা। শ্রোত্র নেত্র ইন্দিয়াদি ভগবান দিয়েছেন কিন্তু একটা শিকায়েৎও দিয়েছেন। ইন্দ্রিয় দিয়েছেন কিন্তু সেগুলি বহির্মুখী করেছেন। দৃষ্টি ভোগদৃষ্টির জন্য হয়, শ্রবণ আনন্দ উৎসবের জন্য ব্যবহার হয়। এইসব যদি ভগবানের বিভূতিরূপে দেখা যায় তাহলে পরমাত্মার অনুভূতি হয় কিন্তু তা দেখা হয়না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — স্থাবরাণাং হিমালয় স্রোতসামস্মি জাহ্নবী। কিন্তু ভোগবিলাস দৃষ্টিতে সব ইন্দ্রিয় ব্যবহার করলে এসব দেখা যায় না। সংযম অভ্যাস করলে সেই দৃষ্টির পথ খুলে যায়। এই বছরের সংযম সপ্তাহের কিছু বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। শতবর্ষে যেখানেই যে কেউ এই সংযম সপ্তাহে অংশ নেবে সে মায়ের কৃপা অবশ্যই পাবে। পরমেশ্বরের কৃপার অভাব নেই। তার সঙ্গে গুরুকৃপা, শাস্ত্রকৃপা ও আত্মকৃপা এই চারের মিলনে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। প্রথম তিন কৃপার কোনও অভাব নেই, অভাব কেবল আত্মকৃপার। মা যে এই ব্রত প্রবর্ত্তন করেছেন এটাই গুরু কৃপা। পরমেশ্বরের কৃপা তা ছড়িয়েই রয়েছে। শাস্ত্রকৃপা হাতের কাছেই রয়েছে। যার আত্মকৃপায় প্রবৃত্তি হয় না তার অধ্যাত্ম সাধনা হয় না।

যেদিন থেকে আমি মায়ের কাছে এসেছি সেদিন থেকে আমি উপনিষদ শোনাবার সুযোগ

পেয়ে আমি ধন্য। উপনিষদ বাইবেল নয়। ঈশ্বরের বাণী ঋষিমুনিদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে উপনিষদরূপে। মা যখন শরীরে বিদ্যমান ছিলেন তখন মাকে শুনিয়েছি। এখন মায়ের সমাধিকে শোনাই। কাল থেকে কোনও এক উপনিষদের আলোচনা হবে। ভাগবৎ পারায়ণের মত উপনিষদ পারায়ণ, গীতাপারায়ণ, ব্রহ্মসূত্র পারায়ণও হয়। কখনও সুযোগ হলে তারও ব্যবস্থা হবে।

"আপনারা সকলেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। এটা ভুলে আমরা নামরূপের মোহে ডুবে রয়েছি। এটা আত্মহত্যার সামিল। নিজেকে না জেনে শরীরকে আমি মনে করে সেই মোহে ডুবে থাকা। এর থেকে ছুটকারা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম। মা এই পথই আপনাদের দেখিয়ে গেছেন পালনের জন্য।"

"গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান এর ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু মা নিজে বসে থেকে আপনাদের শিখিয়েছেন, দেখিয়েছেন, করিয়েছেন। এরই জন্য আপনারা দূর দূর থেকে কত কষ্ট করে এখানে আসেন, এসেছেন। মহান্ত গিরিধারীনারায়ণ পুরীজীর মত আমিও আপনাদের স্বাগত অভিনন্দন করছি। আপনাদের সাধনা সফল হোক, মায়ের কৃপা অবশ্যই আপনাদের উপর বর্ষণ হবে।"

চিদানন্দ স্বামী বললেন, "মা অসীম অনুগ্রহ করে এই সাতদিন সাধকের ভক্তের পরম কল্যাণের কারণে এই মহাব্রতের প্রর্বত্তন করে রেখেছেন। কৈলাস আশ্রমের শতাব্দী উৎসবে মা সেখানে দিব্যধাম নির্ম্মাণ করে সকলের কল্যাণের যে ব্যবস্থা করেছিলেন আমার চোখের সামনে আজও তা ভাসছে। একদিন মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সেখানে এলেন মাকে দর্শন করতে। মা নীচে নেমে এগিয়ে এলেন। সীতারামদাসজী নিজের লাঠি ফেলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। মহাপুরুষের আদর্শ — দেবতার সামনে আত্মসমর্পণ। আপনারা মায়ের অনুগ্রহের পাত্র, যে ভাব নিয়ে এখানে এসেছেন সেই ভাবনায় আপনারা দ্রুত এগিয়ে যাবেন মায়ের শ্রীচরণে এই প্রার্থনাই করছি। আমরা যদি একটু কষ্ট করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি, মা দৌড়ে এসে হাত ধরে টেনে এগিয়ে নিয়ে যান।"

শ্যামসুন্দরজী বললেন, "অন্যান্য বছরের মত এবারেও সংযম সপ্তাহের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ এই সংযম সপ্তাহের প্রবর্ত্তন। মনকে অন্তর্মুখী করাই এর উদ্দেশ্য। মনই সব সংকল্প বিকল্পের ক্ষেত্র। তাই মনকে একাগ্র করতে হবে অন্তর্মুখী করতে হবে। সংযম সপ্তাহের সব অনুষ্ঠানই মনকে একাগ্র করার উপায়ের চেষ্টা।"

এর পরে ভজন গান করলেন ছবিদি। সে যে কি ভজন তা না শুনলে অনুধাবন হয় না। তিনি গাইলেন — "হে ভগবান, হে ভগবান.... তোমার আমার মিলন হবে এই সংযম মহাব্রতে" ইত্যাদি। ছবিদি যেন সমস্ত প্রাণ উজার করে দিয়েছিলেন সেই ভগবানকে ডাকতে। আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষে অনুরণিত হচ্ছিল ভগবানের কাছে সেই আকুল আহ্বান, আমাদের সকলের হয়ে সেই আহ্বান গিয়ে আছড়ে পড়ছিল শ্রীভগবানের পায়ে আমাদের মায়ের পায়ে। সাধ্য কি ভগবানের যে সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি স্থির থাকতে পারেন!

ছবিদির যেন মনে হচ্ছিল বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত। শুধু একই আহ্বান, একই মিনতি একই প্রণাম, হে ভগবান তুমি এস তোমাকে আসতেই হবে, এই সংযম মহাব্রতে তোমার আমার মিলন হবে, তুমি এস, তুমি এস। মনের পর্দ্দায় ভেসে উঠছিল ছবিদির সেই অন্তর নিংড়ানো আকুল মিনতি। আর মা বসে আছেন তাঁর সেই বহু পরিচিত তক্তপোষটীর উপর সহজ সমাধি অবস্থায়। বসে আছেন। দেখছেন অথচ বসেও নেই দেখছেনও না শুধুই অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করে যাচ্ছেন সমবেত সাধু ব্রহ্মচারী যতি মণ্ডলীর উপরে। সে দৃষ্টি যে একবার দেখেছে সে কি পারে জীবনে তা ভুলতে?

৩১ শে অক্টোবর শুরু হল সংযম সপ্তাহের প্রথম দিনটী। সকাল সাতটায় শ্রীশ্রী মাতৃ সমাধিতে আরতি, সাড়ে সাতটায় বেদপাঠ, পৌনে আট থেকে দশ মিনিট সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম কীর্ত্তন। পুষ্পদি এখন যিনি ভজনানন্দ গিরি, এই ভজন করলেন। সেই সত্যমজ্ঞানম ধ্বনি এমন মূর্চ্ছনা ছড়াচ্ছিল চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল সেই মূর্চ্ছনায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে অনুপরমাণুতে মিলিয়ে গিয়ে সে এক নৈসর্গিক পরিবেশের সৃষ্টি করল, যেখানে বসলে সেই সত্যম জ্ঞানম্ এর ধ্যান বোধ হয় নিজের শরীরের মধ্যে আপনা আপনিই হয়ে যায়। সেই সুর সেই মূর্চ্ছনাও সাথে সাথে ভাসিয়ে তুলছিল শুভ্রবসনা শুভ্রবরণা অখিলেশ্বরী শ্রীশ্রী মায়ের চিরপরিচিত মূর্ত্তি সেই তক্তপোষ খানার উপর। পাঁচ মিনিট বিরতির পর মঞ্চে বিরাজমান গিরিধর নারায়ণ পুরী মহারাজ, চিদানন্দ স্বামী এবং অন্যান্য সাধুমহাত্মাদের উপস্থিতিতে হল ধ্যান সকাল ন'টা পর্য্যন্ত। এই ধ্যানের পর প্রতিদিনই মহামণ্ডলেশ্বর বিদ্যানন্দস্বামী একঘন্টা উপনিষদ ব্যাখ্যা করতেন। ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে আগামী সংখ্যায়।

(ক্রমশ:

■

তীর্থময়ী মা আনন্দময়ী

(১)

— অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি।
আজও পড়ে মনে মোর
পড়ে যে কেবলি॥
ওরা জানে না তাই মানে না।
আমি জানি তাই মানি।
আমি অন্তরে তাঁর বাঁশরী শুনেছি
তাই ওগো আমি মানি॥

দেবদুর্লভ কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করছেন শ্রদ্ধেয় দিলীপ রায়। আনন্দময়ী মা দিলীপ রায়কে গান গাইতে বলেছেন। মায়ের নির্দেশে কলকাতায় বিড়লা পার্কের শিব মন্দিরে দিলীপ রায় গান গাইলেন। বহু বিশিষ্ট অতিথি এসে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী, তাঁর মেয়ে অর্পণা দেবী, দীঘাপাতিয়ার রাণী।

মা দিলীপ রায়ের গলায় মালা পরালেন। দিলীপ রায় খুশী হয়ে বললেন, মা এখন তুমি কথা বলো। তোমার কথা শুনতেই এরা সকলে আমার সঙ্গে এসেছে। তোমার কথা শুনতে আমার বড়ই মিষ্টি লাগে। তাই এদের আমি এনেছি, তোমার কথা শোনাও।

মা হেসে বললেন, তোমাদের কান মিষ্টি তাই আমার কথা শুনতে মিষ্টি লাগে। সকলে মা'র রসিকতায় হেসে উঠলেন। বাসন্তী দেবী আনন্দময়ী মাকে কোলে নিয়ে বসলেন। অর্পণা দেবী কীর্ত্তন গান গাইলেন। অনেকেই মাকে গান শোনালেন। পরিবেশ হয়ে উঠল অপূর্ব।

মা বললেন, বাইরের কর্মে অভাবের নিবৃত্তি হয় না। এসব যে অভাবের কর্ম। অভাবের কর্মের স্বভাবই এই যে সদা সর্বদা অভাব জাগ্রত করে রাখে। তাই স্বভাবের কর্ম করতে হয়। এমন বন্ধন নিতে হয় যাতে সর্ব বন্ধন নষ্ট হয়। গ্রন্থিমোচন আর কি। বাহিরের দৃষ্টি, বা বাহিরের ভাব কমিয়ে দিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে যেতে হয়। মা এরপর সুর করে বললেন—

তাঁহারি গান গেয়ে,
চল তাঁহার দিকে ধেয়ে।
যায় দিন বয়ে।

সেটা বাংলা ১৩৩৩ সাল। বৈশাখ মাস। আনন্দময়ী মা বৈদ্যনাথ ধামে এসেছেন। একদিন মা বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বালানন্দজী খুশী হয়ে মাকে বললেন, মা তোমার

গাঁটরি খোল।

মা উত্তরে বললেন, গাঁটরি তো বাবা খোলাই আছে। মা বললেন, এক ছাড়া কিছু নেই। বালানন্দজী এ কথা মানছেন না। তিনি বলছেন, দুই, তিনও তাঁর মায়া। আর আনন্দময়ী মা কিছুতেই দুই স্বীকার করতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত বালানন্দজী মায়ের কথাই মেনে নিলেন।

বালানন্দজী মাকে ফল খাওয়ালেন। তিনি মাকে পরের দিন নিমন্ত্রণ করলেন। মা পরের দিন এলেন। বালানন্দজী মায়ের গলায় পরালেন রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে দিলেন একখানি রক্তবস্ত্র। দুজনের মধ্যে সুদীর্ঘ সময় আলোচনা হল। মা আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখে ফিরলেন।

আনন্দময়ী মা নবদ্বীপে এসেছেন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মানস কন্যা গৌরীমাও নবদ্বীপে এলেন। আনন্দময়ী মার সঙ্গে গৌরীমা'র পরিচয় হল। দুজনে দুজনকে পেয়ে মহা খুশী। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রস রসিকতা চলল।

শ্যামদাস বাবাজী পরম বৈষ্ণব। পুরীধামে কুড়ি বছর রয়েছেন। বাতে পঙ্গু। আনন্দময়ী মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। মায়ের দর্শন লাভের জন্যে ব্যাকুল। খালি বলেন, মাগো, তুমি কৃপাসিন্ধু, কৃপা করো, দেখা দাও।

অন্তর্যামী আনন্দময়ী মা এলেন শ্যামদাস বাবাজীর কাছে। শ্যামাদাস বাবাজী মাকে দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হলেন। পরে বাবাজী বলেন, মা আনন্দময়ী এই ঘরে বসে আমাকে দর্শন দিয়ে গেছেন। কয়েক মিনিট এখানে ছিলেন। আমার কি তখন জ্ঞান ছিল ?

আনন্দময়ী মা বেরেলিতে এসেছেন। এক সাধু মায়ের কাছে ছুটে এসে বলছেন, অনেক যোগ, তপস্যা করে মন স্থির করতে পারছি না। শান্তি পাচ্ছি না। মা, শান্তির পথ বলে দিন। মাই সব সমস্যার সমাধান করেন। মা সাধুজীকে গোপনে কিছু উপদেশ দিয়ে বলেন, প্রথমে বীজটি পুঁতে যদি বারে বারে উঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই বীজে আর গাছ হয় না। বীজটি মাটির ভেতর পুঁতে যত্ন করে রক্ষা করতে হয়। জল সেচন করতে হয়। শেষে গাছ বের হয়ে বড় হয়ে গেলে কত বীজ হয়। কত ফুল হয়। সাধুজী মায়ের কাছ থেকে শান্তির পথের সন্ধান পেয়ে মহাখুশী।

মা সীতাকুণ্ডে শঙ্করমঠ আশ্রমে এসেছেন। মা এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা বলছেন। মা জানালেন, অনেক দিন আগে রমণার কালী বাড়ী থেকে তিনজন গৈরিক বেশধারিণীর সঙ্গে কথা হয় একজন বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আমি বলি, জগৎকে মিথ্যা কি করে বলি। জগতের ভেতরেই তো সকলের জন্ম। জন্মেই তো এই জগৎ দেখছ।

(ক্রমশ:)

■

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা

(নবম প্রকাশ)

—প্রতিভাকুমার কুণ্ড

এই সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম সুসম্পন্ন করে স্বঘরে ফেরা যায় না। সেই জন্যই তো বারবার মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান। আর যদি সব কিছু ত্যাগ করে সব ফেলে চলে যেতে পারা যায়, তবেই সত্য সে যাওয়া, আর ফেরা নয়।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা স্থূল শরীরে ফিরেছিলেন। তাঁর তো কোনো সংসার ছিল না। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তো তাঁর সংসার। তাঁর যাওয়াই বা কি, আর ফেরাই বা কি! যাবেনই বা কোথায়? তাঁর তো পাশ ফেরার জায়গা নেই। তবুও মানবতনু ধারণ করে ধরণীতে এসেছিলেন, অতএব একদিন ঐ মানবতনু ত্যাগও করলেন। কিন্তু মা স্থূল শরীরে ফিরে এসেছিলেন, ১৯৯০ সনের সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের চতুর্থ দিন সকালে ৭/৮ মিনিটের জন্য, গোবিন্দপুরে শ্রীমতী পদ্মা কুণ্ডুর বাড়ীতে।

একটু পূর্ব্ব-কথন প্রয়োজন। ১৯৭৫ সনের ৫ ই জুন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী মা গোবিন্দপুরে এসেছিলেন সন্ধ্যার একটু পরে এবং পরদিন ৬ ই জুন বিকেল পাঁচটায় চলে গিয়েছিলেন ভাসাগ্রামে। যাবার সময় অত্র লেখক মাকে বলেছিল, 'মা আবার এসো।' মা তিনবার বলেছিলেন, 'আনালেই আসব, আনালেই আসব, আনালেই আসব।' লেখক সন্তানসুলভ আবদারের সুরে বলেছিল, 'তুমি কিন্তু তিনবার বললে, এঁরা সবাই সাক্ষী।' আশে পাশে অনেক মাতৃভক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রী তরুণ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় কথিকা : গোবিন্দপুরে শ্রীশ্রী মায়ের স্থূলশরীরে আবির্ভাব

১৯৭৫ সনের শেষ ভাগে গোবিন্দপুরে মায়ের জন্য একটা নূতন ঘর, বারান্দা, মায়ের নূতন বাথরুম তৈরি করলাম, স্বাভাবিকভাবেই তার নাম দেওয়া হোল মাতৃমন্দির। এর পর বিভিন্ন জায়গায় এক বছরের মধ্যে মাকে তিনবার অনুরোধ করেছিলাম, গোবিন্দপুরে মাতৃচরণের পদধূলি দিতে। অবোধ সন্তানকে আপন জননী যেমন ধমকান, সেই রকম ধমকের সুরে শ্রীশ্রী মা বলেছিলেন, 'বলছো কি করে? দেখছো না শরীরটা এত খারাপ।' তারপর মাকে আর মুখ ফুটে গোবিন্দপুরে যাওয়ার কথা কখনো বলিনি। যদিও মনে মনে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতাম, 'যখন তোমার ইচ্ছা হবে, তখনই তুমি কৃপা করে যেও মাগো, ইচ্ছা না হলে যেওনা।'

মাঝে মাঝে অবুঝ মনে চিন্তা আসত, ভাইজী বলেছেন, 'তাঁহার শ্রীমুখ নি:সৃত কোন বাণী ব্যর্থ হইবার নয়।' উপরন্তু মা তিনবার বলেছিলেন, 'আনালেই আসব, আনালেই আসব, আনালেই আসব।' প্রায়ই ভাবতাম, মা তাহলে কবে আসবেন, কি ভাবে আসবেন।

মা তো নিশ্চয়ই আসবেন। কিন্তু প্রস্তুতি নেব কেমন করে? কিছুই তো জানি না। মা কি কোনো আভাষ দেবেন? একমাত্র মা জানেন। মা ধমকে বলেছিলেন, 'বলছ কি করে?' সত্যিই তো, তখন মায়ের শরীর খুবই খারাপ চলছিল। অথচ মাকে অনেকেই কত জায়গায় তো নিয়ে যাচ্ছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে যথেষ্ট অভিমান হোত। কিন্তু মায়ের ধমকের উপরে তো কোনো কথা বলা চলে না। অতএব মনে খুব অভিমান নিয়েই কোনরকমে দিনগুলো কাটাচ্ছিলাম।

অবশেষে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা এলেন। স্থূল শরীর ধারণ করে গোবিন্দপুরে এলেন। ১৯৯০ সনের সংযম সপ্তাহ মহাব্রতর চতুর্থ দিন সকালে। এই বিরল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা লেখকের লেখনী দ্বারা বিবৃত হলে হয়তো স্থানে স্থানে রঞ্জিত হয়ে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায় শ্রীমতী শিবানী সেনগুপ্তর লিখিত বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম —

সর্ব্বদেব দেবীময়ী শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী। বিশ্বের সকলের মা। একথা স্মরণে রেখে যে মন প্রাণ এক করে মাকে ডাকতে পারে সে নিশ্চিত সাড়া পায়। পাওয়া যায় এবং পেয়েছি। একথা জানাতে আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি এবং নিজেকে ধন্য মনে করি।

ইং ১৯৯০ সালের 'সংযম সপ্তাহ মহাব্রত।' শ্রীশ্রী মায়ের কয়েকজন ভক্তের সম্মিলিত অনুরোধ শ্রী প্রতিভাকুমার কুণ্ডু গোবিন্দপুরে এই মহাব্রতর ব্যবস্থাদি করে তাঁদের ইচ্ছাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সকলেই মায়ের অনেকদিনের ভক্ত এবং আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মানাদা, ডা: করদা, তাপসদা, অপূর্ব্বদা, শ্রী জ্যোতি নস্কর ও তাঁর স্ত্রী, শ্রী রবীন সেনগুপ্ত, প্রতিভাদা, পদ্মাদি, রমাদি, শ্রী জ্যোতির্ময় মুখার্জী (গৌরদা) ও আমি (শিবানী সেনগুপ্ত)। এই সংযম সপ্তাহ মহাব্রত শুরু হয়েছিল ২৬ শে অক্টোবর ও শেষ হয়েছিল ২ রা নভেম্বর। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই হরিদ্বার যাবার টিকেট কাটা ছিল। কিন্তু ট্রেনের গন্ডগোলের জন্য সকলের টিকেট ফেরৎ দেওয়া হয়।

যথারীতি নিয়মমত সংযম ব্রত শুরু হলো। উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২৫ শে অক্টোবর বিকেল চারটায় শুরু হয়। আসন গ্রহণ। তারপর রোজই ধ্যান, পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, মৌন, সবই অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হচ্ছিল।

ঘটনা যেদিন ঘটেছিল সেই দিনটি ছিল সংযম সপ্তাহের চতুর্থ দিন। শ্রীশ্রী মায়ের মন্দিরে মায়ের ছবির সামনে আমরা বসেছি। ঠিক আটটায় মৌন শুরু হয়েছে। রোজকার মত মায়ের সামনে একদিকে পুরুষ, আর একদিকে মেয়েরা বসেছেন। আমি মায়ের আসনের সামনেই বসেছি। আমার পেছনেই পদ্মাদি, রমাদিরা বসেছেন। ধ্যানে রোজই মাকে আমার একান্ত মনের ইচ্ছা জানাই। মাকে রোজই বলি, আজও বলছিলাম, 'তুমি প্রেরণা দিলে আমি নামযজ্ঞ করব। কোথায় করব, তুমি বলো।'

এই সংযম মহাব্রতের চতুর্থ দিন সকালের ধ্যান শেষ হতে বোধ হয় কয়েক মিনিট বাকি ছিল। পরিষ্কার দেখলাম, মন্দিরের দরজা খুলে শুভ্রবসনা শ্রীশ্রী মা প্রবেশ করছেন খুব হন্তদন্ত হয়ে। মা এসে আমাদের সম্মুখস্থ মায়েরই আসনে বসলেন। চরণযুগল একত্রে পাশে রেখে বসলেন। পদ্মাদি হাতপাখা নিয়ে মাকে বাতাস করছেন। মা আসাতে প্রতিভাদা হারমোনিয়াম টেনে নিলেন। মা বললেন, 'হরে কৃষ্ণ গাও।' আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি।

মা খুবই নিকটে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার সেই প্রশ্ন, 'মা নামযজ্ঞ করব। কোথায় করব তুমি বলো। তুমি না বললে আমি যে করতে পারছি না। তুমি বলো।' মা এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কেন? এই তো জায়গা।' আমি বললাম, 'মা এটা অনেক দূর হবে। অনেক অসুবিধা হবে।' শ্রীশ্রী মায়ের অন্যান্য স্থানের কথাও উল্লেখ করলাম। মা বললেন, 'এই তো গোবিন্দের জায়গা। এখানেই কর, দূর কাছে হয়ে যাবে।'

এই কথা যখন চলছে — আরো কিছু জিজ্ঞাসা ছিল — কিন্তু করতে পারলাম না, কারণ পদ্মাদি আমায় ভীষণ ভাবে ঠেলে ঠেলে ডাকছেন। ভাবলাম, কি করলাম আমি। একটু অবাক হয়ে গেলাম। আমার কি রকম যেন আচ্ছন্নভাব। শুনছি, প্রতিভাদা কাকে ধমকাচ্ছেন, 'এই কি হয়েছে বল, শিগ্‌গির বল কি হয়েছে? তখন আমার হুঁশ হোল। দেখি, মিঠু মেয়েটি (পদ্মাদির বাড়ীতেই থাকে) সাষ্টাঙ্গে শুয়ে 'মা - মা - মা' করে কাঁদছে এবং বুকে ভর দিয়ে এগোবার চেষ্টা করে হাত বাড়িয়ে যেন মাকে ধরবার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময় সকলেই হতচকিত। সকলের দৃষ্টি মিঠুর দিকে। কি হোল? কি হোল? ধ্যানের বিঘ্ন ঘটল, বোধহয় সকাল নটা বাজতে পাঁচ মিনিট মত বাকি ছিল। মিঠু খালি বলছে, 'মা - মা', আর আসনে বসানো মায়ের ছবির দিকে হাত বাড়াচ্ছে। আলুলায়িত কেশে মিঠু উঠে বসল। মৃদুস্বরে আচ্ছন্নভাবে বলল, 'বালকগণ ধূপ ধরাও, কৃষ্ণ নাম কর।' গৌরদা 'হরেকৃষ্ণ' নাম করলেন। ধ্যান শেষে মিঠুকে আমরা প্রশ্ন করে করে যেটুকু জানলাম, বিবৃত করছি।

মিঠু মেয়েটি বিবাহিতা। কুমার প্রমথনাথ রায়ের বাড়ীতে চার পুরুষ ধরে ওদের আত্মীয়রা গৃহের কাজকর্ম করে। মেয়েটির বিবাহ সুপাত্রেই হয়েছিল। দুটি পুত্র সন্তান হওয়ার পর পারিবারিক গণ্ডগোলের জন্য শ্বশুরালয় থেকে চলে আসে। পদ্মাদি ওকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং এই সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে ওকে এই গোবিন্দপুরে নিয়ে এসেছেন। মিঠু রোজ ভোরবেলা স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ব্রতীদের তরকারি কাটা, তাঁদের সব রকম ফরমায়েসি কাজকর্ম খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করত।

বাড়ীর বারান্দায় বসে মিঠু আনাজ কাটছিল। গত তিন দিন ও ঘরের মধ্যে বসে আনাজ কেটেছিল। আশ্চর্য্য ও আজকে নিজের খেয়ালেই বারান্দায় বসে কাটছিল। হতেই তো হবে, মা যে আসবেন, মা তো আর ঘরে ঢুকবেন না। মাকে মিঠু দেখেনি। মায়ের অনেক ছবি দেখেছে। সময়টা ছিল আমাদের ধ্যানের সময়, চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ ছিল। মিঠু শুনেছিল,

এই মা সকলের মা এবং যে মন প্রাণ এক করে ডাকতে পারে, মা তার ডাকে সাড়া দেন। রোজকার মত আনাজ কাটার সময় সে কাঁদতে কাঁদতে মাকে জানাচ্ছিল, তার সাংসারিক দু:খের কথা।

সংযম ব্রতর এই চারদিনের দিন মিঠু মায়ের সাড়া পেল। হঠাৎ দেখে তার ঠিক পাশে দুখানা সুন্দর চরণ এবং লাল পাড় শাড়ি। ভেবেছিল হয়তো পদ্মাদি। শ্রীশ্রী মা ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করছিস ?' মিঠু মুখ না তুলেই উত্তর দিল, 'সবজি কাটছি।' মা বললেন, 'আমার হাত ধর, চল ঐ মন্দিরে যাই।' তখন মিঠু তাকিয়ে দেখে ফটোর মা, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা। ও তখন 'মা' বলে মায়ের পাদুটো জড়িয়ে ধরল। তারপর মায়ের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মায়ের ঘরের দিকে চলল। মা ঠিক যেভাবে আলতো করে হাত ধরতেন, মিঠু অবিকল মায়ের সেই ভাবটি দেখাল।

তখনো আমাদের সকালের ধ্যান চলছে, শেষ হয়নি। হঠাৎ সশব্দে দরজা খুলে মিঠুর হাত ছেড়ে দিয়ে মা ঘরের মধ্যে মায়ের আসনে বসানো মায়ের ছবির মধ্যে গিয়ে মা বসে পড়লেন। মিঠু উপুড় হয়ে পড়ল, বুকে হামাগুড়ি দিয়ে মাকে ধরবার জন্য এগোচ্ছে আর 'মা, মা' বলে কেঁদে কেঁদে ডাকছে। ঠিক এই সময় সকলেই চমকিয়ে উঠে মিঠুর দিকে তাকালেন। প্রতিভাদা ধমকিয়ে মিঠুকে বসালেন। আচ্ছন্নভাবে মিঠু বলল, 'বালকগণ ধূপ ধরাও, কৃষ্ণ নাম কর।'

উপরোক্ত কথাগুলো সব মিঠুর কাছ থেকে শোনা। শেষের টুকু তো আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। পরে প্রতিভাদা বলেছিলেন, 'মিঠু বেশীদিন ইহজগতে থাকবে না।' দুর্ভাগ্যবশত: হোক বা সৌভাগ্যবশতই হোক, মা মিঠুকে এক বছরের মধ্যেই পরের নভেম্বরে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিলেন। মিঠুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে আমরা সকলেই মর্মাহত হলাম। যা ভবিতব্য তা ঘটবেই। মিঠু মায়ের স্থূল শরীর দর্শন করবার ও স্পর্শ করবার সৌভাগ্য পেয়েছিল।

মন প্রাণ এক করে মাকে ডাকতে পারলে মা সাড়া দেন, এটা নিশ্চিত। কোনো সন্দেহ নেই। এই রকম অপূর্ব্ব অনুভূতির আনন্দে গোবিন্দপুরে আমাদের সংযম সপ্তাহ মহাব্রত উদযাপিত হয়। আমরা ব্রতীরা মহাভাগ্যবান, মাকে স্থূলশরীরে আনাতে সক্ষম হলাম। মা প্রতিভাদাকে বলেছিলেন, 'আনালেই আসব।' মায়ের শ্রীমুখ নি:সৃত কোন বাণী ব্যর্থ হবার নয়। ব্রতী ভক্তবৃন্দ ধন্য। মিঠু ধন্য। গোবিন্দপুর, 'গোবিন্দের জায়গা' ধন্য।

(ক্রমশ :)

আশ্রম - সংবাদ

ভগবান মহাকালের কালচক্র নিত্য গতি শীল। কালের দিনলিপিতে জগতের নিত্য নূতন সংবাদ সমাবেশিত হয়ে আসছে আবহমানকাল ধরে। তারই মধ্যে সমাবিষ্ট হল শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের উৎসব মুখর দিনের কিছু সংবাদ।

দেরাদুন —

দেরাদুন স্থিত শ্রীশ্রী মায়ের কিষণপুর আশ্রমে ১৮ই জুলাই হতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের অনুরাগী ভক্ত শ্রীমতী মালতী ভার্গব ও শ্রী প্রকাশ নারায়ণ পাঠকজীর উদ্যোগে অখণ্ড রামায়ণের বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। শহরের বহু ভক্তবৃন্দ এই কার্য্যক্রমে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেন।

২০শে গুরুপূর্ণিমার দিন মাতৃ মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি এবং বিরাট ভাবে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় শত-শত ভক্ত আশ্রমে বিশেষ আনন্দ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

দেরাদুন স্থিত শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের সুব্যবস্থার মূলে রয়েছেন আশ্রম কমিটির অধ্যক্ষ পুরাতন ভক্ত শ্রী অযোধ্যা প্রসাদ দীক্ষিতজী এবং সচিব শ্রী জী.এল. গঞ্জু।

কনখল —

(১) ভাগবত সপ্তাহ

শ্রীশ্রী মায়ের কনখল আশ্রমে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমতী উত্তরা চিনুভাই। ব্যাখ্যাতা বৃন্দাবনের স্বামী রুদ্রদেবানন্দজী।

(২) দুর্গাপূজা

শরতের নির্মল আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস আভাস জানিয়ে দেয় দেবী দুর্গার আগমনের। চারদিকের স্বচ্ছপরিবেশ, গুচ্ছ-গুচ্ছ মালতী-মাধবী-শিউলী ফুলের বাহার হৃদয় সায়রে আনন্দের ঢেউ তুলে দেয়। তারই বহি:প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় প্রকৃতির শ্যামল শোভায়। ঘরে ঘরে বেজে ওঠে আগমনীর গান। প্রতিবছরের মত এবারও শ্রীশ্রী মায়ের কনখল আশ্রমে মাতৃভক্ত শ্রীরাম পঞ্জবানী ও শ্রীমতী সন্তোষ পঞ্জবানীর সক্রিয় যোগদানে গত ১৭ই অক্টোবর হতে ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পূজকের আসনে বসেছিলেন মাতা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, আর তন্ত্রধার ছিলেন আশ্রমের বরিষ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রী নির্ব্বাণানন্দজী।

১৭ ই সায়াহ্নে দেবী দুর্গার বোধন, ১৮ ই ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ এবং আমন্ত্রণ অধিবাস, ১৯ শে মহাসপ্তমীবিহিতপূজা, ২০ শে মহাঅষ্টমীবিহিত পূজা, সন্ধিপূজা, পরে মহানবমীবিহিত পূজা এবং হোম ইত্যাদি হয়। যদিও পরের দিন সকাল ৭ টা পর্য্যন্ত সময় ছিল কিন্তু সময়াভাবের জন্য আগের দিনই সব সমাপিত হয়। ২১ শে মহাদশমীবিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এবার বহিরাগত ভক্তের সংখ্যা যদিও স্বল্প ছিল, কিন্তু তবুও শান্ত পরিবেশে সুন্দরভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৬ শে অক্টোবর শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এবং শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা ১০ই নভেম্বর যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন ছিল অন্নকুট।

(৩)সংযম সপ্তাহ

প্রতিবারের মত এবারও কনখল আশ্রমে আনন্দজ্যোতি পীঠমের পবিত্র সান্নিধ্যে ৪৭ তম সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সংযম সপ্তাহের পূর্বসন্ধ্যায় ১৭ ই নভেম্বর উদ্ঘাটন সমারোহ ধূমধামসহ সম্পন্ন হয়। সমারোহে হৃষিকেশের দিব্যজীবন সংঘের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ, কৈলাস-পীঠাধীশ্বর মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজী, জগদ্গুরু আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দজী, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী শ্যামসুন্দরদাসজী, রাষ্ট্রীয়সন্ত শ্রী মোরারী বাপু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের বেদপাঠের দ্বারা অনুষ্ঠানের আরম্ভ। স্বামী ভজনানন্দজী (পুষ্পদি) কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের সঙ্গে মায়ের স্তবগান করেন। এরপর স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ সংযমের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভিত ভাষণ দেন। স্বামী শ্যামসুন্দরদাসজী সুন্দরভাবে সকলের পরিচয় দেন। এরপর শ্রী মোরারী বাপু শ্রীশ্রী মায়ের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন। তাঁর পরে স্বামী প্রকাশনন্দজী মহারাজ এবং সর্বশেষে স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ বলেন। প্রণাম মন্ত্রের পর উদ্ঘাটন সমারোহের সমাপন হয়।

পরদিন সকাল থেকে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হয়। এবারে উপনিষদের ব্যাখ্যা মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দজী করেন। বিকালে পুরাণ পাঠের বক্তা ছিলেন স্বামী চিদানন্দজী নামে এক নতুন সন্ন্যাসী। এ ছাড়া সপ্তাহব্যাপী এই মহদ্ অনুষ্ঠানে মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মহরিজী মহারাজ, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী হংসপ্রকাশজী, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী, স্বামী নরেশানন্দজী ও স্বামী বেদব্যাসানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মাগণের অমৃতময় উপদেশে ব্রতীরা লাভান্বিত হন। প্রতিদিন রাত্রিতে পূজনীয় স্বামী চিদানন্দজীর ভাষণ সংযমের প্রধান আকর্ষণ ছিল। মাতৃপ্রসঙ্গে এক একজন এক এক দিন অংশ গ্রহণ করেন।

শেষের দিন মহানিশার ধ্যানের পূর্বে মায়ের বিডিও দেখানো হয়। ধ্যানের পর স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ সকলকে সংযমের প্রসাদ বিতরণ করেন। পরের দিন মায়ের মন্দির প্রণাম

ও যজ্ঞের ফোটা নিয়ে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের উদ্‌যাপন হয়।

প্রতিবারের মত এবারেও সংযমের শেষে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী রমেশ ভাণ্ডারীজী কনখল আশ্রমে আসেন। প্রথমে তিনি মায়ের সমাধিতে মালা অর্পণ করেন। সঙ্গে ছিলেন শ্রী বৃজনন্দন স্বরূপ, রাজ্যপালের বরিষ্ঠ পারামর্শদাতা এবং মায়ের পুরাতন ভক্ত ও অন্যান্য অধিকারীগণ। আনন্দজ্যোতিপীঠমে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা বেদপাঠ ও স্বামী ভজনানন্দজীর সঙ্গে স্তবগান করে। রাজ্যপাল কনখল আশ্রমে সমাধি মন্দির, শ্রী শঙ্করাচার্য্যের হল প্রভৃতি পরিদর্শন করে খুবই আনন্দিত হন।

বারাণসী —

(১) সংস্কৃতদিবস

গত ৯ই সেপ্টেম্বর মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের সংস্কৃত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডা: মণ্ডন মিশ্র, ব্যাকরণের অধ্যক্ষ ডা: আদ্যা প্রসাদ মিশ্র, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যাপক ডা: শ্রী নারায়ণ মিশ্র, প্রাক্তন প্রাধ্যাপক ডা: রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী, ডা: ত্রিনাথ শর্মা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন।

কার্য্যক্রমের প্রারম্ভে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা বেদ ঘোষ এবং প্রধানাচার্য্যা জয়া ভট্টাচার্য্য স্বাগত ভাষণ করেন। প্রারম্ভিক ভাষণে ব্রহ্মচারিণী গীতা বলেন, "এই বিদ্যানগরী কাশীধামে ডা: মণ্ডন মিশ্রজীর শুভাগমনে সকলের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। ওঁর সার্থক প্রচেষ্টায় মহামহিম রাষ্ট্রপতিজীরও কাশীতে শুভাগমন হয়েছে এবং সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। এর জন্য সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

এরপর কন্যাপীঠের কন্যাদের স্বাগত গান, শান্তিপাঠ, কুলগীত এবং বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত ভাষণ মালা সম্পন্ন হয়।

বিদ্বানদের মধ্যে ডা: ত্রিনাথ শর্মা, ডা: মনুদেব ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ভাষার মহিমা সম্বন্ধে বলেন। ডা: মুরলীধর পাণ্ডে বলেন, "মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের মত আর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান নেই।" ডা: শ্রী নারায়ণ মিশ্র বলেন, "কন্যাপীঠে প্রতিদিনই সংস্কৃতদিবস অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কন্যারা সংস্কৃতে কথা বলে। ছাত্রীদের আচরণ সংস্কৃতময়।"

মুখ্য অতিথিরূপে ডা: রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী বলেন যে বস্তুত: সংস্কৃত দিবস কাশীদিবস। বিদ্যানগরী কাশী সংস্কৃত বিদ্যারই নামান্তর। সুতরাং কাশীনগরী সুরভারতী নগরী, সংস্কৃত নগরী। তিনি আরো বলেন বাল্যকাল হতেই বালক বালিকাদের সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সমারোহের সম্মানিত অতিথি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকরণাধ্যক্ষ ডা: আদ্যা প্রসাদ মিশ্র বলেন, "আজকের এই ভ্রষ্টাচারের যুগে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের প্রাসঙ্গিকতা আরোও বেশী

করে দেখতে পাই। মেয়েদের সংস্কৃত ভাষায় এই সুন্দর কার্য্যক্রমের পিছনে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাই রয়েছে।"

সভাপতির আসন হতে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডা: মণ্ডন মিশ্রজী বলেন, "সংস্কৃত ভাষাবিহীন ভারতের কোনো পরিচয় নেই। সংস্কৃত ভাষা অমরবাণী। সংস্কৃত ভাষা সর্বদাই সুরক্ষিত রয়েছে। সংস্কৃত দিবস অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য শুধু সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসার নয়, ভারতরাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসার অতি আবশ্যক। আজ সম্পূর্ণ বিশ্বে সংস্কৃত ভাষার অতি সমাদর পরিলক্ষিত হচ্ছে। লণ্ডনে একটি বিদ্যালয়ে অনিবার্য্যরূপে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন করানো হয়। মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান।" সর্ব্বশেষে তিনি শ্রীশ্রী মায়ের চরণ বন্দনা করে বলেন যে অতি আনন্দের বিষয় যে এই বিদ্যানগরী কাশীতে সংস্কৃত বিদ্বানদের পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সম্পূর্ণ কার্য্যক্রম সংস্কৃত ভাষাতেই অনুষ্ঠিত হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভার সমাপন হয়।

(২) আশ্রমের বিভিন্ন অনুষ্ঠান

ভাগবত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৯ শে সেপ্টেম্বর হতে ২৬ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কাশী আশ্রমে ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন কন্যাপীঠের ব্যাকরণের অধ্যাপক ডা: দ্বারকা প্রসাদজী।

দুর্গাপূজার তিনদিনই শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মন্দিরে ও আনন্দজ্যোতির্মন্দিরে যোড়শোপচার পূজার আয়োজন হয়। কীর্ত্তন ও ভোগরাগাদিও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমীর দিন ২৭ জন কুমারীদের বস্ত্রসহ ভোজন করানো হয়। ২৬ শে অক্টোবর আশ্রমে শ্রীশ্রী শারদীয়া লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ শে অক্টোবর হতে ৪ ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত আর একটি ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ব্যাখ্যাতা ছিলেন ভাগবত সম্রাট স্বামী অখণ্ডানন্দজীর শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী। উদ্যোক্তা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অন্ধ্রপ্রদেশবাসী শিষ্যদম্পতি। এই উপলক্ষ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অনেক ভক্তশিষ্যরা সমবেত হয়েছিলেন।

১০ই নভেম্বর রাত্রে শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা ও ১১ই নভেম্বর অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবারে মন্দিরে একটু নতুন ধরণের অন্ন সাজানো সকলেরই খুব ভাল লেগেছে।

বারাণসী আশ্রমে কন্যাপীঠের পক্ষ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর হতে ২০ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে সমবেত গীতাপাঠ ও বিকালে গীতার ব্যাখ্যা। একাদশীর দিন সম্পূর্ণ গীতা পাঠ ও ১৮টি থালায় আঠারো রকমের ফল সাজিয়ে ১৮ প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবান পার্থ সারথির পূজা হয়েছে।

(৩) মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে নি:শুল্ক চিকিৎসা শিবির

রোটারী ক্লাব বারাণসী সানরাইজের তত্ত্বাবধানে গত ১৩ই অক্টোবর মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে মেডিসিন ব্যাঙ্ক এবং মেডিকাল ক্যাম্পের উদ্ঘাটন কাশীর প্রধান চিকিৎসাধিকারী ডা: এ.কে. দ্বিবেদী করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা রাষ্ট্রীয় গান ও মাতৃ বন্দনা করে।

এই উপলক্ষ্যে ডা: ইন্দু সিংহ সামুহিক সেবা ও মেডিকাল ক্যাম্প সম্বন্ধে বলেন। প্রমুখ অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: এস.কে. সরাফ এবং ডা: রাজেশ অগ্রবাল মেডিকাল ক্যাম্পের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ডা: ও.পী. জয়সবাল নিজের একদিনের বেতন মেডিকাল ব্যাঙ্কে দান করেন। ডাক্তার সুমন জৈন ও ডাক্তার সুনীল মিশ্র মেডিসিন ব্যাঙ্কে ওষুধ প্রদান করেন। হাসপাতালের চিকিৎসাধিকারী ডা: প্রভাস চন্দ্র সেন মেডিকাল ব্যাঙ্কের সংচালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বহু বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। প্রায় চারশত রোগীদের নি:শুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ প্রদান করা হয়। মুখ্য প্রবন্ধক ডা: বি.কে. অগ্রবাল, ডা: ইন্দুমোহন গুপ্ত, ডা: পী.এন. সোমানী এবং ডা: এস.সী. গোয়েল অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আগরপাড়া —

প্রতি বছরের মত এবারও শ্রীশ্রী মায়ের আগরপাড়া আশ্রমে শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পূজাতে সকলেরই বিশেষ আনন্দ অনুভূত হয়।

রাঁচী —

শ্রীশ্রী মায়ের রাঁচীর আশ্রমে প্রতিবারের মত শারদীয়া দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, শ্যামা পূজা, অন্নকূট ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে চণ্ডীপাঠ, কীর্ত্তন, ভজন, ভোগরাগাদি সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

উত্তরকাশী —

শ্রীশ্রী মায়ের অতি প্রাচীন আশ্রম উত্তরকাশী স্থিত কালীমন্দিরে ১০ই নভেম্বর মধ্যরাত্রে উত্তরকাশী আশ্রম কমিটির অধ্যক্ষ স্বামী সম্বিদানন্দজী এবং সচিব শ্রী রামচন্দ্র নোটিয়ালের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সুন্দরভাবে শ্রীশ্রী কালীপূজা এবং পরদিন প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল।

■

শোক - সংবাদ

১. স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি —

আশ্রমবাসী ও মাতৃভক্তগণের সকলেরই অতিপ্রিয় চিন্ময়ানন্দজী গত ১৩ ই অক্টোবর অতি শুভদিনে শ্রীশ্রী মায়ের চির শান্তিময় ক্রোড়ে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন।

১৯৪০ এর দশকে শ্রী মৃন্ময় চৌধুরী নামে আসাম শ্রীহট্টবাসী এক সুদর্শন যুবক মায়ের শ্রীচরণ প্রান্তে এসে উপনীত হন। তাঁর অধ্যাত্মপথের প্রতি নিষ্ঠা, অনন্যতা, সরলতা, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি অসামান্য গুণ দেখে সকলেই তাঁর প্রতি প্রীত হন। মাতৃনির্দেশে তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে আলমোড়া আশ্রমে মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠেও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তখন তাঁকে সকলে মৃন্ময় ব্রহ্মচারী বলেই সম্বোধন করতেন। সাবিত্রী মহাযজ্ঞের সময়ে বারাণসী আশ্রমে মাতৃনির্দেশে যজ্ঞশালায় তিনি আহুতির সংখ্যা অনুযায়ী গায়ত্রী জপ করতেন এবং অন্যান্য সেবার কাজও করতেন।

মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির পর ১৯৫০ সনে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে বারাণসীর পবিত্র আশ্রমে মৃন্ময় ব্রহ্মচারী আশ্রমের আরো কয়েকজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে স্বামী মুক্তানন্দ গিরি (দিদিমার) কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের প্রক্রিয়া দিয়েছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতীজী। সন্ন্যাসের পর নাম হল স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি।

চিন্ময়ানন্দজী নানা স্থানে যথা দিল্লী, বারাণসী, আগরপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রমে দীর্ঘ সময় যাবৎ দেখাশুনার ভার নিয়ে ছিলেন। কিছুদিন যাবৎ চিন্ময়ানন্দজী আগরতলা আশ্রমে ছিলেন। তাঁর শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। মায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কনখলে মায়ের জন্মোৎসবে চিন্ময়ানন্দজী এসেছিলেন। কনখল থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরে যান। সেখানে আগরপাড়া আশ্রমে চিন্ময়ানন্দজী বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানেই গত ১৩ ই অক্টোবর তিনি মাতৃচরণে চির শান্তি লাভ করেন। তাঁর প্রয়াণে আশ্রমের পুরাতন সাধুদের মধ্যে একজন প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধুর স্থান চিরতরে রিক্ত হয়ে গেল, যা আর কোনদিন পূর্ণ হবে না। আশ্রমবাসী ও মাতৃভক্তদের হৃদয়ে চিন্ময়ানন্দজী অমর হয়ে থাকবেন।

২. শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (শোভন মহারাজ)

শ্রী শোভন মহারাজ পশ্চিম বঙ্গ বহরমপুরের সম্ভ্রান্ত বংশের শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন ভক্তপরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর আত্মীয় শ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায় মায়ের বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

শোভন মহারাজ ১৯৪২/৪৩ সনে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে এসে উপনীত হন। সেই সময়ে তিনি বেশ কিছুদিন মায়ের দেরাদুন স্থিত রায়পুরে ও দেরাদুন আশ্রমে বাস করেন। মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠেও তিনি কিছু সময় ব্রহ্মচারীদের দেখাশুনা করেছেন। মাতৃ নির্দেশে তিনি কলকাতায় একডালিয়া রোডের আশ্রমে সেবা পূজার ভার গ্রহণ করেন। সেখানে কিছু সময় থাকার পর তিনি মায়ের চরণে প্রার্থনা নিবেদন করেন যে তিনি একান্তে সাধন ভজন নিয়ে থাকতে ইচ্ছুক।

রাণাঘাটে হিজুলী গ্রামে শোভন মহারাজ 'কৃষ্ণকুটীর' স্থাপনা করেন। মন্দিরে শ্রী শ্যামসুন্দরের মধুর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। পরবর্ত্তীকালে শোভন মহারাজ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নামেই পরিচিত হন। শ্রীশ্রী মা স্বয়ং রাণাঘাটে কয়েকবার গেছেন। মায়ের কোলে শোভন মহারাজের কৃষ্ণ মা বাটি করে দুধ খাওয়াচ্ছেন; এই অপরূপ মায়ের ছবি সকলেরই অতিপরিচিত। শেষবার মা ৬ই মার্চ, ১৯৭৪ সনে রাণাঘাটে যান।

শোভন মহারাজ রাণাঘাট হতে বারে বারেই বিভিন্নস্থানে মাতৃদর্শনে মায়ের আশ্রমে এসে উৎসবে যোগদান করতেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। তাঁর কীর্ত্তন, ভজনে সকলেই আনন্দ পেতেন।

গত অক্টোবর মাসে শ্রী শোভন মহারাজ সাধনোচিত ধামে গমন করেন। আমরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

৩. শ্রীমতী লীলাবতী শাহ—

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বি.কে. শাহর সুযোগ্যা স্বহধর্মিণী শ্রীমতী লীলাবতী শাহও অক্টোবর মাসে বোম্বেতে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে চিরতরে লীন হন।

লীলাবেন ১৯৫৪ সনে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বম্বেতে প্রথম মাতৃদর্শন করেন। শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির অসুস্থতার সময় শ্রীযুক্ত বি.কে. শাহ দিদির সম্পূর্ণ চিকিৎসার ভার সাগ্রহে স্বত: প্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করেন। মা তাঁকে দিদির ভাই করে দেন। তাই তিনি সকলেরই 'ভাইয়া' রূপে সুপরিচিত ছিলেন।

বম্বেতে ভিলেপার্লেতে তাঁর নিজের বাসভবনে শ্রীশ্রী মার জন্য প্যাগোড়ার স্থাপত্য কলার অনুকরণে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। মা বম্বে গিয়ে সেখানেই থাকতেন। লীলাবেন মায়ের সঙ্গের সমস্ত সাধু, সন্ত, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণীদের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করতেন।

লীলাবেন ছিলেন স্যার মনিলাল নানাবতীর কন্যা, অতি সুরুচি সম্পন্না, রন্ধনকলায় সুনিপুণা। তাঁর রন্ধনকলার উপর লেখা বই বাজারে সমাদৃত হয়েছে।

শ্রীশ্রী মায়ের হীরক জয়ন্তীর সময় বারাণসী আশ্রমে প্যাণ্ডেলের সাজানোর দায়িত্ব লীলাবেন নিজে গ্রহণ করেছিলেন। বহু জায়গায় তিনি মার জন্মোৎসবের সময় তিথিপূজার বেদী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজাতেন।

লীলাবেন সব পরিস্থিতিতে সব অবস্থায় নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিতে পারতেন। বিবাহের পর যদিও তাঁর স্বামীর আর্থিক অবস্থা তাঁর পিতৃগৃহের অনুরূপ ছিল না, তবুও তিনি কখনো অনুযোগ করেন নি। পরে অবশ্য শ্রী বি.কে. শাহ উন্নতির চরমোৎকর্ষে পৌঁছে ছিলেন। লীলাবেন অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর পতি প্রেমও অদ্ভুত ছিল। মায়ের প্রতি তাঁদের দুজনেরই অবিচলা ভক্তি ছিল; যা মাতৃভক্তদের আদর্শ স্থানীয় ছিল।

লীলাবেনের শরীর বহুদিন হতেই খারাপ ছিল। শ্রীযুক্ত বি.কে. শাহ গত হওয়ার পর

তাঁর শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। গত অক্টোবর মাসে নিজের দুই পুত্র সুধীর ও সঞ্জয়, দুই পুত্রবধূ, কন্যা সুনয়না, জামাতা পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীদের রেখে তিনি পরম ধামে গমন করেন। আমরা মায়ের চরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

৪. ডা০ চেন্না রেড্ডী —

বিশিষ্ট রাজনেতা, কুশল প্রশাসক এবং শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত মাদ্রাজের রাজ্যপাল ডা: চেন্না রেড্ডী গত ২রা ডিসেম্বর প্রাতে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সেকেন্দ্রাবাদে ৭৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

দিল্লীতে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালে শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম দর্শন লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত করলেও ১৯৭৪ হতে তিনবছর উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল রূপে অবস্থান কালে ডা: রেড্ডী সপরিবারে শ্রীশ্রী মায়ের নিকট সম্পর্কে আসার এবং বিশেষ কৃপা লাভের সুয়োগ লাভ করেন। বহুবার তিনি নৈমিষারণ্য, বারাণসী, বৃন্দাবন, দেরাদুন ও কনখল আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের দর্শনের জন্য সস্ত্রীক এসেছেন।

ডা: রেড্ডীর সাদর আহ্বানে শ্রীশ্রী মা দুইবার সেকেন্দ্রাবাদ স্থিত তাঁর বাসভবনেও পদার্পণ করেন। শ্রীশ্রী মায়ের নিবাসের জন্য তাঁর বাড়ীর বাগানে নির্ম্মিত অতি সুন্দর কুটিয়া এখনও সেখানে দেবালয় রূপে শোভা পাচ্ছে।

১৯৮২ সনের অগাষ্ট মাসে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল রূপে অবস্থান কালে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পেয়েই তিনি দেরাদুন স্থিত কিষণপুর আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য আসেন। সেই তাঁর অন্তিম দর্শন লাভের সুযোগ।

শ্রীশ্রী মার সহিতই ১৯৭৫ সনে ডা: চেন্না রেড্ডীর নৈমিষারণ্যে প্রথম আগমন হয়েছিল। সেই সময় থেকেই প্রাচীন তীর্থ নৈমিষারণ্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। নৈমিষারণ্যের সব রকম উন্নতির মূলে রয়েছে ডা: রেড্ডীর অতুলনীয় অবদান যা চিরদিনের জন্য নৈমিষারণ্যবাসীর স্মরণে থাকবে।

নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে অবস্থিত পুরাণ মন্দির দর্শন করেই স্বতন্ত্রভাবে একটি পুরাণ ও বেদ শোধ সংস্থান-স্থাপনার বিশেষ সংকল্প তাঁর মনে জেগে ওঠে এবং শ্রীশ্রী মার আশীর্ব্বাদ নিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিশিষ্ট শোধ সংস্থানের স্থাপনা করেন। ঐ সংস্থানের সহিত শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন আজীবন অধ্যক্ষরূপে।

ডা: রেড্ডীর অকস্মাৎ পরলোক গমনে শ্রীশ্রী মায়ের ভক্ত পরিবারের এবং বিশেষ করে নৈমিষারণ্য শোধ সংস্থানের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা বর্ণনা করা অসাধ্য।

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘ শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশন বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ :—

★ Pictorial Biography of Ma—মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র-সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ মূল্য ৩৫০/- ইংরাজি সংস্করণ ৪৫০/-

★ মাতৃদর্শন— শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত মূল বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় গ্রন্থ। ডবল ক্রাউন ১/১৬, ১৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৫/-

★ বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা — মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত বাংলায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ডা: গীতা ব্যানার্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/-

★ আনন্দ জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনা পঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্বাচিত শত উদ্ধৃতি, মাতৃ-আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিবৃতিমূল ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী-নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোকচিত্রের বহু-সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। বিক্রয়মূল্য ১০০/

★ In your heart is my abode—ডক্টর বীথিকা মুখার্জী রচিত ইংরাজিতে মায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত সার এবং শ্রীশ্রী মায়ের শত উপদেশ। কাগজে বাঁধাই, মূল্য ২০/-

★ Matri Vani—মায়ের অমূল্য উক্তিগুলির ইংরাজিতে সংকলন। হাতে রাখার মত আকার। মূল্য ২০/-

★ Words of Sri Anandamayee Ma—মায়ের অতিমূল্যবান আলোচনা আত্মানন্দ (কুমারী ব্ল্যাংকা শ্লাম) কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজিতে অনুদিত। আকারে ডবল ক্রাউন ১/১৬, ২৪০ পৃষ্ঠার বই, মূল্য ৩০/-

★ Mother as seen by her devotees—বিশিষ্ট বিদ্বৎমণ্ডলী ও শ্রীশ্রী মায়ের প্রধান ভক্তদের ইংরাজিতে লেখা মাতৃ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীর সংকলন। আকারে ডবল ডিমাই ১/১৬, পৃষ্ঠা ১৭৬, মূল্য ৩০/-

★

MATA ANANDAMAYEE HOSPITAL

SHIVALA, VARANASI-221001

A SPECIAL APPEAL

Established through the blessings of Shree Shree Ma with the sole object of rendering real service to the ailing humanity, irrespective of any distinction this hospital, which was planned and designed by one of the best hospital planners of India, fervently appeals to all to extend financial assistance towards the under-mentioned noble purposes :

1. Creation of a Special Fund for giving **Free Medical Relief to the Poor**, including free eye operations.

2. Construction of additional 12 rooms with all modern facilities for patients. Any donor paying Rs. 1.00 lakh will have the privilege of getting one room specially earmarked in the memory of his/her near and dear one with a marble plaque fixed in front of the room.

Donations for any of the above purposes, which will be exempt u/s 80-G of the I.T. Act, should be sent through Bank Drafts/Cheques drawn in favour of **Shree Shree Anandamayee Sangha—Mata Anandamayee Hospital A/C** per registered post to :

Secretary
Mata Anandamayee Hospital,
Shivala, Varanasi-221001.

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE KANYAPEETH
BHADAINI, VARANASI-221001

Based on the ideal of ancient India's Gurukula tradition this purely residential institution for young girls imparts intensive training to them in the formative period of their lives, not only in the field of *dhyana*, *japa*, Yogic *asanas*, truthfulness, complete self-reliance and so on, but also in modern education, music (both vocal & instrumental), sewing, cooking etc. to make them the ideal women of this country in the future.

(i) Admission age—Minimum five, maximum twelve years.

(ii) Essential qualifications—Must be of a good upbringing, bright, of a gentle nature and without any physical deformity. No orphans are admitted.

(iii) Duration of stay in the institution—Till the completion of minimum High School standard (*Purva-Madhyama*).

(iv) General education—From Primary level to M.A./Acharya of recognised universitites, including doctorate degrees in Sanskrit/Hindi.

(v) Seats very limited.

(vi) Session begins from July.

(vii) Monthly expenses—Rs. 600/- per month per student covering all expenses.

For other particulars please write to :

Secretary,
Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth
Bhadaini, Varanasi-221001
Phone : 311794

❈ Branch Ashrams ❈

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, Maharashtra.

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P.

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 310054+311794)

23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, U.P.

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

মা আনন্দময়ী

VOL. 1 APRIL 1997 No. 2

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P.
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, Gujarat
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009
U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road,
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P.
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel:426575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P.
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী——অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ—১ এপ্রিল, ১৯৯৭ সংখ্যা—২

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারতে—৬০/- টাকা
বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা
প্রতি সংখ্যা —২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

★ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে । পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয় ।

★ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমুল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য । অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে । নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে ।

★ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক । কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক ।

★ বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্মলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম ঃ
Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c

★ পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাদি নিম্মলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে-

Managing Editor,
Ma Anandamayee—Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221001

★ ★ ★ ★ ★

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা--২০০০/- বাৎসরিক ।
অৰ্দ্ধেক পৃষ্ঠা -- ১০০০ বাৎসরিক ।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী-১০ হইতে মুদ্রিত । সম্পাদক-শ্রী পানু ব্রহ্মচারী ।

বিষয় সূচী

■

"হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।।"

—শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

★ শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নাম যজ্ঞের ক্যাসেট নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ :

★ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
★ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
★ মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

★ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত দ্বিতীয় ক্যাসেট "আনন্দ সংগীত" প্রকাশনার প্রাক্‌পর্ব্বে আছে।
গায়ক — শ্রী জয়ন্ত পাঠক।

A rare photo of Ma taken in Varanasi Ashram in January, 1950

মাতৃ বাণী

সংকলক - চিত্রা ঘোষ

নব বৎসর ভগবানের বিশ্বরূপ তাঁহার নিত্য নূতন নূতন রূপ - অরূপও যে। সেই তাঁর দর্শন নিরন্তর চেষ্টা।

● ● ●

মাটির সরার ভিতরে প্রদীপ আছে। সরা ভেঙ্গে গেলে দীপ স্বয়ং প্রকাশিত। তেমনি আমাদের মধ্যে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত আছেন। আমার কর্ম দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত আ-ছে-ন। সজ্ঞান আবরণ মাটির সরা। সাধনা-কর্ম শুধু সেই আবরণ হটায়।

● ● ●

অশুভ সংস্কার ত্যাগ। নিজে ত্যাগ করা মানে আমি করছি। অহংভাব এসে পড়ে। এটা আসল ত্যাগ নয়। আপনা থেকে যখন ত্যাগ হয়। একটা ছাড়লে আরেকটা ধরলে। শুভ সংস্কার। তুমি এগিয়ে চলো, যা ত্যাগ হবার আপনি হয়ে যাবে।

● ● ●

প্রত্যেকের মধ্যে সাধকত্ব যোগিত্ব আছে — তাই না। সে সাধক যোগী হতে পারে, যা আছে তারই প্রকাশ। বিকাশ বীজের মধ্যে ভাবী বৃক্ষের সব কিছু অন্তর্নিহিত আছে। কেবল প্রকাশ বিকাশ নেই। মহাযোগী — যিনি বিশ্ব ব্যাপকের সঙ্গে যুক্ত।

● ● ●

নিজ জীবন মন সৎপথে চালিত করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য জীবন দুর্লভ, মানুষেরই ভগবান লাভ। যে কোনো পরিস্থিতিতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াতে থাকা। তিনি তাঁহার চরণে আশ্রয় দ্যান, এইটি মনে রাখা। সমগ্র ক্রিয়াই ভগবান হইতেই। যে ক্রিয়া যে নেবে তাহার ফলও তিনি দেবেনই-দ্যানই।

● ● ●

জগতে যত চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায়। তাহার শেষ কোথায়? যিনি প্রকাশের পূর্ব্বেই মার বুকে দুধ দিয়ে রাখেন সেই ভগবানের উপরই নির্ভর স্মরণ।

● ● ●

হচ্ছে না-হবে না! এত বছর এতো করলাম কী হলো, মা? দোকানদারীর মতন দর কষাকষি। দিবিনা, তবে চল্লাম। যত তীব্রভাব আসা ততই ভাল। এ পথে যা করা পারমার্থিক কাজ।

● ● ●

প্রত্যেক সময় ভাবা ভগবান যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র। সম্পূর্ণ তাঁর হাতে সমর্পণ। নিয়তি অকাট্য। কাটানো যায় না। তবে কোনো সৌভাগ্যে যদি বলবান শক্তির সঙ্গে যোগ হয় তাহলে নিয়তিকে কাটানো যায়।

● ● ●

সত্য ভগবানেতে সব কিছু সম্ভব-অসম্ভব, অসম্ভব-সম্ভব। যে দিক নিয়ে মনে, সে দিক মনোরাজ্যের অন্তর্গত যতক্ষণ ততক্ষণ সমাধান হয় না। তৎ তিনি, যখন স্পর্শ দ্যান। এই সমাধান সম্পূর্ণ। গুরুদত্ত ক্রিয়ায় ব্রতী থাকা।

● ● ●

'বিপদকো বিপদ মনেই না করা। বিপদ মনে করাই পাপ। কিসের বিপদ ? তিনি যা করেন সবই মঙ্গল। সর্বক্ষণ কেবল মনে করা - গুরুদেব ! তুমি আমার জন্য যা ভাল, তাই করছ। এ সব জগতে হয়েই থাকে।

● ● ●

ভাল লাগুক আর না লাগুক, তাঁকে নিয়ে থাকতেই হবে। ঔষধ খাওয়ার মত গিলতেই হবে। তাঁকে ভাল না লাগলে যে চলবেই না। এরই নাম তপস্যা। এরই নাম সাধনা।

● ● ●

ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। ডাক্তার যেমন ফোঁড়া কেটে বিষাক্ত বস্তু বার করে রোগ নিরাময় করে, ভগবানও দু:খ দিয়ে ধুয়ে মুছে কোলে টেনে নেন। ভগবান সমস্ত দোষ শোধন করেন। বলেন — তোরা আমাকে সব মলিনতা দিয়ে দে, তার বদলে অমৃতত্ব গ্রহণ কর। ভক্তকে তিনি ব্যাথা দেন, দু:খ দেন, তার আগ্রহ আকুলতা বাড়াবার জন্য। তার ব্যথার পূজা, চোখের জল তিনিই গ্রহণ করেন।

■

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

—*শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত*

গল্পের সাহায্যে তত্ত্বোপদেশ

২৪ শে কার্ত্তিক, রবিবার। আজ মা একটি হাসির গল্প বলিলেন। মা বলিলেন, "এই গল্পটি হরিবাবার দলের লোকেরা যে সকল লীলা করে তাহা হইতে বলিতেছি। এক সাধু ছিলেন, তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই লোকের ভিড় থাকিত। একদিন এক সরল গ্রাম্য লোক সাধুর কাছে আসিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলে সাধু তাহাকে বলিলেন, "এত লোকের মধ্যেত দীক্ষা দেওয়া যায় না; যখন আমি একা থাকি তখন আসিও। লোকটি প্রত্যহই সাধুর কাছে আসিতে লাগিল, কিন্তু কখনও তাঁহাকে একা বসিয়া থাকিতে দেখিল না। ইহাতে একদিকে যেমন তাহার দীক্ষা লইবার ব্যাগ্রতা বাড়িল, আবার অন্যদিকে কখন সাধুকে একা পাওয়া যাইতে পারে সেই সন্ধান করিতে লাগিল। একদিন খুব ভোরে সে সাধুর খোঁজে আসিয়া দেখিতে পাইল যে সাধু মাঠের মধ্যে কমণ্ডলু লইয়া একা বসিয়া আছেন। ঐখানে তিনি মল ত্যাগের জন্য গিয়াছিলেন। সাধুকে একা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লোকটি মনে করিল যে এখনই তাহার দীক্ষা লইবার উত্তম সুযোগ। তখন সে সাধুর কাছে গিয়া বলিল, "মহারাজ, এখন আমাকে দীক্ষা দিন।" (সকলের হাস্য) তাহাকে দেখিয়া সাধু অন্যদিকে ঘুরিয়া বসিলেন। লোকটি আবার সাধুর সম্মুখে গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিল। সাধু যে দিকেই ঘুরিতেছেন, লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া তাঁহার সম্মুখে দীক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। (সকলের হাস্য) ইহাতে সাধু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ধত্তর! এধার, ওধার। এই কমণ্ডলু দিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিব।" সাধুর ঐ কথা শুনিয়া লোকটি মনে করিল যে উহাই বুঝি তাহার দীক্ষামন্ত্র। সে তখন খুসী হইয়া ঐখান হইতে চলিয়া গেল। ইহার পর সে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল এবং দিনরাত্র একাগ্র মনে ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গেল। একদিন কোন এক গ্রামে এক জমিদারের অল্প বয়স্ক একমাত্র পুত্রের দেহত্যাগ হইল এবং দৈবক্রমে ঐ লোকটিও সেদিন ঐ গ্রামে উপস্থিত ছিল। সে শুনিয়াছিল যে গুরুদত্ত মন্ত্র দ্বারা সব কিছুই করা যায়। কাজেই সে ঐ জমিদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সাধুর বেশ দেখিয়া সকলেই তাহাকে আদর করিয়া মৃত ব্যক্তির কাছে লইয়া গেল এবং সেও গুরুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিছু জল ঐ মৃতদেহের উপর ছিটাইয়া দিতেই ছেলেটি নূতন জীবন লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তখন ঐ জমিদার সাধুর পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে অনেক কিছু দিতে চাহিল, কিন্তু সে উহা গ্রহণ না করিয়া বলিল যে, সে গুরু কৃপাতেই ছেলেটিকে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। যদি কিছু দিতে হয় তবে জমিদার ঐ গুরুকে দিতে পারেন। এই বলিয়া সে নিজ মন্ত্র জপ করিতে করিতে ঐখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে ঐ জমিদার তাহার নিকট হইতে গুরুর নাম এবং ঠিকানা জানিয়া রাখিলেন।

কিছুদিন পরে ঐ জমিদার কয়েকখানা গাড়ীতে বহু জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া ঐ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে তাঁহার এক শিষ্য ঐ জমিদারের মৃত পুত্রের প্রাণ দান করিয়াছেন।

সেই জন্য তিনি ঐ সকল জিনিষ তাঁহার সেবার জন্য আনিয়াছেন। কিন্তু গুরু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলেন না যে তাঁহার কোন শিষ্য এই অসাধ্য সাধন করিল। ঠিক সেই সময়ই চেলাটি ঘুরিতে ঘুরিতে গুরু স্থানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া জমিদার বলিলেন, "এই যে আপনার এই শিষ্যটিই আমার ছেলের প্রাণদান করিয়াছেন।" কিন্তু লোকটিকে দেখিয়াও গুরুর স্মরণ হইল না যে তিনি ইহাকে চেলা করিয়াছেন কি না। তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কখন তিনি তাহাকে দীক্ষা দিয়াছেন এবং কি মন্ত্রই বা দিয়াছেন যাহার দ্বারা সে এই অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। শিষ্য তখন গুরুকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিল এবং জানাইয়া দিল যে তাহার মন্ত্র হইল, "ধত্তর, এধার ওধার, এ কমণ্ডলু দিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিব।" (সকলের হাস্য)।

মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজী (এক পাঞ্জাবী সাধু) নাম দিয়া মৃত ব্যক্তির প্রাণ সঞ্চারের কথা বলিল না? তাই এই গল্প বলা হইল। তবে এ গল্পটির খেয়াল কি ভাবে হইয়াছিল জান? গতকাল আমার খেয়াল হইয়াছিল যে কেবল কেনা ফুল দিয়াই গীতা জয়ন্তীর পূজা হইতেছে, আজ কেনা ফুলের সঙ্গে আশ্রমের গাছের কিছু ফুল দিলে হয়। তাই আমি ব্রহ্মচারীদের ডাকিয়া বলিয়াছিলাম যে আশ্রমের স্থল পদ্ম গাছে যে সকল পদ্মফুল ফুটিয়া আছে উহা যেন তাহারা আজ তুলিয়া না নেয়। উহা দিয়া গোপাল বাবা পূজা করিবে। রাত্রিতে আমার খেয়াল হইল যে আমার ঐ কথা হয়ত সকলে জানিতে পারে নাই। তাই খুকুনীকে রাত্রিতেই বলিয়া রাখিলাম যে সে যেন সকালে পদ্মফুল গুলি গোপাল বাবাকে দিয়া আসে। এদিকে আজ খুব ভোরে আশ্রমের মেয়েরা যখন দেখিল যে পদ্মফুল গুলি কেহ তুলিয়া নেয় নাই তখন তাহারা তাহাদের পূজার জন্য ঐ গুলি তুলিয়া এক সাজি বোঝাই করিয়া তাহাদের ঘরে নিয়া রাখিয়াছিল। দিদি (অর্থাৎ খুকুনী দিদি) সকালে উঠিয়াই ঐ ফুলগুলি সাজিসহ গোপালবাবার ঘরে রাখিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "মা, ফুলগুলি গোপালদাদাকে দেওয়া হইয়াছে।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, যে ঘরে বাবাজী বসিয়া ধ্যান করিতেছিল দিদি ফুলগুলি নিয়া ঐখানে রাখিয়াছে। তখন আমি দিদিকে বলিলাম, যেখানে পূজার যোগাড় করা হইতেছে ফুলগুলি সেইখানে রাখা উচিত ছিল। বাবাজীকে দিতে বলিয়াছি বলিয়া যে উহা বাবাজীর কাছেই নিয়া রাখিতে হইবে এমন ত কোন কথা নয়। তোমার রকম দেখিয়া মনে হইতেছে যে বাবাজী তখন যদি পায়খানায় থাকিত তবে তুমি ঐ ফুল পায়খানায় গিয়াই হাজির করিতে। (সকলের হাস্য) ঐ সময়ই হরিবাবার এই লীলার কথা খেয়াল হইয়াছিল।

এই কথা লইয়া অনেকক্ষণ হাসাহাসি চলিল। পাঞ্জাবী সাধুটি এইবার মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মা তাঁহাকে কিছু ফল দিবার জন্য ব্ল্যাঙ্কাকে (আত্মানন্দ) আদেশ করিলেন। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা হইতেই তাঁহার প্রকাশ। সাধুটি চলিয়া গেলে মা গতকল্য যে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা যে বল তিনি (অর্থাৎ ভগবান) কিছু করেন না তাহা হয় কেমন করিয়া? কারণ তোমাদের শাস্ত্রেই ত বলে তিনি সকলের বোঝা বহন করেন। (মুক্তি বাবাকে) তুমি না কাল বলিয়াছিলে যে ভগবান কিছু করেন না, এ কথা কি সত্য?

মুক্তিবাবা। হাঁ, তাঁহার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া যদি ঐ কথা বলা হয় তবে উহা সত্য। তাঁহার লীলার দিক হইতে ঐ কথা বলিলে সত্য হইবে না।

মা। হাঁ, কিন্তু এখানে স্বরূপের কোন কথাত হইতেছে না। তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধেত কোন কথাই বলা চলে না। ভগবানের যাওয়া আসার কথাই ত হইতেছিল। ঐদিক হইতে দেখিলে বলিতে হইবে তিনিই ত সব করেন। হাহাকাররূপে তাঁহারই প্রকাশ। আবার শান্তিরূপেও তাঁহারই প্রকাশ। তিনি কিছু করেন না এ কথা বলা চলে না, কারণ বাণী রূপে তিনি গীতা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার আলোচনা করিয়া কত লোক তাঁহার প্রকাশ নিজেদের মধ্যে অনুভব করিয়াছে, করিতেছে এবং ভবিষ্যতে করিবে। (হাসিয়া) আজ একজন বিকালে কি বলিতেছিল জান? বলিতেছিল, "মা, ভগবান যদি থাকিতেন তাঁহার প্রকাশ হইত, তিনি নাই।"

বিদ্যুৎদিদি। যদি এত কথা বলিলে, তবে যে উহা বলিয়াছে তাহার নাম প্রকাশ কর।

মা। এই দেখ কথা বলিতে বলিতেই বক্তার প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। (সকলের হাস্য) ভগবান থাকিলে যে প্রকাশ হইতেন বলা হয়, জানিও ভগবান্ সর্ব্বদাই আছেন, আবার তিনি প্রকাশও হন। তিনি নাই বলিয়া যে অভাব বোধ হয়—এই অভাব বোধই তাঁহাকে পাইবার পথ। যদি তিনি নাই বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারিতে, তবে তিনি 'নাই' রূপেই তাঁহার তখনই প্রকাশ হইত। কারণ সর্ব্বরূপে একমাত্র তিনিই ত। তাঁহাকে এক, আবার অনন্তও বলা হয়। যেমন তুমি একজনের পিতা, আবার অন্য একজনের ভাই, অন্য একজনের পুত্র, স্বামী ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধগুলি যেমন সত্য আবার তুমি যে এক ইহাও তেমনি সত্য। সেইরূপ ভগবান এক হইয়াও অনন্ত। জগতে যত কিছু ভাব দেখা যায় তাহা ঐ এক ভগবানের ভাব। তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছেন, অথচ তিনি নাই বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ হইল আবরণ। এই আবরণ সরিয়া গেলেই তাঁহার প্রকাশ হয়। যদিও আবরণ সরিয়া যাওয়ার কথা হইল, কিন্তু উহা যাইবে কোথায়? আসল কথা আবরণটা যে কি তাহা প্রকাশ হওয়া। এই আবরণ হটাইবার জন্যই কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল এই যে, কর্ম্ম করিতে করিতে আমার যে কিছু করিবার শক্তি নাই—তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। অহং যে কার তাহা জানা যায়। আমাদের বিশ্বাস আছে যে আমি কিছু করিতে করিতে যখন বুঝা যায় যে আমি কিছুই করিতে পারি না তখনই তাঁহার প্রকাশ হইবে।

বিদ্যুৎদিদি। কি রকম কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা বলিয়া দাও না।

মা। ইহার রকম নাই। ব্যথা পাইলে প্রাণ যেমন স্বভাবত:ই কাঁদিয়া উঠে, সেইরূপ ভগবানের জন্য যখন প্রাণ স্বভাবত:ই কাঁদিয়া উঠিবে, তখনই তাঁহার প্রকাশ হইবে। ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় দেখ না যে তাহারা খেলিতে খেলিতে অনেক সময় 'মা' বলিয়া চিৎকার দিয়া উঠে, কিন্তু ঐ চিৎকার শুনিয়া মা আর আসেন না। তিনি দেখিতে পান এখনও ছেলে খেলা লইয়াই মত্ত আছে। কিন্তু খেলা ছাড়িয়া ছেলে যদি তেমন ভাবে চিৎকার দেয় তবে মা কি ছুটিয়া না

আসিয়া থাকিতে পারেন? সেইরূপ আমরাও সংসারের খেলা লইয়া মত্ত আছি। মাঝে মাঝে অবশ্য ভগবানের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে, তখন দুই একবার ভগবানকেও ডাকিতেছি। কিন্তু খেলার মত্ততা তখনও যায় নাই। আর ভগবানের বিধান এমনই সুন্দর যে যখন যতটুকু তাঁহাকে ডাকা যায় উহা কিন্তু তাঁহার খাতায় জমা হইয়া থাকে। তিনি ইহার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখিয়া দেন। কিন্তু যখন আর সংসারের খেলা তোমাকে মত্ত রাখিতে পারে না যখন তাঁহার জন্য তুমি অস্থির হইয়া পড়, তখনই ভগবানের প্রকাশ হয়। সেইজন্য স্বভাবের কর্ম্ম করিতে হয়। স্বভাবের কর্ম্ম কি? না, ভগবানের দিকে যাওয়ার কর্ম্ম। আমরা ত অভাবের কর্ম্ম লইয়া আছি, অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলে আমাদের অভাব বোধই জাগিয়া থাকিতেছে। ইহা আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইতেছে। যে সকল ভোগ-বাসনা করিতেছি উহা ভোগ করিবার জন্য বার বার জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতে হইতেছে। কিছু ভোগ হইয়া যাইতেছে আবার বাকীগুলি ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতে হইতেছে। এ যেন return ticket করার মত। স্বভাবের কর্ম্ম করিলে অমৃত পাওয়া যায়। তখন আর মৃত্যু নাই। সেইজন্য স্বভাবের কর্ম্ম করিতে হয়। তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কর্ম্ম করিলে তিনিই তাঁহার প্রকাশের সুবিধা করিয়া দেন। তুমি আর কতটুকু কর্ম্ম করিবে? গঙ্গার উদ্দেশ্য করিয়া যদি নালা কাটিতে আরম্ভ কর তবে দেখিতে পাইবে পার ভাঙ্গিয়া গঙ্গাই তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাই তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা দরকার। ইহা যে তাঁহারই বিধান। তিনিই এই বিধান করিয়াছেন যে লোকে হাহাকারের মধ্য দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে। কর্ম্ম করিয়াও যদি তাঁহার প্রকাশ না দেখা যায় তখন উহার জন্য নিজেকেই দায়ী করিতে হয়। মনে করিতে হয় যে তেমন ভাবে ত আমার কর্ম্ম হইতেছে না যাহার জন্য তাঁহার প্রকাশ হইবে। জীবনে দু:খ কষ্ট আসিলেও মনে করিতে হয় যে এ সকল আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের জন্য। ভোগ হইয়া যে ইহা শেষ হইয়া গেল ইহাই মঙ্গল। এমনটিত আর হইবে না, ঠিক এই ভাবে আর ভোগ করিতে হইবে না।

অনেক সময় কাজ করিতে করিতে মনে হয় যে বিষয়ে আমার আসক্তি নাই, কিন্তু তবুও ভগবানের প্রকাশ হইতেছে না। তোমার হৃদয়ের মধ্যে কতখানি আসক্তি লুকান আছে তাহা তোমার জানা নাই এবং আসক্তি লুকান আছে বলিয়াই ভগবানের প্রকাশ নাই। হৃষীকেশে একবার ক্ষিতীশ (গুহ) কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, 'মা, আমি আর কিছু চাই না, তোমাকে চাই।" তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল, "এমন কথা বলিও না, আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, তাহাদের যদি কিছু হয়! কাজেই আর কিছু চাও না শুধু মাকেই চাও তোমার এ কথা ঠিক নয়।" প্রকৃত পক্ষে ইহাই কিন্তু সত্য। আমরা যে অনেক সময় ভগবানকে চাই উহা শুধু আমাদের মুখের কথা। আমরা প্রাণ হইতে চাই না। যদি প্রাণ হইতে চাহিতাম তবে তখনই ভগবানের প্রকাশ হইত। প্রাণ হইতে যাহাতে চাওয়া আসে সেইজন্য সর্ব্বদা তাঁহার নাম লইয়া থাকিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হয়। এইভাবে চলিতে চলিতে একদিন তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে।

(ক্রমশ:)

মা আনন্দময়ীর অমৃত আহ্বান

"হরি কথাই কথা"

(প্রথম পর্ব)

— ডা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মা আনন্দময়ী প্রায়ই বলতেন, "হরি কথাই কথা, আর সবই বৃথা ব্যথা। অর্থাৎ এ সংসারে নিরন্তর ভগবানের নাম নিয়ে থাকা, শুধু তাঁরই নাম গুণ গান করা। এই হল আসল কাজ; কাজের কাজ। অন্য সবই অসার, অর্থহীন ও দু:খদায়ী। হরি-কথা নানাভাবে হতে পারে — সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ-পাঠ, ধ্যান, জপ, পূজা, কীর্ত্তন নানাভাবে। মন অনুক্ষণ যদি ভগবৎমুখী থাকে, তবে আর ভয় নেই। হাতে কাজ আর মুখে নাম নিয়ে থাকলে কিছুই আর নিজের থাকে না, সব ভগবানে উৎসর্গীকৃত হয়ে যায় এবং শেষ অবধি নিজের অন্তরেও পরমপুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব হয়। অপরদিকে, অসার জিনিস নিয়ে থাকলে দু:খের অভিঘাত অবধারিত। কারণ, এ সংসারের সবই যে অনিত্য — নিয়ত পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল। সংসার মানেই, 'যা সরে সরে যায়।' জগৎ মানেই 'গতাগতি, আসা-যাওয়া।' 'বিষয় অর্থে বিষ হয়।' মা বলেন, যা দু:খময়, নিয়ত যা পরিবর্তনশীল তা' আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করা বৃথা। জাগতিক বস্তু ও ভোগসুখের প্রতি মোহ শুধুমাত্র আমাদের অশান্তি, কষ্ট ও শোকতাপকেই ডেকে আনে। শান্তি আছে শুধু নিত্যে, অর্থাৎ, ভগবৎ-আশ্রয়ে। নিত্যকে ছেড়ে অনিত্যকে নিয়ে থাকলে দু:খ যে পেতেই হবে! অতএব, পথ একটাই — হরি-স্মরণ, হরি-মনন ও হরি-কথায় নিমগ্ন থাকা।

মাতৃলীলার মূল সুর এই হরি-কথাই। আশৈশব হরিনামে উদ্বেল তিনি। শৈশবে তাঁর বিচিত্র দর্শনের মধ্য দিয়ে একথাই বোধ করি স্পষ্ট যে, হরি কথা যাঁদের প্রাণ, হরি তাঁদের প্রাণের একেবারে কাছাকাছি। তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করাও তখন আর অসম্ভব নয় কিছু। বর্তমান বাঙলাদেশের অন্তর্গত চানলায় 'পাগলা শিব' দর্শনের ঘটনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রশ্ন ওঠে এখানে, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যিনি, শৈশবে এভাবেই কি তাঁর আত্মদর্শন হয়?

হবে হয় তো! নিজেকে নিজে দেখা, ধরা। আবার অপরের কাছে ধরা না দেওয়া এ এক অদ্ভুত খেলা বুঝি!

ছোটবেলা থেকে হরিস্মরণই ধ্যান-জ্ঞান মা'র। হরি বা দেব-দেবীরাই তাঁর খেলারও উপকরণ। শৈশবে একদিন; — হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে খুড়ে গোলাকার স্তূপ করছেন। প্রচণ্ড রোদ তখন। নির্মলাসুন্দরী ঘেমে-নেয়ে একাকার। মোক্ষদাসুন্দরী জানতে চান, ঐ রোদে জ্বলেপুড়ে কী করা হচ্ছে? জবাব আসে অদ্ভুত। মেয়ে জানায় সে দেখছে ঠাকুর ঘরের সব ঠাকুরকে ঐ বালির মধ্যে। কৃষ্ণ রাধা রাম নারায়ণ — সবাই আছেন ঐ বালিতে। যে ঠাকুর সেখানে, তিনি এখানেও। মোক্ষদাসুন্দরী অবাক। বলে কী! বিশ্ব-চরাচরের ব্যক্ত-অব্যক্ত সব কিছুর নিশানা দেয় যে!

প্রথাসিদ্ধ পড়াশুনোয় মন নেই মা'র। পরিবেশও পঠন-পাঠনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। মা'র মন পড়ে থাকে অনির্বচনীয়ে, অভিনবে। একবার, মামাবাড়ি সুলতানপুরে দু'জন মেমসাহেব এসেছেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে। মা'র খুব আনন্দ। ছোটেন তাঁদের পেছনে। জননীর কাছ থেকে এক পয়সা চেয়ে নিয়ে কেনেন খ্রীষ্টধর্মের বই। সন্ধ্যায় দৌড়ে যান গ্রামের বাইরে। মেমসাহেবদের তাঁবুতে। আর সে কী দৌড়। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। যেন বিদ্যুৎ হার মানে। এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা থেকে প্রমাণ হয়, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, সব ধর্মই যে আসলে এক, মা এই সত্যটি ছোটবেলা থেকেই প্রকট করতে চেয়েছিলেন। ভগবৎভাবে অনুক্ষণ যাঁরা বিভোর, ভগবান তাঁদের কাছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাবটি সর্বাগ্রে তুলে ধরেন। নরুন্দীতে প্রতিবেশী এক মুসলমান মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব কিশোরী নির্মলাসুন্দরীর। কত সময় তার কাছ থেকে ধর্মের সুন্দর সুন্দর কথা শোনেন। নিজেও বলেন কত মধুর কথা! যেন আনন্দের স্রোত বইতে থাকে। মেয়েটি ভিন্নধর্মীয় বলে ভেদদৃষ্টির কোনো স্থান নেই। ধর্মকথা তো! মায়ের কাছে সব ধর্মই এক। সর্বজীবে সর্বভূতে তাঁর সমদৃষ্টি।

তবে কীর্ত্তনেই একেবারে আত্মহারা তিনি। নিজে আত্মহারা এবং অপরকেও তা'ই দেখে আনন্দিত। অষ্টগ্রামে একবার ক্ষেত্রবাবুর চার-সাড়ে চার বছরের ছেলে মাখনকে 'বল হরিবোল্' বলিয়ে ভাবস্থ করেন। এ যেন 'বাল গোপাল বালক ক্রিয়া।'

অনেক দূর থেকে কীর্তনের শব্দ ভেসে এলে বা ধারে কাছে কোথাও কীর্তন হলে কমবেশীর প্রতিক্রিয়া মা'র হ'তই।

প্রকৃত ধর্মপ্রাণদের ব্যাপারে মা'র বিশেষ দৃষ্টি। তাঁদের দেখা মাত্রই তিনি বিশেষ ভাবে ভাবিত। সে সময়ে (১৯১৪-১৫) বিদ্যাকূটে কয়েকজন শুদ্ধাত্মা ও ধর্মজ্ঞ মানুষ ছিলেন। তাঁদের কাউকে দেখলেই মা'র সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ। ভজন-পূজন নিয়ে থাকেন তাঁরা; আধ্যাত্মিক ভাবে দ্রুত উন্নতির পথে, মা যেন দেখতে পেতেন। তাই নামে যেমন মা'র বিশেষ ভাব, তাঁদের দেখলেও তাই। অপরদিকে, ধর্মজ্ঞদেরও বিশেষ লক্ষ্য থাকে মা'র প্রতি। মাতৃসান্নিধ্য থেকে তাঁরা যে অনুপ্রেরণা পান, দীর্ঘ সময় ধরে তার রেশ যেন তাঁদের আবিষ্ট করে রাখে। মাতৃলীলার এই পর্বটি থেকে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, হরিতে মতি যাঁদের, তাঁরা একে অপরকে দেখে হরির অস্তিত্বকেই বিশেষভাবে খুঁজে পান এবং সে কারণেই অদ্ভুত এক আনন্দে মাতোয়ারা হন।

বিদ্যাকূটে থাকবার সময় পরমার্থ প্রসঙ্গে নানাভাবে আগ্রহ প্রকাশ পেত মা'র। এক জেঠাইমা তো তাঁর কাছ থেকে কৃষ্ণের শত নাম মুখে মুখে লিখে নেন। একবার পিতা বিপিনবিহারীর জ্ঞাতি-সম্পর্কিত এক বৃদ্ধকে মহামন্ত্র জপ করতে শোনেন তিনি। শুনে অবধি প্রতিদিন ঐ মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন। পাশের বাড়িতে থাকতেন এক বয়স্ক কাকা অম্বিকা চরণ ভট্টাচার্য। মা'কে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন তিনি। আলোচনা করতেন নানান পরমার্থ প্রসঙ্গ নিয়ে। মেয়ের বয়সী একজনের সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবীণ অম্বিকাবাবুকে আলোচনায় মগ্ন হতে দেখে

অনেকেই অবাক হ'ত। এ ছাড়া, পাড়ার এক বৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ বিহারী ভট্টাচার্যের কাছেও মা ছিলেন পরম প্রিয়। বিহারীবাবু সম্পর্কে মা'র জ্যেঠামশাই ছিলেন। তাঁর সময়ের অধিকাংশই কাটতো গীতা মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ চর্চায়। মা'র কাছে তো ধর্ম-প্রসঙ্গই সব। ভগবানের কথাই কথা। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় প্রায়ই সুন্দর সুন্দর সব সৎ-কথা বলতেন তিনি। সবাই তন্ময় হয়ে শুনতো। এমনকি ছোটরাও মা'র কথা শুনতে ভালোবাসতো।

বাজিতপুরে মা'র নানান আচার-আচরণের মধ্যে সাধকের ভাব প্রকাশ হ'ল এবং দিন দিন তা বাড়তে লাগল। কখনও দেখা যেত, ঘর-সংসারের কাজ করতে করতে তিনি সমাধিস্থ; হয়তো বা রান্নাঘরেই পড়ে আছেন। ভোলানাথ অফিস থেকে ফিরে দেখতেন, মা'র ঐ অবস্থা।

ক্রমশ মা নিয়মিতভাবে সাধনা শুরু করলেন। কিন্তু শাস্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনার পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল না। তিনি বার বার শুধু 'হরি'র নাম উচ্চারণ করতেন। পিতা বিপিনবিহারীর কাছ থেকে তাঁর এই শিক্ষা। যখনই সময় পেতেন মা, 'হরি' নাম করতেন। ভোলানাথ এতে একদিন ক্ষুব্ধ। বললেন, "তুমি বার বার শুধু হরি নাম কর কেন? আমরা ত বৈষ্ণব নই, শাক্ত।" মা বললেন, "হ্যাঁ, তাই।"

মা'র কাছে সবই সমান। যৌগিক যে ক্রিয়াদি এতদিন তাঁর দেহে প্রকাশ পাচ্ছিল, নাম বদলের পরও ঠিক তা'ই হতে লাগল।

এসব সাধনার সময় মা'র কোনো বাহ্যজ্ঞান থাকত না। সবই ভুলে থাকতেন তিনি। এমনকি গুরুতর শারীরিক যন্ত্রণাও তা'কে কোনোরূপ প্রভাবিত করত না। কত সময় উনুনের আগুনে তাঁর হাত-পা পুড়েছে, আসন-মুদ্রাদি করবার সময় তাঁর দীর্ঘ কালো চুলের গোছা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে জট পাকিয়ে যাবার ফলে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে এসেছে। কিন্তু মা'র যেন কোনো দিকেই হুঁশ নেই। এই যে ভাব-তন্ময়তা, দিব্যোন্মাদ ভাবে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা, এর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য বোধ করি; এবং তা হ'ল লোকশিক্ষা। অর্থাৎ, হরি নামের কী গুণ, লোক তা দেখে শিখুক। আত্মজ্ঞান লাভ করুক জনসাধারণ। মা'র তো নিজের জন্য সাধনার কোনো দরকার ছিল না! তিনি তো আশৈশব পূর্ণজ্ঞানে স্থিতা! আসলে জীব-কল্যাণের খাতিরেই তাঁর সাধক-ভাব। ভগবৎ-নামের মধ্য দিয়ে যে দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়, শোক-তাপ ও বিষয়-বাসনায় জর্জর মানুষের কাছে তা'র আভাস দেবেন বলেই মা'র যত কিছু সাধন-লীলা।

(ক্রমশ:)

মানুষকালী

—*শ্রী অধীর ঘটক*

ঈশ্বরের ইচ্ছা কিভাবে মানুষের অন্তরে বীজরূপে প্রোথিত হয় তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলো শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর আবির্ভাব বৃত্তান্ত। পিতামাতার প্রথম কন্যা সন্তান জন্মের কয়েক মাস পর গত হয়। মায়ের ঠাকুরমা বারো মাইল পথ আসা-যাওয়া করে বর্তমান বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার কসবার কালী বাড়ীতে গিয়ে পৌত্র কামনার পরিবর্তে কামনা করলেন একটি পৌত্রীর। ঠাকুমার মনে হলো, এতদূর হেঁটে এলাম নাতির কথা বলবো বলে। কিন্তু মা কালী আমাকে ভুলিয়ে দিলেন। আচ্ছা, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ইচ্ছময়ী তারা তিনি। সকলই তাঁর ইচ্ছা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবান এই মায়াময় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন পিতৃরূপে। আমরা ভগবানের স্বরূপ প্রতিপালনে ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়েছি পিতৃধারায়। এই চারযুগের ঈশ্বরাবতারবাদ বিশ্লেষণ করলে পরিলক্ষিত হয় যে মাতৃরূপে ভগবান আবিভূর্ত হননি। যদিও আমরা ভগবানের স্বীয় মহিমাকে একাত্মভাবে গ্রহণ করেছি আত্মার আত্মীয়রূপে।

ত্বমেব মাত চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।।

আজ থেকে প্রায় একশ এক বছর আগে, ১৯শে বৈশাখ, ১৩০৩ সালে (৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), ত্রিভুবনবাসী জীবজগৎ, এমনকি সমগ্র জড়-জগৎসহ সকলের তৃষিত আত্মা স্নেহ-ভালোবাসায়, করুণা ও কল্যাণে মমতার কোলে আশ্রয়দানের প্রয়াসে শ্রীশ্রী মা মাতৃরূপে হলেন আবিভূর্ত। দূষিত কলিযুগকে করলেন কৃপাধন্য।

দেব মানবেরা জন্ম গ্রহণ করেন না, আবির্ভূত হন। তাঁদের আবির্ভাব জন্ম পূরণের প্রয়োজনে নয়, লোক কল্যাণের চাহিদায়। ভ্রান্ত অজ্ঞ ও পথ ভ্রষ্টদের মুক্তি ও কল্যাণের পথ-প্রদর্শক তাঁরা। ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন, বদ্ধ জীবদের আলোক ও আনন্দের সন্ধান দিয়ে তাঁরা এই পৃথিবীতেই প্রবাহিত করেন অমরাবতীর সুবাস। নামেই তাঁরা মানব, প্রকৃতপক্ষে হলেন অতিমানব। নামেই তাঁরা দেহী, আসলে দেহাতীত। শুদ্ধ সত্য অমৃত স্বরূপ। মা আনন্দময়ী সেইরকম এক বিরল বিস্ময়। একবার তিনি ঘোষণা করেন —পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ! আবার তাঁর মধ্যেই ভক্ত খুঁজে পান কালীর লীলা বিলাস। 'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছময়ী তারা তুমি।'

মা আনন্দময়ী প্রত্যক্ষ মহাদেবী। ভক্তের আহ্বানে ও জগতের মঙ্গলার্থে দেহ ধারণ করেছেন। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবতী কালীই স্বাংশে মা আনন্দময়ী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকার শাহবাগে থাকা কালীন মার দেহে শূন্যপথে কালীর আবির্ভাব ও তাঁর দেহে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় কালীমাতা। অনেকেই মাতৃদেহে কালীমূর্ত্তির বিকাশ দেখতে পান। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে 'মানুষকালী'ও বলা হত। কালী মূর্ত্তির সঙ্গে তাঁর একাত্মতাও

কখনো কখনো দেখা যায়। একবার চট্টগ্রামের কক্সবাজারে থাকা কালীন শ্রীশ্রী মা বুঝতে পারেন যে ঢাকায় কালীমূর্ত্তির আভূষণ চুরি হয়। নিজদেহে তিনি বিশেষ যাতনা অনুভব করেছিলেন।

অনেক ভক্তের মতে, মা আনন্দময়ীকে কালী বা দুর্গা না মনে করে আদ্যাশক্তি মহামায়া বলে ধারণা করা উচিত। লাবণ্য তাঁকে দশভূজা দুর্গারূপে দেখেছেন। আবার নির্মলবাবু দেখেছেন সরস্বতীরূপে। আরো কতোরূপে কতজনে দেখেছে এই মাতৃরূপ। মহাভাবময়ী রাধারূপেও কেউ তাঁকে মনে করে। আবার কেউ বা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবেশ বলে বিশ্বাস করে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' অর্থাৎ তুমি যা মনে কর আমি তাই।

১৩৪৬ সালের ২৩ শে ভাদ্র, শনিবার (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। মা আনন্দময়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশে। যাওয়ার কথা কক্সবাজার, কিন্তু যাওয়া হল না। মা চললেন বিদ্যাকূটে। সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছে দেখলেন বহুলোকের উপস্থিতি। সবার সঙ্গে সানন্দে করলেন বাক্য বিনিময়। এ গ্রামের কালী বড় জাগ্রত দেবতা। অনেকে বললেন, 'নির্মলা তো এখন মানুষকালী হইছে।' মা আনন্দময়ী হেসে উত্তর দেন, 'ওমা, কালী কেমন কইরা হইলাম। রংটা কাল হইলেও কথা ছিল। কি বল ?'

চট্টগ্রাম থেকে মা আনন্দময়ী ফিরেছেন কলকাতায়। ২৯ শে ভাদ্র, শুক্রবার। মা চলেছেন লৌহ নগরী জামসেদপুরে। মোটরে বসে অভয় মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা আপনি যে নিজেকে ছিন্নমস্তার মূর্ত্তিতে দেখেছিলেন, দুটো যোগিনী দুধারে দেখেছিলেন, তা কি আপনার শরীর থেকে ভিন্ন দেখেছিলেন ?' শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর স্বত:স্ফূত সহজ সরল উত্তর, 'হ্যাঁ'।

প্রকৃত ঘটনা হল, মা বিদ্যাকূটে এক বাড়ীতে গিয়ে তাদের পুজোর ঘরে বসেন। সেখানে ছিল একটি ছিন্নমস্তার ছবি। সেই ছবি দেখে তিনি বলেন, 'ঠিক এরকমই এই শরীরের ভেতর হয়ে গেছে। বাইরের দৃষ্টিতে যদিও মাথাটা কাটা নয়, কিন্তু ভাবটা এবং দেখা হচ্ছে প্রত্যক্ষ মাথা কাটা। ঠিক এই রকম হাতে মাথা, রক্তের শিরাগুলো ঠিক এই রকম। যেমন ব্লাডপ্রেসার হলে হয় সেইরকম সজোরে যেন রক্তের ধারা উঠছে। আর এই রকম দুধারে দুজন অর্থাৎ নিজেই যেন এই রকমভাবে আবার রক্ত পান করা হচ্ছে। ঐভাবে ভাবান্বিত কেউ থাকলে ঐ মূর্ত্তি পরিষ্কার দেখতে পায়।'

গুরুপ্রিয়াদি জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রমথবাবু সেদিনই দেখেছিলেন বুঝি ?'
মা : হ্যাঁ, আরও হয়েছিল।
গুরুপ্রিয়াদি : তাঁর চাপরাশী দশমূর্ত্তি দেখেছিল ?
ম : হ্যাঁ, কি কি সব অনেক রকম হয়েছিল।
অভয় : চাপরাসীটার সংস্কার ভাল ছিল বুঝি ?
মা : মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন। বললেন, 'এক একটা মূর্তিরই কিন্তু অনন্ত রকম জানিও।'

তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান তারাপীঠ বারে বারেই মা আনন্দময়ীকে আকর্ষণ করে। মা ঘুরতে ঘুরতে এলেন তারাপীঠে। তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে লোক ছুটে এলো। জন সমাগমে তারাপীঠ মেলার আকার ধারণ করল। বালক, যুবা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকল শ্রেণীর মানুষের ভীড় সেখানে। সবাই মা আনন্দময়ীকে দর্শন করতে ব্যাকুল। মা গ্রামের এক বধূকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার জন্য তোমরা এমন করছ কেন ? আমি তো তোমাদের মতই মানুষ। সাধু সন্ন্যাসী তো নই।'

বউটি প্রত্যুত্তরে বলে, 'মা কেন ছলনা কর ? তুমিই তো তারা মা। তোমাকে দর্শন করাই পূণ্যি।' কথা বলতে বলতে আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। বউটির প্রাণের আকৃতি দেখে মা বলেন, 'যাঁর দর্শন আকাংক্ষায় এই সুদীর্ঘ পথ চলা তারই তো কৃপা। ধৈর্য নিয়ে সংসার করা। নিরাশ হতে নেই। সর্বত্র কেবল তাঁর দিকেই মনটা রাখা। তবেই তো শান্তি।'

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামনে মা আনন্দময়ী এক প্রহেলিকা। তাঁকে বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় না। কখনো মনে হয়, হয়তো বা মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী, সচ্চিদানন্দরূপিনী। আবার হঠাৎ তিনি মহামায়া স্বরূপের পরিচয় দেন। একেবারে ঘরোয়া মা সেজে সন্তানকে করেন বিমোহিত। সব ভুলিয়ে দিয়ে মা এমন ভুবনমোহিনী হাসি হাসেন যাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে যাই। সে হাসির অর্থ হয় তো এই — 'আমাকে তোরা কী বুঝবি ?'

শ্রীশ্রী মা বলেন, 'শরীরটা ভাবের পুতুল।' অর্থাৎ তোমরা যেমন পুতুল খেলো তেমনি তোমরা নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী এই শরীরটাকে নিয়ে খেলা করতে পার। তোমাদের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশ এই শরীরটার মধ্যে পাবে।' তাই বোধ হয় কেউ মাকে শ্রী দুর্গা, কেউ কালী, কেউ শ্রীকৃষ্ণ, কেউ শ্রীগৌরাঙ্গ, অনেকে আবার আপন অন্তরের স্বরূপে মাকে দর্শন করেছেন। তার মানে, সর্বভাবের সর্বময় আধার হলেন স্বয়ং মা আনন্দময়ী !

■

শ্রী শ্রী মা

—শ্রী চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর
জলধারা সম
হে জননী, আনন্দময়ী
তোমার করুণাধারা
বহিতেছে অহরহ
জুড়াইতে কত শত
তৃষিত ক্ষুধার্থ
ভক্ত জন প্রাণ।
কত শত পাপী তাপী
অভাজন দুর্জন কুজন
মুক্ত হয়ে যায়
স্নান করে পবিত্র ঐ
করুণা ধারায়।

সাধু সন্ত জ্ঞানী কতো
তোমার স্মরণে এসে
হয়েছেন প্রণত
তুমি যে মা নারায়ণী
ভগবতী ত্রিগুণাতীত।

সর্ব শাস্ত্র সার
একটি মাত্র কথা
তুমি শোনায়েছ মাগো
"হরি কথাই কথা
আর সব বৃথা ব্যথা"।

অনন্ত শূন্যের মাঝে
পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত তুমি
শূন্যতার নেই কোন ঠাঁই।
আত্মা পরিব্যাপ্ত বলে
তুমি মাগো বলে গেলে
"এ শরীরের পাশ ফেরার
কোন জায়গা নাই।"

বিস্মৃতির ঘোর অন্ধকারে
ডুবে আছি মোরা
ভুলে আছি তাই
কোথা থেকে আগমন
কোথায় বা যেতে চাই
কি আমাদের পরিচয়
কিবা আমরা পেতে চাই।

বিরাটের অংশ মোরা
মহাশক্তি বীজরূপে
অন্তরেতে আছে ধরা
কাতর করুণ কণ্ঠে
জননী ও কন্যারূপে
সর্বজন কাছে
বলেছিলে "এ শরীরের
একটি মাত্র ভিক্ষা আছে,
একটু সময় করে
তাঁকে ডেকে নাও কাছে।"

নাম করো, জপ করো
অন্তরের সুপ্ত বীজ
ভগবত নামে সিঞ্চন করো।
যবে তাঁর কৃপা হবে
সুপ্ত বীজ মুক্তির ধারায়
ভগবৎ ভাবের শাখা প্রশাখায়
বিরাট এক মহীরূহ হয়ে
ভূমা বোধে হবে পল্লবিত।
"অহম" ভাব হবে লয়
তুহু তুহু সর্বময়
মর্ত্ত তনু দিব্য হবে
পূর্ণ বোধে হবে বিকশিত।

তোমার দিব্য তনু
স্বরূপেতে হয়ে গেছে লীন।
আমরা ভাগ্যহীন
তবু মাগো রেখে গেছ
অমূল্য রতন
দিবা নিশি অন্তরেতে
তোমাকে স্মরণ।

আজি এই শুভদিনে
শতবর্ষ জন্মক্ষণে
তোমার স্মরণে মাগো
আগত সবাই।
করুণার সিন্ধুহতে
এক বিন্দু কৃপা কণা
আমরা সবাই যেন পাই।

জয় মা

শ্রীশ্রী মার আবির্ভাব শতবর্ষে কলিকাতা সল্টলেকে অনুষ্ঠিত উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ভাবে রচিত। — লেখক

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ও নেতাজী সুভাষ

নেতাজীর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিশেষ রূপে সংকলিত

— অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

নেতাজী সুভাষচন্দ্র শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাকে প্রশ্ন করেন, আপনি বলছেন, সকলের স্বভাবই এক। কিন্তু গীতায় আছে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্ম ভয়াবহ।

শ্রী শ্রী মা উত্তরে সুভাষচন্দ্রকে বললেন, স্বভাবের ধর্মই হল স্বধর্ম। শ্রীশ্রী মা নিজের শরীর দেখিয়ে বললেন, স্বধর্ম লাভ করার জন্যই সাধনা। আনন্দময়ী মা জানালেন, এই শরীরের কোন শিক্ষা নেই সেইজন্য এ উল্টো পাল্টা কথা বলে। স্ব-ধন লাভ করাকেই বলা হয় সাধনা। গীতার কথা সত্য। জীবের উদ্দেশ্য হল স্বভাবের ধর্ম লাভ করা।

সুভাষচন্দ্র মাকে প্রশ্ন করেন, স্বভাবের কর্ম কি ?

মা উত্তরে বললেন, যে কর্ম করলে স্থায়ী আনন্দ প্রকাশ পাবে তারই নাম স্বভাবের কর্ম। অভাব বোধ না হলে কর্ম হয় না। কর্ম মানেই অভাবের কর্ম। যার নাম নিত্য তাকে বলা হয় স্বভাব। শ্রীশ্রী মা সুভাষচন্দ্রকে বললেন, তোমার ভেতর অখণ্ড আনন্দ আছে তাই তুমি অখণ্ড আনন্দ চাইছ। যা তোমার মধ্যে নেই তা তুমি কখনও চাইতে পার না।

সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, সকলেরই কি এক ?

মা উত্তরে বললেন, আমরা সকলেই চাইছি অখণ্ড আনন্দ। সংসারে এক আছে, দুই নেই। লোকে অপরের সেবা করে। কিন্তু তা তো নিজের জন্যেই। সবই এক। আর এজন্য একে অন্যের সেবা করে আনন্দ পায়।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পঞ্চবটীতে অশ্বত্থ গাছের নীচে সিমেন্টের বেদীর উপর আসন পাতা হল। মা বসলেন। নেতাজী মাকে প্রণাম করলেন। তিনিও মায়ের পাশেই বসলেন।

মা সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, দেশের সেবা করেও ভগবান লাভ হয়ত ?

সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি কি ভগবানের খোঁজ রাখি ? সকলে সুভাষচন্দ্রের কথা শুনে হেসে ওঠেন।

মা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন, তুমি কিসের খোঁজ রাখ ? তুমি দেশের সেবা কর কেন ? এ কাজ করে তোমার কি লাভ হয় ? কি লাভ হবে যদি জানাও তবেই তোমার কথা শুনে সবাই দেশের সেবা করতে পারবে। লাভ ছাড়া কেউ কিছু করে না

আনন্দময়ী মা সুভাষচন্দ্রকে বললেন, তুমি কত সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দাও। কিছু শোনাও। সুভাষচন্দ্র হেসে জানালেন, আমি বক্তৃতা দিতে অসিনি। আমি এটুকু বলতে পারি দেশ

সেবা করে আমি আনন্দ পাই তাই দেশ সেবা করি।

মা প্রশ্ন করলেন, এই আনন্দ কি নিত্য হয়?
সুভাষচন্দ্র বললেন, 'নিত্য' শব্দের অর্থ বেশ কঠিন।

মা বললেন, যা সব সময় থাকে তাই নিত্য। স্ব-ভাবের কর্মই নিত্য আনন্দ। ভাল ভাবে সেবা করলে এই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি তো তাই করছ? এবার তুমি কিছু বলো?

সুভাষ চন্দ্র বললেন, আমি বলতে আসিনি। আমি শুনতে এসেছি।
মা বললেন, তাহলে যা বলবো তা শুনবে? যা করতে বলবো তা করবে?
সুভাষচন্দ্র বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

মা অসাধারণ বাণী পরিবেশন করলেন। মা বললেন, আমরা যা কিছু জাগতিক কাজ করি তা কেবল অভাব বোধকেই জাগায়। জাগতিক কাজে যে আনন্দ মেলে তা শুধু অভাব বোধকেই বাড়ায়। ভেবে দেখ, কোন বিষয়ের অভাব হলেই আমরা সেই অভাব দূর করবার জন্য কাজ শুরু করি। মনে করি, এ অভাব দূর হবে। আনন্দ লাভ হবে। কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে আবার আর এক আনন্দ পেতে ইচ্ছে করে। এজন্য বলি জাগতিক কাজ মাত্রই নতুন অভাব সৃষ্টির কাজ।

মা সুভাষচন্দ্রকে বললেন, স্ব-ভাবের কাজ করলেই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি বললে, সেবা করে আনন্দ পাওয়া যায়। দেশের সেবা তো ভাল জিনিষ। তোমার প্রাণ বড় মহান। তুমি তাকে আরও বড় করতে চেষ্টা কর। দেশের সেবাও খণ্ড রূপে করলে তা অভাবের কাজ। এতে যে আনন্দ পাবে তাও খণ্ড আনন্দ। কিন্তু সমস্ত লোক চায় অখণ্ড আনন্দ অর্থাৎ যে আনন্দের শেষ নেই। স্ব-ভাবের কাজ করলে অখণ্ড আনন্দ মিলবে। আনন্দে স্থিত হওয়া যায়।

মা সুভাষচন্দ্রকে বললেন, তুমি একথা বলতে পার আমি একলা আনন্দে থেকে কি করব? জগতকে তো দেখছি নিরানন্দময়। এর জবাবে বলা যায় যে যদি নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় তা হলে তা অন্যকেও দেওয়া যেতে পারে।

সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করেন, জীবের স্বভাব নানা রকম। কার কি কর্ম হবে তা ত জানা নেই।
মা বললেন, সংস্কার বিভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। সত্য এক।
সুভাষচন্দ্র বললেন, ওটা তো আর নিজে নিজে ঠিক করে নেওয়া যায় না।
মা বললেন, কাজ একবার সুরু করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যায়। বাচ্চারা প্রথমে লেখাপড়া করতেই চায় না। তারপর জোর করলে শেখাতে সুরু করলে কেউ ইংরেজীতে ভাল ফল করে, কেউ অঙ্কে ভাল ফল করে। এই রকমভাবে একবার কাজ সুরু হয়ে গেলে আপন আপন সংস্কার অনুসারে কাজ করতে থাকে।

সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন, পথ কি?

শ্রীশ্রী মা বললেন, কর্ম করতে হয়, সংকল্প করতে হয়। আমি পারবই।

আরো কিছু কথা বলে সুভাষচন্দ্র বিদায় নেন।

বাংলা ১৩৪৫ সালের ৩ রা কার্তিক দক্ষিণেশ্বরে এই অবিস্মরণীয় মহামিলন হয়েছিল।

■

শাস্ত্র প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা

সংকলক — শ্রী জগদীশ্বর পাল

শাস্ত্রকে এই শরীরটা 'টাইম-টেবল' (Time table) বলে। দেখো না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে পথে কোন কোন স্টেশন পড়িবে তাহা টাইম-টেবলে লেখা থাকে। কিন্তু ঐগুলি কেবল স্থানের নাম মাত্র। শুধু নাম পড়িয়া ঐ সকল স্থানের কোন ধারণা করা যায় না। তা' ছাড়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে হইলে যে সকল স্থান পড়ে, উহার সমস্ত গুলির নামও টাইম-টেবলে থাকে না। মাত্র প্রধান কতকগুলি স্থানের নাম থাকে।

শাস্ত্রেও সেইরূপ সাধন রাজ্যের সমস্ত কথা নাই, মাত্র কয়েকটি অবস্থার কথা আছে। কিন্তু উহার কোনও একটি অবস্থা লাভ হইলে ভিতরে যে অনুভূতি আসে এবং এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতে ছোট-বড় যে অসংখ্য প্রকার অনুভব হয়, উহার বর্ণনা শাস্ত্রে নাই। এই জন্য শাস্ত্রের কথাগুলি যে সাধন রাজ্যের শেষ কথা এরূপ অনুমান করা ভুল।

শাস্ত্র কি রূপ? না, ছাদে উঠিবার সিঁড়ির মত। শাস্ত্র কেবল এই সিঁড়ির ধাপের বর্ণনা দেয় মাত্র। ছাদে উঠিলে যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার বর্ণনা শাস্ত্রে নাই।

কারণ, যে একবার ছাদে উঠিয়াছে, সে তো নিজেই সমস্ত দেখিতেছে। যাহা দেখিতেছে তাহার বর্ণনার দরকার নাই। পথের বর্ণনারই দরকার। শাস্ত্রেও তাহাই আছে। শাস্ত্র তাই তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলে। প্রকৃত পক্ষে তিনি উহা বটেন, আবার তিনি উহারও ঊর্ধ্বে।

■

গীতার কথা

(১)

— *'তাপস'*

শ্রীমদ্ভগবত গীতা ভারতের তথা বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। গীতা বেদান্তের সার। গীতাতে বিভিন্ন শ্লোকে ফুটে উঠেছে একটা সার্বজনীন সত্য যা সর্বধর্ম গ্রাহ্য। পুরুষোত্তম তত্ত্বের ভিতর দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষর, অক্ষর এবং এদের উপরে পুরুষোত্তমের কথা বলেছেন; বলেছেন পরমাত্ম তত্ত্ব এবং তা লাভের পথ ও সাধনা অর্জুনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে। তাই আজ গীতাকে সকলে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে। গীতার মর্মবাণী সকল সাতশত শ্লোকে আঠার অধ্যায়ে ব্যক্ত হয়েছে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যে "গীত" শ্রী ভগবানের শ্রীমুখ থেকে নির্গত হয়েছিল তা আজও ভারতবাসী ধরে রেখেছে। তাই "গীতা জয়ন্তী" পালিত হয় ভারতের নানা প্রান্তে। শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমেও নিষ্ঠার সাথে "গীতাজয়ন্তী" পালিত হয়। শ্রীশ্রী মা ভক্তদের জপ, ধ্যান, সদগ্রন্থপাঠের সাথে নিত্য গীতা পাঠের উপর জোর দিতেন। মূল সংস্কৃত শ্লোক (যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে নি:সৃত হয়েছিল) সম্ভব না হলে অনুবাদ পাঠ করতে বলতেন, মর্মবাণী অনুধাবন করতে বলতেন শ্রদ্ধার সাথে। শ্রদ্ধার সাথে পাঠে সত্য উদভাসিত হয়।

এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে গীতার সারাংশই আলোচিত হয়েছে।

> "ঈশ্বর: সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।
> ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
> তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।" (১৮/৬১,৬২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা ও ভক্ত অর্জুনকে পাঁচহাজার বছর পূর্বে এইরূপ অনেক মর্মবাণী ও উপদেশ দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে, যুদ্ধের প্রারম্ভে। উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা ও ধর্মরাজ্য স্থাপন করা। এই সব মর্মবাণীর সংকলন আজ "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা" নামে পরিচিত। মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (১৪-৪২ অধ্যায়) আমরা গীতার উল্লেখ পাই।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে গীতার স্থান ও সময় যাই হোক, গীতার আধ্যাত্মিক সত্য ও কাব্যিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তাই আজ "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা" ভারতের তথা বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম শাস্ত্ররূপে স্বীকৃত।

মানবজীবনে নানা সময়ে নানাস্থানে বিভিন্নস্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মক্ষেত্রে প্রচলিত মতবাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। পরিণামে সংঘর্ষ ও বিপ্লবের অভ্যুদয় হয়। এইরূপ বিপ্লবের

মধ্য দিয়ে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হয়। এই সব পরিস্থিতিতে মানুষ কিভাবে অধ্যাত্মভাবে গড়ে উঠতে পারে, গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে আছে তারই নির্দেশ। জীবনের কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে সংকটকালে একান্তভাবে হৃদিস্থিত ঈশ্বরের শরণ নিলে তাঁর সাড়া পাওয়া যায়, নূতন প্রেরণা ও আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ ধারণ করেছিলেন শুধু ধর্ম সংস্থাপনার জন্যই নয়, পুরুষোত্তম যোগের দ্বারা মানুষ ভগবানের দিব্য সাযুজ্য লাভ করতে পারে, এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন তথা পাণ্ডবদের সাথে যোগাযোগ তারই নিদর্শন। গীতায় সেই যোগের কথাই বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় আছে ৭০০ শ্লোক (মতান্তরে ৭৪০ শ্লোক), আঠরটি অধ্যায়ে তার বিস্তার। বেদান্তের মর্মবাণীই শ্রীভগবানের শ্রীমুখে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় বিষাদ যোগ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রতিপক্ষে পূজনীয় ভীষ্মদেব, দ্রোণ প্রভৃতি বীরদের দেখে স্বজন বধের ভয়ে ভীত হয়ে অর্জুনের মনে পাপপুণ্য বোধ জাগ্রত হয়েছে। তাঁর সাম্যভাব হারিয়েছেন, করছেন নানা ন্যায় নীতির সমর্থন। বিষাদগ্রস্থ হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে চাইলেন। বললেন 'নকাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।' এই সংকট মুহূর্তে অজুর্নকে উদ্বুদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ রণাঙ্গণে যে উপদেশ, যে জ্ঞান তাকে দিলেন তা অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অমর হয়ে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে সাংখ্য যোগের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্লীবতা থেকে মুক্ত হয়ে বীরের মত যুদ্ধ করতে বললেন। বললেন ক্ষাত্রধর্মের কথা। তারপর সাংখ্যমত অনুযায়ী আত্মার অবিনশ্বরতার কথা। "এই আত্মা কোন কালেও জন্মগ্রহণ করেনা এবং মৃত হয় না। এই আত্মা উৎপন্ন হয়ে পুনরায় সত্তাবান হয় তাও নয়। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য শাশ্বত, পুরাণ। শরীরের বিনাশ হলেও আত্মা অবিনাশী। (২/২০) তারপর বললেন নিষ্কাম কর্মযোগীর কথা। সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পাপ পুন্য দ্বারা লিপ্ত হন না। সেই জন্য সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগের জন্য চেষ্টা কর। সেই যোগেই কর্মের কৌশল নিহিত আছে। (২/৫০) তারপর শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সম্বন্ধে। বললেন বুদ্ধিযোগের সাহায্যে ত্রিগুণাতীত হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের স্থিতি লাভ করতে, আত্ম প্রতিষ্ঠিত হতে। "এই স্থিতি লাভ করলে জাগতিক সুখদু:খে মোহিত হয় না। অন্তিমকালে এই নিষ্ঠাতে স্থিত হয়ে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে।" (২/৭২)

তৃতীয় অধ্যায়ে বলছেন কর্মযোগের মাহাত্ম্য। নিয়ন্ত্রিতভাবে যজ্ঞার্থে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা কর্তব্য। এইরূপ কর্মদ্বারা মানুষ শুদ্ধ হয়ে প্রকৃত লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করে; নিষ্ক্রিয় পুরুষের সাযুজ্য লাভ করে। ভগবান তাই বলছেন, — "অনাসক্ত হয়ে নিরন্তর কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন কর, অনাসক্ত পুরুষ এই কর্তব্য কর্ম করেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।" (৩/১৯) শ্রেয়কে কেন্দ্র করে স্বধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যেকেই ধাপে ধাপে এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। বুদ্ধির দ্বারা পাপ বা অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির সংযম দ্বারা এই পথে সিদ্ধি লাভ সহজ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানযোগের কথা বলছেন। বলছেন সগুণ ভগবানের প্রভাব ও নিষ্কাম কর্মযোগীর কথাও। বলছেন ভগবানের অবতার গ্রহণের কারণ,—"সাধুদিগের রক্ষার জন্য দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" (৪/৮) তারপর জ্ঞান কিভাবে কর্মের পরিপূরক হয়ে সাধককে সিদ্ধির পথে নিয়ে যায়, সেই কথাই বলছেন। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়। এর পশ্চাতে যে মানসিক ও অধ্যাত্মিক ভাব থাকে, তাই কর্মের গতি নির্দিষ্ট করে। মানুষ যে সব যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে, দিব্য চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞান তত্ত্বদর্শীরাই আমাদের দিতে পারেন। শ্রদ্ধা এই জ্ঞান লাভের উপায়। মানুষ জ্ঞান-সাধনার দ্বারা দিব্যকর্মের নীতি বুঝতে পারে। তাঁর সাযুজ্য লাভ করে পরমানন্দ ও শাশ্বত শান্তি লাভ করে। তাই বলছেন,—"হে ভরতবংশীয় অর্জুন সমত্ব বুদ্ধিযোগে স্থিত হয়ে, অজ্ঞান হতে উৎপন্ন হৃদয়স্থিত স্বীয় সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন করে যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।" (৪/৪২)

পঞ্চম অধ্যায় কর্ম-সন্ন্যাস যোগ। এখানে ভগবান বলছেন, সাংখ্যযোগী ও নিষ্কাম কর্মযোগীর লক্ষণ ও মহিমা সম্বন্ধে, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে। কর্মত্যাগ হতে নিষ্কাম কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। লক্ষ্য একই। যিনি সর্ববৈরীশূন্য, নিরাসক্ত, তিনিই সন্ন্যাসী, কর্মবন্ধন তাকে স্পর্শ করে না। কর্মযোগের পথ সহজ। এই পথেই শুদ্ধ হয়ে জ্ঞান লাভ করে, নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মকে লাভ করে। "নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফলকে পরমেশ্বরে অর্পণ করে ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ শান্তি লাভ করে।" (৫/১২)

সকল পাপ হতে মুক্ত হয়ে, জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছিন্ন করে, সর্বভূতে হিতে রত ভগবদ্ ধ্যানে নিবিষ্ট ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ শান্ত নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মকে লাভ করে। যাঁরা নিষ্কাম কর্মদ্বারা পাপমুক্ত, শ্রবণ ও মননদ্বারা সংশয়রহিত, নিদিধ্যাসন দ্বারা জিতেন্দ্রিয় এবং সকলজীবের কল্যাণে নিরত, সেই সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসীগণ ইহজীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন।" (৫/২৫)

ষষ্ঠ অধ্যায় আত্মসংযম যোগ বা ধ্যানযোগ। এখানে বর্ণনা করছেন যোগীর লক্ষণ ও যোগলাভের উপায় সম্বন্ধে। যিনি নিষ্কাম কর্মী তিনিই যোগী, প্রকৃত সন্ন্যাসী, কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী নন। সিদ্ধি লাভের পর আত্মপ্রতিষ্ঠাতে থেকে দিব্যকর্ম করা যায়। এই স্থিতি লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধন নয়। শুধু "যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু" (৬/১৭) এই ভাবে স্থিত থাকা। পরিবেশ ও সংস্কার যোগের পথের সহায়ক। যোগী তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী থেকেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান বলছেন—"সকল যোগিদের মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান যোগী, অন্তরাত্মার দ্বারা আমাতেই যুক্ত, সেই যোগী আমার প্রিয়তম।" (৬/৪৭)

সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ। যে জ্ঞানের উপর দিব্যকর্ম প্রতিষ্ঠিত তারই বিশদ বর্ণনা করছেন। বলছেন সমস্ত পদার্থের কারণরূপে ভগবানের ব্যাপকতার কথা। ভগবানকে তার পরা অপরা সকল তত্ত্বেই জানতে হবে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চার প্রকৃতির মানুষ ভগবানের ভজনা করেন। তবে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তিনি বাসুদেবই সব, এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন; ভগবৎ সাযুজ্য লাভ করেন।" অনেক জন্মের পর শেষ জন্মে তত্ত্বজ্ঞানী সব কিছুই বাসুদেব,

এইরূপ ভজনা করেন — সেইরূপ মহাত্মা কিন্তু দুর্লভ। (৭/১৯) সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বললেন, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সাথে যে তাঁর ভজনা করেন সেই যুক্তচিত্ত পুরুষ অন্তকালে তাঁকেই প্রাপ্ত হন।

এই প্রসঙ্গে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে অক্ষর ব্রহ্ম যোগের বর্ণনা করলেন শ্রী ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে। অক্ষর সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই ব্রহ্ম, জীবাত্মাই অধ্যাত্ম, শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞদান ইত্যাদি কর্ম, সকল উৎপন্ন ও বিনাশশীল পদার্থ অধিভূত, হিরন্ময় পুরুষ অধিদৈব, আর বাসুদেবরূপী ভগবান অধিযজ্ঞ। এইভাবে ভাবিত হয়ে শরীর ত্যাগ করলে ভগবৎ সাযুজ্য লাভ হয়। তাই বলছেন — "নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ করলে, আমাতে মনবুদ্ধি অর্পন করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।" (৮/২৭) এই পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য সাধনপন্থা বলছেন —

"হে অর্জুন, তুমি সব সময় যোগযুক্ত হও।" (৮/২৭) এইরূপভাবে চললে যোগীপুরুষ বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা দানাদির পুণ্যফল অতিক্রম করে সনাতন পরমপুরুষকে লাভ করে।

নবম অধ্যায় রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ। মানুষ ও জগতের মধ্যে ভগবান যে নিগূঢ়ভাবে বর্তমান, সেই জ্ঞান দিয়েছেন অর্জুনকে। বলছেন অসুর প্রকৃতি ও দৈব প্রকৃতির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভগবদ্ ভজনার কথা — ভগবানের স্বরূপ, সকাম, নিষ্কাম উপাসনার ফল ও নিষ্কাম ভগবদ্ ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে। বলছেন, — "সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারূপ আমার দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ আছে, আর সমস্তভূতগণ আমার সংকল্পের আধারে স্থিত আছে। আমি কিন্তু তাদের মধ্যে স্থিত নই।" (৯/৪)

সেই ভগবানকে ভজনার পথ, — "সর্ব কর্ম, ভোজন, হবন, দান, তপস্যা ইত্যাদি সবই তাঁকে অর্পণ করা।' (৯/২৭) তবেই শুভাশুভ ফল থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়। ভগবান সকল সাধককেই গ্রহণ করেন। কিন্তু "অনন্য চিত্তে যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের নিষ্কাম উপাসনা করেন, সেই ভক্তের সমস্ত সাধনা (যোগক্ষেম) ভগবান বহন করেন।" (৯/২২)

তাই পরিশেষে ভগবান বলছেন, — "সচ্চিদানন্দ আমাতেই নিত্যযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, শ্রদ্ধা প্রেমের সাথে নাম গুণ শ্রবণ মনন কীর্ত্তন কর, ভজনা কর, প্রণাম কর। এইরূপ শরণাগত হয়ে পরমাত্মরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হবে।" (৯/৩৪)

(ক্রমশ :)

■

শত বর্ষ আগে

—বীণাপাণি দাস

আজি হতে শত বর্ষ আগে
১৯ শে বৈশাখের শুভ পুণ্য লগনে
জন্ম নিলে মাগো খেওড়া গ্রামের
এক খড়ের ঘরে,
পূর্ব ও উত্তর দিকে মাথা রেখে।

জন্ম লগনে কাঁদ নাই তুমি
হেসেছিলে প্রাণ খুলে
দেখিয়া বাহিরে আমা ফল
ঝুলিতেছে গাছে।।

তব জন্ম বারতা শুনিয়া,
গ্রাম বাসী সব আসিল দেখিতে,
দেখিয়া তোমার মোহিনীরূপ,
চোখ তাদের নাহি ফেরে।

নানা নামে নানা জনে
তারা ডাকে তোমারে
কেউ ডাকে কমলা দাক্ষায়ণীরে
কেউ ডাকে গজ-গঙ্গাঁ, তীর্থ বাসিনীরে।

হাসিতে খুশিতে ভরা শিশু
দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিল,
কীর্ত্তন ভাবাবেশে বিভোর হইল,
বার বরস দশ মাসে বিবাহ হইল।

১৮ই শ্রাবণের এক ঝুলন নিশিতে,
নিজেই নিজেকে করিলে দীক্ষা দান।
নিজেই গুরু নিজেই শিষ্য, ইহার নাহিক অভিধান।

দীক্ষার অল্প কিছু সময় পরে,
ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ীতে,
তুমি নিজেই করিলে আত্মপ্রকাশ।

তোমার ভুবন ভোলান হাসির ছটায়
দিগন্ত হইল আনন্দময়।
ভাইজী হইতে সেই ক্ষণে,
আনন্দময়ী নামে তুমি লইলা পরিচয়।

তার পর দিক হইতে দিগন্তে
ছুটে বেড়িয়েছ তুমি
জগতের কল্যাণের তরে,
কখনও হও নাই তুমি ক্লান্ত।

এ যেন অশান্ত এক সমুদ্রের ঢেউ,
এ চলার নেই কোন বিরাম,
শুধু ছোটা আর ছোটা
ভারতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

অবশেষে আসিল সেই অশুভলগ্ন
পরন্ত রোদের বেলা,
ক্লান্ত তুমি চাইলে বিদায়।
কিন্তু কে দিবে বিদায়,
মন যে কারো নাহি চায়।
তবু দিতে হবে বিদায়।

৮৭ বরষের পূর্ণ পদার্পণে
দিয়ে আশিস্ বাণী
আমি তোদের মধ্যেই থাকবো
চিরদিনই।

১০ই ভাদ্র কাঁদিয়ে অসংখ্য সন্তানেরে তুমি
নিলে চির বিদায়
এই ধরনীর কাছ হতে।
প্রণাম মাগো প্রণাম তোমায়
কোটী কোটী প্রণাম।।

সংযম মহাব্রতের অনুকণা

(২)

—শ্রী দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

সাধনাসদনের স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী দেবী ভাগবৎ পুরাণ প্রবচন করতেন প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা। এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—অধিকারী চার রকম। এক হল যার সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে আর নূতন কিছু পাওয়ার নেই। তিনি কর্ম্ম করেন লোকশিক্ষার জন্য। দুই হল সব পেয়ে গেছে এবং সংসারে বৈরাগ্য এসেছে। সে মুমুক্ষু। সংসারের সব লোভ তার কাছে আসলেও সে ঘৃণা করে, এ সাধনরত। তিন হল যার তত্ত্ব জানার ইচ্ছা নেই কিন্তু অধোগতির ভয় আছে। নন্দরাজার নয় লক্ষ গাভী ছিল, তাই সে রাজা। রাজার গরিমা নিরূপণ হয় গোধন দিয়ে। এর নাম বিষয়ী। শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড তার জন্য। চার হল যে পামর, সে পাপ পুণ্য কিছুই দেখেনা। তার জন্য সকাম কর্ম্ম। পরমাত্মা নির্গুণ থেকে সগুণ হন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থের উদ্ধারের জন্য। যেখান থেকে নাম, রূপ, জগৎ উৎপন্ন, স্থিতি ও লয় হয়, সে হচ্ছে ঈশ্বর। এই সব হয় আদ্যাশক্তি থেকে। বিষ্ণুপুরাণে বলে বিষ্ণু থেকে এই সব হয়। মনে রাখা, ঈশ্বর এক, কিন্তু অনেক রূপ প্রকট করতে পারেন। শব্দ থেকে আকাশ, স্পর্শ থেকে বায়ু, গন্ধ থেকে পৃথিবী, এই রকম পাঁচটীর নাম পঞ্চতত্ব। এদের অধিপতি পঞ্চদেবতা পাঁচ রূপে এই সৃষ্টি ধারণ করে আছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র হল সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের রূপ। মূলাধারে পরাশক্তি বাণীর উৎপত্তি, নাভিতে পশ্যন্তি, হৃদয়ে দৃশ্যন্তি, কণ্ঠে প্রকাশ। এই আদ্যাশক্তি বাণীরূপে। দেবীভাগবৎ একবার শ্রবণে চরম শান্তির প্রাপ্তি। ভগবান বেদব্যাস রাজা জনমেজয়কে এই দেবীভাগবৎ ব্যাখ্যা করে শুনান।

যে পুরাণ পড়া হয় সেই পুরাণে সেই দেবতাকে সর্ব্বোপরি বলা হয়। সাধক কাকে সর্ব্বোপরি মনে করবে? সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার যে করে তিনিই পরমাত্মা। সৃষ্টি যদি এক হয় পরমাত্মা তাহলে অনেক কি করে হয়? ঘট যেমন মাটীর থেকে উৎপত্তি, পরে স্থিতি। আবার মাটীতেই লয়, তেমনই সৃষ্টি পরমাত্মা থেকে, পরমাত্মাতেই স্থিতি, আবার পরমাত্মাতেই লয়। নাম আলাদা কিন্তু ঘট একই। নিজের লীলার জন্য জিজ্ঞাসুর সমাধানের জন্য সগুণ সাকার ধারণ করে চোখের সামনে আসেন। সংকল্প থেকে সৃষ্টি। সূর্য্য এবং রাত্রিকে একস্থানে কি করে রাখা যায়? সচ্চিদানন্দঘন এক। কিন্তু অজ্ঞান এল কোথা থেকে? অন্ধকার ও প্রকাশ। প্রকাশে অন্ধকার থাকতে পারে না। চৈতন্যর কাছে অজ্ঞান কোথা থেকে এল? আচার্য্য শঙ্করের মতে একত্রে স্থিতি ব্যাপারটা তর্কের বাইরের জিনিষ। সৃষ্টির জন্য এক অচিন্ত্য অজ্ঞানকে কল্পনা করতে হয়। এই কাল্পনিক শক্তির নাম অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া এই সব। সৃষ্টির পরে জীবের অনুভূতি কি? আমার এত সালে জন্ম হয়েছে, আমি বড় হয়েছি, একদিন চলে যাব। চৈতন্যের এই যে অভিব্যক্তি, এটাই কল্পনা, এটাই মায়া। এই অনুভূতি যখন সদ্‌গুরুর কৃপায় নিজের সাধন দিয়ে বুঝতে পারে তখনই সেই চৈতন্যের স্বরূপ দেখতে পারে। চৈতন্যের মধ্যে অজ্ঞান থাকতেই পারে না।

বদ্রীনাথের উপর ব্যাসগুহা আর গণেশগুহা মুখোমুখী। ব্যাসদেব পুরাণ বলেছেন আর গণেশজী লিখেছেন। চুক্তি ছিল বচন থামলে গণেশজী আর লিখবেন না। আবার গণেশ নিজে না বুঝেও কিছু লিখবেন না।

মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর অনন্তশয়নে শায়িত শ্রীভগবানের কর্ণের মল থেকে জন্ম নিয়েছিল। ওরা ভাবল আমরা কোথা থেকে এলাম? আকাশবাণী হল, তোমরা আমার অংশ, তোমরা শক্তি অর্জ্জন কর। তারা এমন কঠিন তপস্যা করল যে অম্বা আদ্যাশক্তি তাদের বর দিতে চাইলেন, ওরা বর চাইল অমরত্ব। অম্বা বললেন, তা তো হয় না, অন্য কিছু চাও, ওরা ইচ্ছামৃত্যু বর চাইল। তিনি বললেন, "তথাস্তু"। বলগর্বিত হয়ে তারা দেবতাদের বন্দী করল। পরের নিন্দা কান দিয়ে শুনতে খুব ভাল লাগে, মধুর লাগে তাই কর্ণের মল থেকে মধু আর সেই মলের কীট থেকে হল কৈটভ।

অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে হনুমান একদিন খুব বিরস বদনে বসেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হনুমান বললেন, এত কাজ হয়েছে, এত ঘটনা ঘটেছে, যেদিন থেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সেদিন থেকে আজ আপনি অযোধ্যার রাজা হয়েছেন, আমি আপনার সেবায় রয়েছি, কিন্তু আপনি কে আজও তা জানলাম না। শ্রীরাম তখন সীতাকে আদেশ করলেন এর উত্তর দিতে। সীতা রামের ইতিহাস বলতে লাগলেন। যখন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার প্রসঙ্গ এল তখন হনুমান জিজ্ঞেস করলেন, যজ্ঞ কে রক্ষা করল? সীতা বললেন, "আমি"। এর পরে যত ঘটনা সব হনুমান বলেন ভগবান করেছেন, সীতা বলেন "আমি করেছি।" হনুমান যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল না তখন সীতা বললেন, আমিই আদ্যাশক্তি। কার্য্য আমার দ্বারাই হয়। রাম চৈতন্যস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও আমার সাথে সংযোগ না হলে কোনও কার্য্যই হয় না।

আমাদের উদ্দেশে স্বামীজি বললেন, আপনারা যে বিকেল তিনটা থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত এখানে বসে থাকেন আপনাদের শক্তি আছে তাই না বসেন? চোখের পলক কি করে পড়ে? ইন্দ্রিয় সব কি করে কাজ করে? পশু পক্ষী মানুষ সবেরই ক্রিয়াশক্তি একমাত্র ওই আদ্যাশক্তি অম্বা। এই চিন্তন নিষ্কাম সাধকের জন্য। পুরাণের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে নেই। কারণ এই সব প্রসঙ্গ অধিকারী ভেদে এক এক রকম বোধ। জামদগ্নি ব্রহ্মার পুত্র একবার ভাবল কোন দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাকে প্রসন্ন করলে আমার কাজ সহজে সিদ্ধ হবে। ব্যাসদেব বললেন, অম্বা মা হচ্ছেন স্নেহময়ী, বাৎসল্য প্রধান। কাজেই তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সব দেবতারা যদি সব কিছু দেয় সেটাও অম্বা মায়ের কাছ থেকেই নিয়ে দেয়। বীজমন্ত্রে পূজা, জপ করলে দেবতা সবচেয়ে বেশী এবং তাড়াতাড়ি খুশী হন।

শাস্ত্রে বলে সংস্কার চার রকম— মন্দ, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম। তীব্রতর ও তীব্রতম সংস্কার অনুকূল পরিস্থিতি না পেলেও দ্রুত ফলের দিকে যায়। মন্দিরে পূজা দেবার সংকল্প থাকলে এক কোটী বাধা, গঙ্গা স্নান করতে তার অর্দ্ধেক, পঞ্চাশ লাখ বাধা। জাহ্নবী তীরে

যেতে হলে পঁচিশ লাখ বাধা, আর দান করতে হলে সাড়ে বার লাখ বাধা।

পরা অম্বা আদ্যাশক্তি সব দেওয়ার জন্য তৈরী কিন্তু মানুষ যা চায় তা শুনে অম্বাদেবী হাসেন। কারণ মানুষ জানে না যে কি চাইতে হবে। ভগবানকে পাওয়া খুব কঠিন নয়। কিন্তু তাঁকে চেনা সহজ নয়। তোমার দরজায় যদি পরা অম্বা এসে বলে যে আমি পরা অম্বা, তোমার কি চাই বল? তুমি কি চিনতে পারবে? কিন্তু সদ্‌গুরু চিনিয়ে দিতে পারেন। বামদেব রোজ ভগবানের সঙ্গে কথা বলতেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারেন নি। বামদেব যখন মৃত্যুশয্যায় তখন ভগবান বলেছিলেন, বামদেব তুমি চিনতে পারনি কারণ তুমি সদ্‌গুরু পাওনি। সাধন কম হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধনা যেন ক্ষয় না হয়ে যায়। ক্ষয়ের পথ বহু, বিন্দুমাত্র অভিমানে সাধন অনেক নষ্ট হয়ে যায়।

চৈত্র নবরাত্রির পূজা আর শারদীয় নবরাত্রির পূজা। এই দুই নবরাত্রি পূজা যমরাজের দুই দাঁত। নবরাত্রি ব্রত এইজন্য করা দরকার বসন্ত ও শরৎ ঋতুতে শরীরে রোগ সংক্রমণ বেশী হয়। মুনি ঋষিরা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার বিধান দেন নি, কিন্তু পূজার বিধান দিয়েছেন। এই পূজায় সেই সংক্রমণ নাশ হয়ে যায়। অল্পাহারী হয়ে এই পূজা করতে হয়। দিনে একবার পবিত্র হবিষ্যান্ন গ্রহন। কুমারী পূজায় এক বছর বয়সের কন্যাকে কুমারী বলেন। দুই থেকে দশ বছর বয়সের কন্যাকে কুমারী পূজা করা যায়। ২ এর কম নয় ১০ এর বেশী নয়।

শ্রদ্ধেয় চিদানন্দ স্বামীজী তাঁর অমৃত বর্ষণে বললেন, সনাতন ধর্ম্মের মূল অনুভূতি হল ঈশ্বর সাথেই রয়েছেন— নিকট থেকে নিকটতম। নিজের কাছে নিজে যত নিকট ঈশ্বর তার চেয়েও নিকট। চীনা ভাষায় ধ্যানকে বলে Zhen. Kon এর ধ্যান। জন্মের পূর্ব্বে তোমার কি রূপ ছিল। এক হাতে তালি দিলে কি শব্দ হয়? ব্যক্তির আন্তরিক অস্তিত্ব হচ্ছে, আমিই সব। মানুষ ব্রহ্মার এক বিচিত্র সৃষ্টি। এর মধ্যে অসীম বৈচিত্র্য। রাগ, দ্বেষ, ভাল, মন্দ, পবিত্রতা, অপবিত্রতা সবের মিলন। কি রূপে, কি ভাবে এই দ্বৈতের সমাধান হয় তারই জন্য পুরাণ, শাস্ত্র, সব গ্রন্থ। রাবণের জন্ম ব্রাহ্মণ কুলে, তিনি মহাতপস্বী, মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু দুরাচারী, বুদ্ধিভ্রংশের জন্য। প্রকাশের দিকে যে নিয়ে যাবে, দৈবী ভাবের দিকে নিয়ে যাবে তারই চেষ্টা দেবী-মহাত্ম্যের ১৩শ অধ্যায়ে। সকলের সামনে সর্ব্বদাই দুটো পথ— উর্ধ্বগতি আর অধোগতি। কামের চেয়েও ক্রোধ বেশী ক্ষতিকারক। কাম কাজ করে ধীরে ধীরে, ক্রোধ আকস্মিক। আমার যা হিতকারী নয়, বুদ্ধি দিয়ে তার উপর নজর রাখা। বুদ্ধি সর্ব্বদা জাগ্রত রাখা দরকার। দ্বৈতের ব্যাপারে এই পথের নির্দ্দেশ। মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাও। প্রেয় মার্গে আখিরে লাভ নেই, সাময়িক লাভ হতে পারে। দিব্যতা মানবতা আর পশুতার ত্রিবেণী সঙ্গম। পশুর বিচার শক্তি নেই। এটা কেবল মানুষেরই আছে। অতীত এবং ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে বর্ত্তমানের উপর খেয়াল রাখা একমাত্র মানুষ স্তরেই সম্ভব। এই ত্রিবেণীর মধ্যে আমি কার সাথে যাব। এই নির্ণয়ের ওপরেই জীবনের ভবিষ্যৎ। জন্ম জন্মান্তরের বাসনার কারণে দেহের সাথেই সম্বন্ধ বানায়। একে খণ্ডন করতে হবে তপস্যার দ্বারা, সংযমের

দ্বারা। অল্পাহার, অল্পনিদ্রা এসবই তপস্যা। মানুষের মধ্যে যে বিচার শক্তি তা দিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমের দুই সঙ্গমে একত্র করতে হবে মানব দেবত্ব। এর পথ সৎসঙ্গ।

সব প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। মানুষের উপর প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ত্রিগুণের প্রভাব তাকে বিভিন্ন দিকে চালনা করে। একে বুঝতে না পারলে আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল ধারায় প্রবাহিত করা কঠিন। চেষ্টা করে কি ভাবে একে অনুকূল ধারায় প্রবাহিত করা যায়, কিসের থেকে সাবধান হতে হবে, গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান তা বলেছেন। I am the creator of all, through Bramha. প্রকৃতির সহায়তা ছাড়া সৃষ্টি চলে না। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। মোটর গাড়ী আছে, ড্রাইভার আছে, কিন্তু পেট্রল মবিল এসব ছাড়া গাড়ী চলে না। এই তিনগুণের ত্রিবেণীকে নিজের বশে এনে নিজের অনুকূল ধারায় চালনা করতে হবে। সত্ত্বগুণ উর্দ্ধগামী গুণ। তমোগুণ অধোগামী - অজ্ঞান, আলস্য, প্রমাদ। রজোগুণ ভাল না করলেও উপর দিকে ঠেলে উৎসাহ দেয়, লোভ, আসক্তি, মমতা, কর্ম্মজালে ফাঁসিয়ে দেয়। যে প্রকাশ বিকাশের দিকে যেতে চায় সে সত্ত্বগুণের অনুশীলন করবে। সূক্ষ্ম শরীরের আহার হাত, পা, কান সব ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করি। বুদ্ধিমান ভগবদ্‌ভক্ত নিজের আচরণ সম্বন্ধে জাগ্রত থাকেন। তামসকে প্রবেশ করতে দেব না, সাত্ত্বিককে ভেতরে নেব। এই তার আচরণ নিরোধ সংস্কারকে জাগ্রত করে যাতে সে পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই নিরোধ সংস্কার অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করতে হয়।

প্রতিকূল গুণ থেকে সরিয়ে নিয়ে মধ্যস্থ গুণকে নিজের আয়ত্তে আনা। এই তিনগুণ সর্ব্বদা আমাদের স্বভাবের মধ্যে কাজ করে চলেছে। কোনও সময় কোনও গুণ প্রধান হয়, অন্যেরা গৌণ হয়। কখনও তমোগুণ প্রধান হয়, সত্ত্ব রজকে গৌণ বানায়। কখনও রজোগুণ প্রধান হয়, অন্য দুটি গৌণ হয়। কখনও সত্ত্বগুণ প্রধান হয়, রজ এবং তমোগুণকে অধীন করে নেয়, গীতায় ভগবান একথা বলেছেন। প্রকৃতি গরুকে দুধ দিয়েছেন বাছুরের জন্য, কিন্তু গোয়ালা বলে দুধ তার জন্য। সে চারআনা বাছুরকে দেয় বাকীটা নিজে নেয়। দুধ নেয় গোয়ালা, খায় অন্যেরা। কিন্তু বাছুর না গেলে গরু দুধ ছাড়ে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই সেনার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই তিনগুণ সম্বন্ধে ভগবান যা বলেছেন তা মানুষের উপকারের জন্য, পরম সুখ প্রাপ্তির জন্য। অর্জ্জুন তো কেবল বাহানা মাত্র। এই জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিমান পূর্ব্ববর্ত্তী মুনি ঋষিরা পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। এই জ্ঞান সার করে তোমার জীবন সত্ত্বময় হওয়া দরকার। আচার, ব্যবহার, আহার সব সাত্ত্বিক হওয়া দরকার। ২৪ ঘন্টায় সূর্য্য উদয়ে ব্যবহারিক জীবনে কর্ম্ম প্রচেষ্টা সুরু হয়ে যায়। এটা রজোগুণের প্রভাব। দিন হচ্ছে রজোগুণের ক্ষেত্র। অন্ধকার হয়ে গেলে প্রকৃতি সকলকে জোর করে নিষ্ক্রিয় করে দেয় — তমোগুণের ক্ষেত্র। সত্ত্বগুণ কোথায়? সন্ধিকাল হচ্ছে সত্ত্বগুণের সময়। সূক্ষ্ম প্রাণ স্থূল শরীরে শ্বাসরূপে আছে। এই শ্বাস কখনও বাঁ নাকে কখনও ডান নাকে। যখন ডাইনে বা বাঁয়ে নেই তখন সত্ত্বগুণ। প্রাত: সন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু শ্বাসের সমতা কি করে দেখা যায়? মধ্য রাত্রে সেই অবস্থা আসে — মহানিশা।

এই সময়গুলিতে আধ্যাত্মিক জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা।

ভক্তিযোগের উপদেশ গীতার দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে। ভগবান সেই জ্ঞান অর্জ্জুনকে বলেছেন। জড় ও চেতনের এক আশ্চর্য্য সঙ্গম। প্রকৃতিকে সাথে নিয়ে কি করে সৃষ্টি করেছেন এই কথা প্রসঙ্গে বলছেন, যদিও আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত, কিন্তু প্রকৃতির সহায়তায় সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির তিনগুণে জীব বদ্ধ হয়। যদিও জীব পরমাত্মার অংশ তবুও প্রকৃতি মাঝখানে থাকাতে তিনগুণে বদ্ধ হয়ে যায়। সত্ত্ব যদিও উত্তম গুণ তবুও এক রকম বন্ধন। সুখভোগের অভিলাষ ভুলিয়ে দেয় পরাবিদ্যা অর্জ্জনের কথা। বিদ্বান হতে পারে, জ্ঞানী হতে পারে, কিন্তু মুক্ত হতে পারে না, আত্মাকে যতক্ষণ জানতে না পারে ততক্ষণ বন্ধনই। রজোগুণ মমতা, লোভ, তমোগুণ অজ্ঞান, আলস্য, প্রমাদে বদ্ধ করে। এইগুলো বোঝে যে এইগুলোর খেলায় আমি সাক্ষীমাত্র, আমি এর মধ্যে নেই, তিনগুণ থেকে নির্লিপ্ত যে জানতে পারে সেই আত্মাকে দর্শন করে। অর্জ্জুনকে এই অবস্থায় পৌঁছাবার উপদেশ দিচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যদিও এদের অতীত হতে হয় তবুও এদের সহায়তা দরকার নিজের ব্যক্তরূপে অবস্থিতির জন্য। এরপর যখন সত্ত্বগুণে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়ে তার সহায়তাও ছেড়ে দাও। ব্রহ্মলীন হও। পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে রাখ। এই সম্বন্ধ অখণ্ড করে রাখ। এইভাবেই তিনগুণের ঊর্ধ্বে যাওয়া যায়। সদাসর্ব্বদা নামের স্মরণ। যা কিছু গ্রহণ কর আগে ভগবানকে অর্পণ কর, তারপর প্রসাদ নেও। আন্তরিকভাবে তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপন কর।

বিবেক এবং বিচারের দ্বারা নিজের জীবনের পথ নির্ব্বাচনের ব্যাপারে তিনটি choice আছে। স্থূল শরীর একটা বিশেষ স্থান নিয়ে আছে ক্ষুৎপিপাসা, ভয়, অভয় সব নিয়ে। মানুষের মধ্যে বিচার শক্তি রয়েছে, নির্ব্বাচণ করার শক্তি রয়েছে। পশুপক্ষীর চেষ্টা instinctive, মানুষের selective । শাস্ত্র, শ্রুতি, ভাগবৎ, মহাপুরুষ ওরা বলেন তুমি শুধু এই শরীরই নয়, প্রপঞ্চের সাথে তোমার সম্বন্ধ নেই, তুমি এসবের ওপরে। অনন্ত, অনাদি, পবিত্র, অবিনাশী তোমার স্বরূপ। এটা জানো। শ্রদ্ধয়া প্রণিপাতেন। মানবতাকে যত উপরে তোলা যায় তার চেষ্টা করো। মানুষ শরীর নিয়ে আদর্শ মানুষ হও। এটা তোমার birthright । দিব্যতা প্রাপ্তির জন্য মানব জীবন একটা stepping stone । ধোপা গাধার সাহায্য নেয়, কিন্তু গাধা হয় না। তেমনি আমরা মানব জীবনের সাহায্য নেব, কিন্তু মানব থাকব না। এই নির্ণয় নেওয়া আমাদের মনোবৈজ্ঞানিক স্থিতি। ক্ষুধা লাগলে পেটে কষ্ট হয়, কষ্ট হলে চোখে জল আসে, এগুলি ভৌতিক ক্রিয়া। প্রথম তিন চক্রের মধ্যে সমস্ত মানুষ বদ্ধ থাকে। ক্বচিৎ কখনও চতুর্থ অনাহত চক্রে ওঠে। দয়া, সেবা এই সব ভাব জাগ্রত হয়। ভগবানকে বলা যে শরীর দিয়ে আমার সব করতে হবে কিন্তু একে আধ্যাত্মিক স্তরে নেওয়ার চেষ্টাও তুমি আমাকে দাও। সব সাধনারই লক্ষ্য এই অধ্যাত্ম চেতনায় উত্তরণ। এর প্রধান বাধা জন্ম জন্মান্তরের বাসনা। বাসনা কাটাবার উপায় ভগবৎ উপাসনা। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সাকার সত্তা ভগবানের মূর্ত্তিকে স্থাপনা করতে পারি তবে মনের অন্তরতম স্তরে transformation এর শক্তি আসে। সদা সর্ব্বদা এই সাকার সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান অন্তত:

৫/১০ মিনিটি। সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর হয়ে রাস্তা পরিষ্কার হবে, দিব্য চেতনায় পৌছাবার জন্য। নরকে নারায়ণ হতে হবে।

সব কিছুতে ভগবানের অবিস্থিতি হচ্ছে হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান কথা। এমন কোনও স্থান নেই যেখানে এই তত্ত্ব বিরাজমান নেই। ভগবানের দেওয়া এই মানব শরীর এক অদ্ভুত অমূল্য দান, ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য এক অতুলনীয় সাধনার সোপান। চক্রবর্ত্তী রাজার রথকে velvet ফুল দিয়ে চমৎকার স্বর্গের রথের মত সাজান হয়েছে। সব perfect । চক্রবর্ত্তী বসে গেছেন। চতুর সারথিও বসেছেন। কিন্তু রথ চলে না। ঘোড়া চলছেনা, energy নেই, গতিশীলতা নেই। সব নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও পেট্রোল না থাকলে start হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি যদি কৃতকার্য্য হতে চাও, তাহলে প্রয়োজন তীব্র ইচ্ছা। এই তীব্র ইচ্ছাকে কখনও বিন্দুমাত্রও ঢিলে হতে না দেওয়া। নিরন্তর সৎকারের সাথে এর পেছনে পড়ে থাকা দরকার। উৎসাহ থাকা দরকার। উৎসাহের সাথে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে এমন কোনও শক্তি নেই যে পুরুষার্থ প্রাপ্তির পথে সফলতা না দেবে।

সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রমাণ করে যে উৎসাহের সাথে যদি তীব্র আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয় তাহলে সফলতা তার অনিবার্য্য। সাধনার অভ্যাসে এই উৎসাহ এবং আকঙ্ক্ষা প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা alertness এবং faithfulness পূর্ণ আস্থা চাই। আজ পূর্ণিমার রাত্রি। আপনাদের মধ্যে এই পূর্ণিমার বিকাশ, বিচারের বিকাশ, বিবেচনার বিকাশ চিরজাগ্রত থাকুক। এই বলে চিদানন্দজী মহারাজ তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

বিদ্যানন্দ স্বামীজী সাতদিন বলতেন উপনিষদ, পরমেশ্বরানন্দজী বলতেন দেবীভাগবৎ, আর চিদানন্দ স্বামীজী বলতেন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের নির্দ্দেশ। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধু মহাত্মারাও তাঁদের সুযোগ সুবিধামত এসে মায়ের পায়ে বাণী দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যেতেন। এঁদের মধ্যে শ্যামসুন্দরজী, ব্রহ্মহরি মহারাজ, আশিসনন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, গণেশানন্দজী এঁরাও ছিলেন।

প্রতিদিন বিদ্যানন্দ স্বামীজীর উপনিষদ ব্যাখার পর বারাণসীস্থ কন্যাপীঠের একটি করে ছোট বোনেরা সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যানন্দ স্বামীজীর উপস্থিতিতে সংযমব্রত সম্বন্ধে, মায়ের সম্বন্ধে পাঁচ মিনিট বাক্যাঞ্জলি মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করত। শেষ দিনে যে মেয়েটি তার সাথীকে সঙ্গে নিয়ে বলল তাদের দুজনের বয়স বোধ হয় দশের উপরে নয়। সার্থক এই কন্যাপীঠ, সার্থক এদের শিক্ষিকারা।

রাত্রে ৯টার থেকে ৯।।টা পর্য্যন্ত মাতৃপ্রসঙ্গে আলোচনা হত। কখনও কন্যাপীঠের আচার্য্যেরা, কখনও পুরাতন ভক্তেরা, কখনও আশ্রমের কোনও প্রবীন বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু এই আলোচনা করতেন। শেষ দিন রাত পৌনে বারটা থেকে সোয়া বারটা পর্য্যন্ত মহানিশার ধ্যান হল। তারপর স্বামী চিদানন্দজী মেয়েদের এবং গিরিধরপুরী মহারাজ ছেলেদের হাতে প্রসাদ দিলেন। পরদিন সকলে

সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে একে একে আনন্দ জ্যোতিপীঠের ভিতরে ঢুকে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে প্রসাদ পেল।

দুপুরে সাধুভাণ্ডারার সময় ছবিদি একখানা অপরূপ ভাষায় বর্ণনাতীত ভজন গাইলেন — "সন্ত পরম হিতকারী; জগৎ মাহী।" কন্যাপীঠের দুতিনটী ছোট ছোট ব্রহ্মচারিণী ছবিদির কাছে বসে সেই ভজনটী শিখে নিল। জয় মা, জয় মা, জয় জয় মা।।

■

মা

— ৺শিবপ্রসাদ ঘোষ

আনন্দময়ী নাম লয়ে মাগো
এ ধরায় প্রকাশিলে,
ধনী দরিদ্র পূজিল সকলে
জগজ্জননী বলে।

অপাপবিদ্ধা স্বয়ংসিদ্ধা
করুণানয়ন মেলে,
জীবনযাতনা পীড়িত সবার
বেদনা ভুলায়ে দিলে।
অতি সমাদরে পাপীতাপী সবে
স্থান দিয়েছ মা কোলে,
মোহান্ধকার নাশিয়া সবার
জীবেরে উদ্ধারিলে।

একাধারে তুমি মোদের সবার
জনক জননী ছিলে,
তোমার ধেয়ানে হইয়া মগন
যেন যেতে পারি চলে।

■

শ্রীশ্রী মায়ের কৈলাশ যাত্রা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রী শিবানন্দ

'জু-গুম্ফার' অপর নাম 'কোজর জু'। কোজর জুতে তিব্বতী লামাদের বসবাসের একটি বিশিষ্ট স্থান। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত চতুর্দ্দিকেই বহু গুম্ফা। কোজর জু অবশ্য তাদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং বিস্তৃত। এর মধ্যে বহু লামা বসবাস করেন। এস্থানে দুটি মন্দির-ও অবস্থিত। একটিতে শ্রী রাম লক্ষ্মণ সীতার মূর্ত্তি এবং অপরটিতে মহাকাল এবং তারামূর্ত্তি। এই উভয় মন্দিরের মধ্যস্থলে বিশাল এক প্রস্তর খণ্ডের উপরে বিশিষ্ট রেখাঙ্কিত একটি যন্ত্রবৎ চিত্র। এ যন্ত্রেই নাকি শক্তির অধিষ্ঠান। যন্ত্র লামাদিগের দ্বারা নিত্য পূজিত হয়ে থাকেন।

এক লামার নিকট শোনা গেল বৌদ্ধ তন্ত্রে তারাদেবীর উপাসনা সর্ব্বোচ্চ। তারা মূর্ত্তিও নাকি বহু স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। লামারা অধিকাংশই তারা মন্ত্রে দীক্ষিত। এই সব পূজা চীনাচার —মহাচীন হতেই এসব বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

একটি গুম্ফার মধ্যে প্রবেশ করে দেখা গেল ওর মধ্যে বহু প্রকোষ্ঠ। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে কোথাও তৈজসপত্রাদি, কোথাও বা পরিধেয় বহুবিধ বস্ত্রাদি, কোথাও বা দেখা গেল ভোজ্য দ্রব্যাদি রক্ষিত আছে।

এক প্রকোষ্ঠে এক শতদলের উপরে দণ্ডায়মান তিনটি মূর্ত্তি। জিজ্ঞাসায় জানা গিয়েছিল ঐ তিন মূর্ত্তি—এক পাশে পার্বতী, মধ্যস্থলে কিরাতরূপী শিব এবং অপর পার্শ্বে অর্জুন। অর্জ্জুন ধনুর্ধারী। তিনি কোদণ্ডনাথ অর্থাৎ ধনুর্ধারী অর্জ্জুন। ধনুর্ধারী অর্জ্জুন এ স্থলে আছেন বলেই এ স্থানের নাম কোজন জো। কোদণ্ডনাথ, তা থেকে কোজন্নাথ বা কোজরনাথ। 'জো' ঐ দেশীয় ভাষায় দেবতা। সুতরাং স্থানের নাম কোজর জো।

এ স্থান হ'তে কৈলাশ অল্প দূরে-ই। এ স্থানে প্রচণ্ড শীতল বাতাস। বাতাসে ঝড়ের বেগ। আগুন জ্বালাবার কোন উপায়-ই নেই। সুতরাং অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বে-ই সকলের ছাতু গ্রহণ করা হ'ল এবং কম্বল আশ্রয় গ্রহণ করে বিশ্রাম।

পর দিবস অতি প্রত্যুষ হতে-ই বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বৃষ্টির বেগ-ও তুখর। সুতরাং যাত্রা সুরু করতে প্রায় মধ্যাহ্ন ঘনিয়ে গেল। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে-ই পথ। কৈলাশ ক্রমশ:-ই সন্নিকট হচ্ছে। অতি কষ্টে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে প্রায় কৈলাশের পাদ দেশে-ই 'বুঁদ' নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। ওদিকে বেলাও গড়িয়ে গেছে। সুতরাং গাইডের নির্দেশে আজ এস্থানেই 'পড়াও' করা হ'ল।

স্থানের নাম বুঁদ। হাত ঘড়িতে তখন প্রায় ছয় ঘটিকা অপরাহ্ন। আমাদের তাঁবু কৈলাশের পাদমূলেই লাগান হয়েছে। সকলেই [illegible] নিবিড় ধ্যান মগ্ন। অদূরেই

তুষারের বিগলিত একটি প্রবাহ নির্ঝারিণী রূপে নেমে এসেছে। তার ওপরে দেখা যাচ্ছে একটা কাষ্ঠ সেতুও।

স্থির হ'ল কৈলাশ পরিক্রমা কালে যাবতীয় মালপত্র এ তাঁবুতেই গচ্ছিত থাকবে। মা বললেন, ঐ দেখ কৈলাসের চতুর্দ্দিক ঘিরে একটা কালো পর্বতের বেষ্টনী, গৌরী পীঠের মত ঘিরে রয়েছে। সকলেই স্পষ্ট ভাবে তা লক্ষ্য করল।

কৈলাশ যাত্রায় কৈলাশ পরিক্রমা-ই প্রধান কাজ। সে পরিক্রমা সুরু করতে হয় 'ধানকেনা' কিংবা 'তারচেন' থেকে। দু'টি স্থানই প্রায় পার্শ্ববর্ত্তী। তারচেন বা ধানকেনা এ স্থান হতে প্রায় ৫ মাইলের ব্যবধান। পরদিবস পাঁচ মাইল অতিক্রম করে ধানকেনায় উপস্থিত হওয়া গেল। স্থানটী ভোটান এলাকায়। শোনা গেল ধানকেনা ভোট-নৃপতির শৈলাবাস। এ স্থানে ভোটান রাজ প্রাসাদও অবস্থিত। একটি মঠ এবং তার মধ্যে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ প্রতিমাও রয়েছে। মঠের নাম গাংডা।

বেলা প্রায় ৫ ঘটিকা। আজ এখানেই স্থিতি। ভিক্ষাজীবীর সংখ্যাও এস্থানে প্রচুর।

আজ শুক্রবার ২৫ শে আষাঢ়। আজ সদলবলে মার পরিক্রমা যাত্রারম্ভ। কৈলাশ পরিক্রমা পথের দৈর্য্য ৩২ মাইল। এই সেই চির আকাঙ্ক্ষিত কৈলাশ, যক্ষ, গর্ন্ধব, কিন্নর অধ্যুষিত কৈলাশ।

চিরতুষারাবৃত কৈলাশকে কিঞ্চিৎ ব্যবধান থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শৃঙ্গটি প্রায় অর্দ্ধ ডিম্বাকৃতি। সমুদ্রতল হ'তে এর উচ্চতা প্রায় ২২,৫০০ ফিট। পরিক্রমা মার্গ তাহা অপেক্ষা অনেকটাই নিচে। কৈলাশের সর্বোচ্চ শিখরটির নাম গাংরি, সে কারণেই এ অঞ্চলটি 'গাংরিম্বোচি' নামে কথিত হয়।

প্রায় ১২ ঘটিকায় সুরু হ'ল পরিক্রমা। ধানকেনা থেকেই ক্রমাগত: চড়াইয়ের পথ। অল্পাধিক ছয় মাইল পরিক্রমা করতেই অপরাহ্ন গড়িয়ে এল। সুতরাং আজ এ পর্যন্তই। শ্বাস কষ্ট এ যাত্রার প্রধান বাধা। মায়ের কথিত কর্পূরাদি সঙ্গে থাকাতে যাত্রীদের শ্বাসকষ্ট কিঞ্চিৎ কমই অনুভূত হচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি স্বল্প পরিসর, কিন্তু খরস্রোতা নদীও অতিক্রম করতে হয়েছিল। মায়ের এ পরিক্রমা দক্ষিণাবর্ত্তে।

চলার পথে শিবচরণ চিহ্ন অংকিত একটি প্রস্তরও দেখা গেল। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী এক পর্ব্বত গাত্রে তিব্বতী লিপিতে কী সব অংকিত রয়েছে। গাইডের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষিত করতেই গাইড জানাল ও গুলো মহাবাণী ক্ষোদাই করা আছে। তার পার্শ্বেই একটি গুহা যে গুহা হ'তে ধূপের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছিল। পার্বতী সে গুহা হ'তে কিঞ্চিৎ যজ্ঞ বিভূতি সংগ্রহ করল। আগামী কল্য মায়ের গৌরীকুণ্ড পৌঁছানর কথা।

ভোর না হতেই যাত্রা সুরু গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে। এবার পথকে সাংঘাতিক আখ্যা দিলেও কম বলা হয়। পথ অল্প পরিসর তুষারাবৃত, পিচ্ছিল এবং দুর্গম। তদুপরি দুরন্ত হিম-শীতল

বাতাস। এ পথের সংকীর্ণতার কারণে ডাণ্ডি আবশ্যক। প্রয়োজনে পথের বাহন ক্ষুদ্রাকায় অশ্ব।

গৌরীকুণ্ডের যাত্রা, সুতরাং সকলেই অভুক্ত। শারীরিক অবস্থা অনুসারে গৌরীকুণ্ড দর্শন কিংবা স্পর্শন অথবা স্নানান্তে জল গ্রহণ। মায়ের আদেশে সকলেই আপন আপন ইষ্ট নাম জপ করতে করতে চলেছেন।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই তুষার বৃষ্টি ও রৌদ্রের খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। ক্ষণে বৃষ্টি ক্ষণে রৌদ্র। সকলেই সারিবদ্ধ ভাবে চলেছে। প্রচণ্ড চড়াই— গৌরীকুণ্ড ১৮,৬০০ ফিটে অবস্থিত।

আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হতেই মা অঙ্গুলি সংকেতে দেখালেন একটি বলয়াকার রেখা। মা বলেছিলেন, —ঐ দেখ ধর্মসভা। শরীরের মা বলত ইহা দর্শন শুভ লক্ষণ।

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হলে গাইড দেখাল সুদূর গগনে একটি নক্ষত্র। অনতিদূরেই চন্দ্রমা। সূর্য্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে। গাইড জানাল, তিব্বতীদের মতানুসারে এই ত্রয়ীর একত্র দর্শন পরম শুভ ও কল্যাণের সূচনা করে।

অদূরেই অপর একটি গুম্ফা। গুম্ফার মধ্যে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি চলার পথ হতেই দেখা যায়।

কৈলাশ প্রদক্ষিণ চলছে। অদূরেই এক ব্যক্তি মুণ্ডিত মস্তক অতি দীনবেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। গৌরীকুণ্ড আর দুই মাইলের ব্যবধান। এই দুই মাইল ক্রমাগত চড়াইয়ের পথ।

গৌরীকুণ্ড। উপস্থিত হওয়া গেল গৌরীকুণ্ডে। স্থানীয় ভাষায় গৌরীকুণ্ডের নাম দোলমা। ইহা চির বরফাচ্ছাদিত। এর পূর্ব তটে কিঞ্চিৎ উচ্চে চির হিমাবৃত কৈলাশ নাথের শ্রীপদযুগল। দূর হতেই তার দর্শন হয় সন্নিকট হওয়া অসম্ভব। পরিক্রমা পথের মধ্যে এই সর্ব্বোচ্চ বিন্দু। এ পথে গৌরীকুণ্ডেই যাহা কিছু করণীয়। এ স্থানে মন্দির বা পৃথক কোনো মূর্ত্তি নাই।

গৌরীকুণ্ডের অধিকাংশ ভাগই কঠিন বরফাচ্ছাদিত। কোথাও কোথাও তটসংলগ্ন স্থানে কিঞ্চিৎ তরলতার আভাষ।

ঐ রূপ একটি দ্রবীভূত স্থানের আস্তরণ সরিয়ে ভোলানাথ এবং দাসুদা কোন প্রকারে স্নান সমাপন করলেন এবং অবশিষ্ট সকলে মস্তকে জল সিঞ্চন করে এক এক অঞ্জলি জল পান করলেন। মাকেও করান হ'ল। পরে সঙ্গে নিয়ে আসা অখরোট, কিসমিস, বাদাম প্রভৃতি শুষ্ক ফল দিয়ে কৈলাশপতি ও গৌরীর ভোগ দেওয়া হ'ল। ধূপকাঠি দিয়ে ভোগের শেষে আরতি করা হ'ল।

পূজার শেষে টুনু ভোলানাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেন। মায়ের আদেশে ভোলানাথের জটা হ'তে কিছুটা অংশ গৌরীকুণ্ডে বিসর্জন দেওয়া হ'ল। সবশেষে গৌরীকুণ্ডের তটে বসেই

সকলে ঐ সব প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

প্রসাদ গ্রহণের সময় জনা কয়েক ভিক্ষাজীবী এসে উপস্থিত। সুতরাং ভোগের প্রসাদ তাদের মধ্যেও বিতরণ করা হ'ল।

মা দেখালেন, গৌরীকুণ্ডের পূর্ব তীর হতেই কৈলাশ শৃঙ্গের কিয়দংশ। বিচিত্র সুন্দর সে দৃশ্য, অবর্ণনীয় তার শোভা।

এবার পথ দক্ষিণ মুখে বাঁক নিয়েছে। সুতরাং ঘটল কৈলাশ পরিক্রমার সমাপ্তি। এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। প্রায় ১ ঘন্টা বিশ্রামের পর সদলবলে উৎরাইয়ের পথে যাত্রা হ'ল সুরু।

ফেরার মুখেই মা বললেন, পাঁচ জন সন্ন্যাসী সূক্ষ্মদেহে মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরিক্রমা করেছেন।

সঙ্গীয় সকলের মুখে সন্ন্যাসীদের পরিচয় জানবার উৎকণ্ঠা। মা বোধ হয় তা লক্ষ্য করেই বলে উঠলেন, "ওদের মধ্যেই একজন সূক্ষ্মশরীরী অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে ? ওরা উত্তর দিল, আমরা কানাইয়ের শিষ্য।"

দিদি প্রশ্ন করলেন, 'মা কানাই কে ?' মা বললেন, "কানাই ? কানাই ঐ যে তোমাদের মহেশ ভট্টাচার্য্যের ভাইপো।" বলেই আবার বললেন, "ওর কথা থেকে এটাই বোঝা যায়, কানাই পূর্ব জন্মে আরও উন্নত অবস্থায় ছিল।"

মা আবার বললেন, "তোমাদের যখন দেখি, ওদেরও সেরূপ পরিস্কার দেখতে পাই। তোমরা যেমন পায়ে হাত দাও প্রণাম কর, তোমাদের পাশে বসে ওরাও তাই করে।"

বেশ কিছুটা উৎরাইয়ের পর মা উপস্থিত হলেন ভিডিপো তে। ভিডিপোর দুটি গুহাতেই গাইডের কথায় আশ্রয় গ্রহণ করা হল। ভিডিপো প্রায় জনশূন্য স্থান।

পরিক্রমা শেষ হয়েছে, সকলেই প্রসন্নচিত্ত, তবে ততোধিক শ্রান্ত ক্লান্ত। সুতরাং ভিডিপোতেই বিশ্রামের ব্যবস্থা হল।

(ক্রমশ :)

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা

(দশম প্রকাশ)

—প্রতিভাকুমার কুণ্ডু

গোবিন্দপুর, 'গোবিন্দের জায়গা' ধন্য। মা বলেছিলেন, 'গোবিন্দপুর গোবিন্দের জায়গা।' গোবিন্দপুরের মাটি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের চরণধূলিতে পূত, বিশুদ্ধ। গোবিন্দপুরের কথা এবং মাতৃলীলা পরবর্ত্তী কোনো প্রকাশনে বিশদভাবে বিবৃত করার ইচ্ছা আছে। অপূর্ব্ব চিত্তগ্রাহী সে কথিকা।

চতুর্থ কথিকা : আমেরিকায় নামযজ্ঞ

শুধু নামযজ্ঞের কথিকাই অনেকগুলো লেখা যেতে পারে। বৃন্দাবনের শতখোলের নামযজ্ঞ, কুরুক্ষেত্রের, কনখলের, ইদানীংকালের ধবলচীনার, আরও অনেক জায়গার। ক্রমশ : প্রকাশিতব্য।

বড় কন্যা ঊর্মি, জামাতা অমরনাথ, দুই নাতি সারথি ও রথী ১৯৯০ সনে আমেরিকা গেল। ১৯৯২ সন শুরু হোল। দু'বছরেও ঊর্মির আমেরিকায় মন বসল না। শ্রীশ্রী মায়ের ধারায় এখানকার মাতৃপূজা, উৎসব, নামকীর্ত্তন, নামযজ্ঞ সৎসঙ্গ, এইসব আনন্দ অনুষ্ঠানের অভাবে পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিপরীত গোলার্দ্ধে বসে খুবই নিরানন্দে থাকে ঊর্মি। ক্যান্‌সাসের লরেন্সএ থাকে। প্রায় প্রতি মাসে দূরভাষে বাবা ও মায়ের সঙ্গে কথা বলে ও আমাদের গলার আওয়াজ শোনে। কিন্তু আনন্দ-উৎসবাদির বিবরণ পেয়ে কন্যা আরও বেশী নিরানন্দ হয়ে পড়ে। এখানকার সমস্ত খবর দিয়ে ওকে খুশি করতে চেষ্টা করি, হিতে বিপরীত হয়। বিশেষ করে ঊর্মির প্রাণ-বিগ্রহ শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা ও দোল-উৎসবাদির খবর যখন পায়, তখন তো ওর মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের চরণেই পড়ে থাকে। ভাববোধশূণ্য শরীরটা নিয়ে ল্যাবোরেটরির কাজ, কলেজের পড়াশুনা, সাংসারিক জীবনযাত্রা কোনোরকমে চূড়ান্ত একঘেয়েমির মধ্যে সম্পাদন করে। তাই বাবা মাকে ওদের কাছে যেতেই হবে। ১৯৯২তেই।

আমি ঊর্মিকে সুদীর্ঘ পত্রে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে লিখলাম, যার সারাংশ এই, দুই দুইবার বহু দেশবিদেশ ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি। আর ঘোরবার সখ নেই, দেখবারও সখ নেই। তুই যখন নাছোড়বান্দা তখন মাত্র একটা কারণ ঘটাতে পারিস যদি, তবেই আমাদের আমেরিকা যাওয়া হতে পারে। তবে হয়তো শ্রীশ্রী মা একটু কৃপা করলেও করতে পারেন। ওখানে, আমেরিকায় নামযজ্ঞের ব্যবস্থা যদি করতে পারিস তাহলে আমরা যাবার প্রচেষ্টা করতে পারি। নইলে নয়। অকারণ অর্থব্যয়ে বিদেশভ্রমণ কদাপি নয়।

এই কথিকাটির ভূমিকাটুকু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হোল। শ্রীশ্রী মায়ের জন্যই আমাদের এই জীবন। মায়ের সামান্যতম একটু অনুকম্পার জন্যে আমরা সবাই আমাদের হৃদয়ের, মনের, চিত্তের ও প্রাণের সব দরজা জানলাগুলো খুলে রেখেছি, কখন মায়ের অনুকম্পার আঁচলের হাওয়াটুকু

ঢুকে পড়বে। অনুকম্পার আভিধানিক অর্থ হোল কৃপা, দয়া, করুণা, স্নেহ। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মায়ের কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। আমরা কখনো কখনো বুঝতে পারি। কখনো পারি না, টেরও পাই না। অথচ অলক্ষ্যে সেই কৃপাটুকুর কাজ হয়েই যায়। যাচ্ছেও।

যেই মুহূর্ত্তে বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সদিচ্ছাটুকু সংযুক্ত হোল, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই শ্রীশ্রী মায়ের খেয়াল ও কৃপা দুটোই শুরু হোল। মায়ের অনুকম্পাটুকু ব্যক্ত করার জন্যেই এত বড় ভূমিকা। মাকে নিয়েই তো আমাদের সকলের প্রতিদিনের প্রতিক্ষণ চলার চেষ্টা। শুধু চেষ্টা নয়, প্রচেষ্টা। তবু তো তারই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আমরা মাকে ভুলে যাই। অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাই। নানারকম জাগতিক সাংসারিক রঙ্গরসে মজে যাই। সম্বিৎ ফিরে এলে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে সাময়িক বিস্মৃতির জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করি। মা ক্ষমা তো করেনই, না হলে কৃপা করেন কেন? মা সব কিছু সয়েও কৃপা করেন।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প স্ব-মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। মা যদি এই সদিচ্ছাটা আমার মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ না করিয়ে দেন, তাহলে আমেরিকায় অভূতপূর্ব্ব নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবার কল্পনা আমার পক্ষে 'অচিন্তনীয়। আর মা না করিয়ে নিলে আমার মত সীমিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সাধ্য কি, আমেরিকাতে এই মহানামযজ্ঞ করা। নামযজ্ঞ করার ইচ্ছাটি উচ্চারিত হতেই শ্রীশ্রী মায়ের কৃপার অঝোর-বর্ষণ শুরু হোল, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত ক্যানসাস্ সিটিতে শুভ নামযজ্ঞ সুসম্পন্ন হোল। এটি একটি বিচিত্র সুখপাঠ্য এবং আনন্দ অনুভূতি লভ্য স্মরণীয় কথিকা।

ভাইজীর 'মাতৃদর্শন' থেকে উদ্ধৃত করছি: 'শ্রীশ্রী মায়ের স্পর্শে, ইঙ্গিতে, কথায়, হাসিতে আমাদের জীবনের তিল তিল যে কত পরিবর্ত্তন নীরবে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের নিত্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্যে তাঁহার আশিস কিভাবে কার্য্য করিয়াছে এবং করিতেছে সে সব কথা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রী মায়ের মহিমাকে খর্ব্ব করা হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তাহা দ্বারা বরং তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয় এবং উহা আমাদিগকে সার্থকতার পথে আমাদের অজ্ঞাতে অগ্রসর করাইয়া দেয়।'

ভাইজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল জ্যোতিশচন্দ্র রায়। নিবাস ছিল চট্টগ্রামে। তিনি বাংলা ১৩৪৪ সনে (ইং ১৯৩৭) আলমোড়াতে দেহত্যাগ করেন। ভাইজীই সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য জীবন-লীলা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচার করে গিয়েছিলেন।

নামযজ্ঞের সঙ্কল্পটি প্রকাশ করার পর ঘন ঘন চিঠি-মারফৎ ও টেলিফোনে নানারকম শুভ অলৌকিক খবর আসতে শুরু হোল। ওদের শহর লরেন্স্ ক্যানসাস্ সিটি থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে এবং শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রায় গ্রামের মতই ছোট্ট একটি শহর। আমেরিকায় বড় গ্রামে ও ছোট্ট শহরে পরিবেশজনিত কোনোই তফাৎ নেই, না বাড়ী ঘরে, না দোকানপাটের চাকচিক্যে, না লোকজনের চালচলনে।

লরেন্সে নামযজ্ঞ করার মত ভালো বড় হলঘর নেই, মন্দির তো নেইই। ক্যান্সাস্ সিটিতে

১৯৯১ সনে একটি অতি সুদৃশ্য, বড় এবং মনোরম হিন্দু মন্দির তৈরি হয়ে উদ্‌ঘাটন হয়েছে। তৈরির পিছনে অবাঙ্গালী ভারতীয়দেরই প্রচেষ্টা সর্ব্বাধিক। অবশ্য কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। ঐ মন্দিরেই নামযজ্ঞ হবে, প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে। আমি ওখানে গেলে বিশদ পর্য্যালোচনা হবে মন্দিরের ট্রাস্টিবোর্ডের সঙ্গে। স্থান নির্বাচন এমন সহজভাবে ও অনায়াসে হয়ে গেল যেন মনে হোল মন্দিরটি নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্যই নির্মিত হয়েছে। শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা ছাড়া অন্য কল্পনাপ্রসূত সমাধানের প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৯২তে নামযজ্ঞ। ১৯৯১তে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা। ঊর্মিও ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আগে কিছুই জানত না।

আমেরিকায় সাধারণত: স্কুল কলেজের অডিটোরিয়াম বা চার্টার্ড হলঘর ভাড়া নিয়ে নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ক্যান্‌সাস্ সিটির ঐ হিন্দু মন্দিরে ১৯৯২এর জুন মাসে গিয়ে দেখেছিলাম অম্বা দেবী, রাম লক্ষ্মণ সীতা, রাধাকৃষ্ণ, শিব, গণেশ, শিরদির সাঁইবাবা, এঁদের অতীব সুন্দর সাদা পাথরের মূর্ত্তি বসানো। এই দেবদেবীদের সামনে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এখন ভাবলেও আনন্দে মনটা পুলকিত হয়ে ওঠে।

ঐ হিন্দু মন্দিরের নাটমন্দিরে পূজা ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান হয় না। নীচের তলায় অর্থাৎ বেস্‌মেন্টে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ইত্যাদির জন্য হলঘরটি রান্নাঘর বাথরুমসহ ভাড়া দেওয়া হয়। আরও মাতৃকৃপা আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল। মন্দিরের ট্রাস্টিবোর্ড নামযজ্ঞের জন্য নাটমন্দির ও নীচের হলঘরের জন্য কোনো ভাড়াই নিলেন না, বরং তাঁরা এই বিরাট অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-অনুষ্ঠানে পাঁচশত ডলার (বর্ত্তমান মূল্যায়ণে প্রায় আঠার হাজার টাকা) অনুদান বা প্রণামী দিতে চাইলেন। অথচ নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানটা কি তার কিছুই তাঁরা অবগত ছিলেন না। শ্রীশ্রী মায়ের অব্যক্ত করুণা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

কোলকাতাতেই নামযজ্ঞের কার্ড ছাপিয়ে ঊর্মিকে পাঠালাম। দিন স্থির করেছিলাম শনি-রবিবার দেখে ২০শে ও ২১শে জুন, ১৯৯২। পাঁজি-পুঁথি দেখিনি। মন্দির কর্ত্তৃপক্ষ জানালেন, ওঁদের খেয়াল ছিল না, ২১শে জুন একজন ভারতীয়ের একটা মানসিক পূজা করাবার আছে। মন্দির কর্ত্তৃপক্ষের আগে অনুমোদন ছিল, জুন মাসের যে কোনো শনি-রবিবারই নামযজ্ঞ হতে পারে। এই তারিখ পরিবর্ত্তনের পালাতেও মায়ের অদৃশ্য হাত কাজ করছিল। কর্ত্তৃপক্ষ বলে পাঠালেন ১৩ই ও ১৪ই জুন নামযজ্ঞ করতে। আমরা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলাম। স্ত্রী পদ্মাকে বললাম, 'এই তারিখের পরিবর্ত্তনের নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছে।' এইবার পাঁজি দেখতে বসলাম। দেখা গেল, ২১শে জুন অম্বুবাচি প্রবৃত্তি। অম্বুবাচির মধ্যে মহামন্ত্র নাম করা চলে, কিন্তু কোনো শুভ অনুষ্ঠান করা চলে না। নামযজ্ঞ তো অত্যন্ত শুভ সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ। তাই মায়ের এই তারিখ পাল্টাবার ব্যবস্থা। ছাপানো সব কার্ডে লাল কলম দিয়ে তারিখ-পরিবর্ত্তনটুকু করে নিতে হোল।

এই তারিখ পরিবর্ত্তনের আরও একটু তাৎপর্য্য ছিল। আমার শ্বশুরবাড়ীর কুলবিগ্রহ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের ষান্মাসিক ভোগপালা তদুপরি ১৪ই জুন ছিল পূর্ণিমা এবং তৎসহ চন্দ্রগ্রহণ। ঊর্মির

খুব চিন্তা ছিল, ১৩ই ও ১৪ই জুন কম্পিউটার ল্যাবোরেটারী থেকে ছুটি পাবে কিনা। কিন্তু হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে ১২, ১৩ ও ১৪ই জুন ঊর্মি ছুটি পেয়ে গেল। এত সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হোল যে, মা স্বয়ং সম্পূর্ণ নামযজ্ঞটিকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। আমাদের শুধু উদ্যোগপর্বটুকু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারপর তো সব চিন্তা মায়ের।

অবশেষে আমেরিকার পথে, পথে নয় আকাশে, যাত্রা করলাম। একটা বড় স্যুটকেসে সবই নামযজ্ঞের জিনিস। পদ্মার হাতের ব্যাগে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গোবর ও গঙ্গাজল। ম্লেচ্ছ যবনের দেশে নামযজ্ঞ। কোলবালিশের মত আমার গলাসমান একটা এক্সটেণ্ডেবল্ বস্তায় পদ্মা ঊর্মির জন্যে বোঝাই করে নিয়েছে সুগন্ধি চাল, মুগ ডাল, তেঁতুল, গাওয়া ঘি, সরষের তেল, পোস্ত, যাবতীয় মশলাপাতি, পাঁপড়, আমসত্ব, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সবই আমেরিকায় নেওয়া নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে জরিমানা তো হবেই দু'চার দিন হাজতবাসও করতে হতে পারে।

নিউইয়র্ক এয়ার পোর্টে এক্সরে মেশিন দিয়ে মালপত্র চেকিং শুরু হোল। একজন সাদা মহিলা ও একজন কালো ভদ্রলোক মেশিনের কাছে ছিলেন। মা ওদের মস্তিষ্কে বুদ্ধি দিয়ে বলালেন, প্রথমে ঐ স্যুটকেসটা মেশিনে তুলুন। অর্থাৎ নামযজ্ঞের স্যুটকেসটা। ছবিতে করতালজোড়া গোল কালো হয়ে ফুটে উঠল। অতএব স্যুটকেস খুলতে হোল। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস বেরোতে লাগল যে ওরা হতভম্ব, স্তম্ভিত, বাক্যরহিত হয়ে গেলেন। কারণ ওসবের একটিও ওরা সারা জীবনে চোখেও দেখেননি। ফর্দ খুবই লম্বা, প্রধানত: বেরোল করতাল, চিত্রিত পাঁচটি ঘট, চিত্রিত ছোট্ট একটি দধিভাণ্ড, শ্রীশ্রী মায়ের চরণ-অঙ্কিত রুমাল, মঞ্চের জন্য দেবদেবীদের ছবি, চারটি তীরকাঠি, পাঁচটি কাগজে মোড়ক করা পৈতা, চন্দন কাঠ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি জিনিস ওদেরকে বোঝাতে হোল, কি জিনিস এবং ব্যবহার কি। চন্দন কাঠ বলতেই হাতে তুলে নিয়ে নাকের কাছে প্রায় নিয়েছে। তাড়াতাড়ি থামালাম। বললাম, 'ঘ্রাণ নেওয়া হয়ে গেলে আমাদের পূজার কাজে লাগবে না।' মা ওদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করে ওদেরকে সংযত করে দিলেন। এই একটি স্যুটকেস পরীক্ষা করতেই ওরা আশ্চর্য্য, অবসন্ন ও ঘায়েল হয়ে গেলেন। চালের বস্তাটা দেখিয়ে বললেন, 'ওসব আপনারা নিয়ে যান। আর আমরা কিছু পরীক্ষা করব না।' এতক্ষণে আমার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হোল। ভারতীয় গরুর মল যে পদ্মার হাতব্যাগে, সেটা আর ওরা জানতেও পারলেন না, তার সুঘ্রাণও অনুভব করতে পারলেন না।

লরেন্সে পৌঁছে দেখলাম, বাঙ্গালীরা কেউই 'হরে কৃষ্ণ' নাম করতে জানেন না, নামযজ্ঞ কি তাও জানেন না। তিনদিন মাত্র রিহার্সাল দেওয়ালাম। আমি এক ওস্তাদ গায়ক! 'ওস্তাদের মার শেষরাত্রি' কাকে বলে, হাড়ে হাড়ে ও হাড়ের মজ্জায় মজ্জায় টেরটা পেলাম। বুঝলাম, ভরাডুবি সামলাতে একমাত্র মাতৃকৃপাই ভরসা। 'মা আছেন, কিসের চিন্তা ?'

আমেরিকার আইনে সারারাত প্রদীপের আলো জ্বালাতে দেবে না। সব দোকানপাট ঘুরে ঘুরে অবিকল প্রদীপের মত ছোট্ট ইলেকট্রিক আলো পেলাম। সেইটি চব্বিশ ঘন্টা জ্বালানো রইল। ঘুরতে ঘুরতে একটা কোরিয়ান দোকানে এক বস্তা ছাড়ানো নারকেলের উপরে দুটো

সবুজ কাঁচা সশীষ ডাব দেখলাম। তখন আমার আনন্দ আর ধরে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ দুটো আনিয়েছেন কেন?' দোকানী বললেন, 'আমি আনাইনি। নারকেলের বস্তায় এসে গেছে। কেন এবং কেমন করে এসে গেল জানি না। এত বছরের দোকান, কোনোদিনই আসেনি।' আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা আছেন, ব্যাপার তো খুবই স্বচ্ছ। কিনে নিলাম তৎক্ষণাৎ। আমেরিকায় তিরিশ চল্লিশ বছর আছেন, সেইসব বাঙ্গালীরা সশীষ ডাব দেখে বললেন, ওদের দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কোনো পূজাতেই কোনোদিনই সশীষ ডাব দিতে পারেন নি।

মঞ্চের মোকামের জন্য পান পাওয়া গেল না। বড় জামাতা অমরনাথের বন্ধু প্রদীপ নিউইয়র্ক থেকে নামযজ্ঞে এসেছিল। ওর বাতাসা ও পান আনবার কথা ছিল। শনিবার দোকান বন্ধ ছিল। আনতে পারল না। মন্দিরের বাগানেই একটি গাছের পাতা পাওয়া গেল, অবিকল পানের মত। মঞ্চের মোকামে সেই পাতা পাঁচটি দেওয়া গেল। দেখতেও সুন্দর মানানসই হয়ে গেল।

আমেরিকায় টিভিতে ভোর বেলা আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাষ দেখে লোকেরা টুপি, ছাতা, বর্ষাতি নিয়ে কাজে বেরোয়, অথবা না নিয়ে বেরোয়। কারণ ওদেশে টিভির ঘোষণা অভ্রান্ত। ১৪ই জুন রবিবারের ঘোষণায় ছিল সুর্যকরোজ্জ্বল দিন। সকাল থেকে সুন্দর রোদ ছিল, আবহাওয়া পরিষ্কার। কিন্তু শ্রীশ্রী মায়ের নামযজ্ঞ তো, মায়ের ইচ্ছাতেই আবহাওয়া পাল্টাবে। দুপুরে ভোগ হোল ঠিক বারোটায়। ভোগ আরতির পরই ঝিরঝির করে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হোল। পাঁচ ছয় জন মার্কিন নাগরিক মঞ্চ ঘুরে ঘুরে নাম করছিলেন। আমরা ওদেরকে ইংরেজি অক্ষরে সম্পূর্ণ নামযজ্ঞের স্ক্রিপ্ট দিয়েছিলাম। একজন মার্কিন মহিলা নামাবলী গায়ে দিয়ে মঞ্চ ঘুরছিলেন ও নাম করছিলেন। পুষ্পবৃষ্টির অর্থই শ্রীশ্রী মায়ের খেয়াল ও উপস্থিতি।

ভোগের পর দেড়শ জন প্রসাদ পেল। মন্দিরের হলভাড়া তো দিতেই হয়নি। প্রসাদেরও কোনো খরচাই হোল না। কারণ সবাই বাড়ী থেকে নানারকম রান্না নিয়ে এসেছিলেন। এর নাম হোল পট্‌লা। কেউ এনেছেন দশ কিলো আলুর দম, কেউ এনেছেন পাঁচশ লুচি, কেউ এনেছেন খিচুড়ি, কেউ এনেছেন পুষ্পান্ন। এইরকম ভাল সবজি, তিন রকম চাটনি, পায়েস ইত্যাদি। প্রসাদ পাওয়ার পর প্রফেসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ছাত্র, ছাত্রী সবাই মিলে হলঘরের মেজে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে দিল। উপরে নাটমন্দিরে নাম চলছিল। মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের শ্রীমতী সোনাল খেতিয়া, শ্রী অরবিন্দ খেতিয়া, শ্রী মেহতা, শ্রীবাজাজ, শ্রী আনন্দময় ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য্য মঞ্চের কাছে বসে নাম করছিলেন।

রবিবার নামযজ্ঞের শেষে শ্রীমতী সোনাল খেতিয়াকে দিয়ে বাতাসার পরিবর্ত্তে টফি দিয়ে লুট দেওয়ালাম। উনি অভিভূত। ঊর্মিকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাইকে শ্রীশ্রী মায়ের চরণ-অঙ্কিত রুমাল প্রসাদ দেওয়া হোল। শেষটা মাতৃকৃপায় এত সুন্দর হোল যে মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের সকলে তখনই প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, 'আবার কবে হবে?' আবার কবে আসবেন?

আমেরিকায় গিয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতি দেখিনি, ডিস্‌নেল্যাণ্ড দেখিনি, কলোরেডো দেখিনি, অনেক কিছুই দেখিনি, দেখবার আগ্রহও নেই, কিন্তু মায়ের কৃপা দেখেছি, মায়ের খেয়াল অনুভব করেছি।

(ক্রমশ:)

"খেলা যখন ছিল তোমার সনে তখন কে তুমি তা কে জানতো"

ডায়েরীর ছেঁড়াপাতা থেকে....

— চিত্রা ঘোষ

১৯৬৪, দেরাদুন, ৪ ঠা অগাষ্ট :

মা গতকাল বলছিলেন সর্ব্বানন্দের* অসুখের একটা গল্প। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ওকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। ডাক্তার বলেছিল যে ওর heart এর valve এ ফুটোর দরুণ যে কোনো মুহূর্ত্তে ওর হার্ট ফেল হতে পারে। মা সে সময় সে রাতে সর্ব্বানন্দের ঘরে কিছু সময় দরজা বন্ধ করে ছিলেন, ব্যাপারটা আমরা কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। অসুখের মধ্যে সর্ব্বানন্দ একদিন লুচি ও আলুর দম খেলে সে ভাল হয়ে যাবে এ কথা মাকে সে বারবার বলে। কিন্তু তখন তাকে ঐ খাবার দেবার মতন তার শরীরের অবস্থা নয়। কুমড়ো বীচির ভেতরের শাঁস বের করে ধোঁকা বানিয়ে তার ডালনা খেতেও সর্ব্বানন্দ চেয়েছিল। এ দুটি তার খুব প্রিয় মেনু ছিল সুস্থাবস্থায়। বুনিদি সেদিন মাকে বলে যে বারবার সর্ব্বানন্দ বলছে যে ঐ দুই পদ খেলেই আমি ভাল হয়ে যাবো। বাঁচবেই না তো — তাই দিলেই হতো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমরা কিশনপুর (দেরাদুন) আশ্রমে মার ঘরে ছিলাম। মা হঠাৎ আমাদের ঘর থেকে বাইরে যেতে বলে বিমলাদিকে (দয়ানন্দ) প্রাইভেটেলী কী সব বললেন। সন্ধ্যার পর মা লুচি, আলুরদম ও ধোঁকা একটু খেলেন। আরেকজন ভদ্রমহিলা সেদিন সোমবারের উপোষ করেছেন তার জন্যেই যেনো মা করিয়েছেন ও খেলেন এরকমভাব দেখিয়ে বিমলাদিকে বললেন তাকে প্রসাদ দিতে। তারপর সর্ব্বানন্দর ঘরে ঢুকে একটু লুচি, আলুরদম ও কুমড়াবীচির শাঁসের ধোঁকা ভেঙ্গে চটকিয়ে সেই আঙ্গুল সর্ব্বানন্দের মুখে যেই ঢুকিয়েছেন, সর্ব্বানন্দ প্রাণভরে মার আঙ্গুল চেটে চেটে আস্বাদ নেয়। বুনিদি আমাদের পরে বলল্ এক ফোঁটা জল যে রুগী খেতে পারে না অথচ মার আঙ্গুলের কী ভাবে আস্বাদ নিলো। তারপর মা ওকে বলেন, "তুমি তো বলেছিলে এসব খেলে তুমি ভাল হয়ে যাবে। এখন ভাল হও।" তিনবার এই কথা বললেন। সত্যই তার পরদিন থেকেই ওর অসুস্থতার সাময়িক মোড় ঘুরে যায়। ভক্তের ভগবান।

** সর্ব্বানন্দ সন্ন্যাসিনী কুমারী, জিতেনঠাকুরের শিষ্যা, পরে শ্রীমার আশ্রমে আসে। কুম্ভে এলাহাবাদে তার দিদিমার নিকট দীক্ষা হয়। উপরের ঘটনার বছর খানেক পর সে দেহ রাখে।

আশ্রম-সংবাদ

১. ভোপাল —

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল নগরে বৈরাগড়ে লেকের উপরে স্থিত শ্রী শ্রী মায়ের সুরম্য আশ্রমে ১৮ই ডিসেম্বর হতে ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অপূর্ব্ব অভিনব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।তিনদিন ব্যাপী এই আনন্দ সন্মিলনীতে যোগদান করার জন্য হৃষিকেশ হতে দিব্যজীবন সংঘের বিশিষ্ট মহাত্মা শ্রীরাম রাজ্যমজী আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। গীতার উপর তাঁর সারগর্ভিত বিদ্বত্তাপূর্ণ ভাষণে সকলে মুগ্ধ হন।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর তিনটি প্রতিযোগিতা নির্দ্ধারিত করা হয়। প্রথম দিন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছিল। চিত্রের বিষয় ছিল —

(ক) অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের রথ কৌরব পাণ্ডব সেনার মাঝে নিয়ে যেতে বলছেন।
(খ) বিষাদগ্রস্ত অর্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছেন।
(গ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় দিনে নৃত্য প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছিল। বিষয় ছিল —

(ক) ভারত নাট্যমের মাধ্যমে "ওঁ ধৃত সহজ সমাধি....." এই মাতৃধ্যানের উপর নৃত্য।
(খ) গীতার শ্লোকের উপর ভারত নাট্যমে ভাবনৃত্য।

তৃতীয় দিবসে গীতার শ্লোক পাঠ ও প্রশ্নমঞ্চ (প্রশ্নোত্তরী) প্রতিযোগিতা ছিল।

এই প্রতিযোগিতাতে ভোপাল ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রায় চারশো ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বালক-বালিকাদের সুন্দর সুন্দর পুরস্কারের দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। আশ্রমের পক্ষ হতে সমস্ত বালক-বালিকাদের ও সমবেত অতিথিদের জলযোগেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

তিনদিনের এই নয়নাভিরাম সুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানে সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধানচার্য্য, শিক্ষকবৃন্দ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ যোগদান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব সচিব শ্রী তনবন্ত সিংহ কীরজী এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রী অগ্নিহোত্রীজী মুখ্য অতিথির পদগ্রহণ করেন। উৎসবের তিনদিনই আশ্রমের হলঘরে সকালে গীতাপাঠ, শ্রীকৃষ্ণ ও মায়ের পূজা বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের আয়োজনে শ্রী প্রফুল্ল মাহেশ্বরীজী ও আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যথার্থই প্রশংসনীয়।

আশ্রমসচিব ব্রহ্মচারিণী কৃপালজীর নির্দেশনায় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাতেই এই উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

২. কলিকাতা —

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনী, সল্টলেক এর সংযোজনায় 'শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী স্মরণ মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর। এই তিনদিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান অতি আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়।

এই উৎসবে কলকাতার বিশিষ্ট সুধীজনেরা অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী স্বরূপানন্দগিরি মহারাজ, কাশী আশ্রম থেকে শ্রী পানুব্রহ্মচারীজী, কন্যাপীঠের অধ্যক্ষা ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জ্জী ও ব্রহ্মচারিণী সন্ধ্যা ব্যানার্জ্জীও এসে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে স্বামী ভজনানন্দজীর (পুষ্পদির) উপস্থিতি সকলকেই বিশেষ করে আনন্দ দেয়।

উৎসবের তিনদিন বিশিষ্ট বক্তারা চারটি প্রশ্নের আধারে তাঁদের বক্তব্য রাখেন —

প্রথম প্রশ্ন — ভগবান বা ঈশ্বর বলতে আমরা কি বুঝি?
দ্বিতীয় প্রশ্ন — শাস্ত্র ও মহাপুরুষেরা এই প্রসঙ্গে কি বলেন?
তৃতীয় প্রশ্ন — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর জীবনী ও বাণীর সঙ্গে এই প্রশ্নের কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে কি?
চতুর্থপ্রশ্ন — এই আলোচনায় ব্যক্তি ও সমাজের কোন লাভ আছে কি?

অনুষ্ঠানের আরম্ভ বৈদিক মঙ্গলাচরণের দ্বারা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিদির ভাবময় মধুর সঙ্গীতে একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামী ভজনানন্দজীর স্তবগানে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতি অনুভূত হয়। স্বামী স্বরূপানন্দজী আশীর্ব্বাণী পাঠ করেন।

ভাষণে ছিলেন আচার্য্য সৌমেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারিজী (দেবসংঘ), ব্র: বেলাদেবী (আদ্যাপীঠ), স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ, ডা: গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, ডা: ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রী অমলেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রী অমিয় কুমার মজুমদার, শ্রী প্রতিভাকুমার কুণ্ডু, শ্রী জয় মুখোপাধ্যায়। এঁদের সকলের জ্ঞান গরিমাপূর্ণ ভাষণে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য (অধ্যক্ষা কন্যাপীঠ) এবং ব্র: গীতা ব্যানার্জ্জীও নিজেদের বক্তব্য রাখেন। ব্র: সন্ধ্যার সংস্কৃত ভাষণের সকলে প্রশংসা করেন।

শ্রীমতী জয়শ্রী মজুমদারের গানও সকলের মন আকৃষ্ট করে। স্বামী তন্ময়ানন্দজী মহারাজ এই বয়সেও গানে সকলকে মাতিয়ে দেন। ডা: চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় উৎসবটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়। একটি অনাবিল আনন্দে সকলের মন প্রাণ ভরে যায়।

৩. বারাণসী —

গত ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যপর্বে কাশীতে মায়ের আশ্রমে প্রতিবছরের মত উদয়াস্ত নাম কীর্ত্তন ও গায়ত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের বিশেষতা হল আমেরিকাবাসী এক মাতৃভক্ত পরিবারের সাদর আমন্ত্রণে চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীশ্রী পদ্মনাভের বিশেষ পূজা ও ভোগ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে স্বামী ভাস্করানন্দজী, ব্রহ্মচারী শান্তিব্রত এবং কনখল থেকে অন্য ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীরা আসেন। পূজা উপলক্ষ্যে চণ্ডীমণ্ডপ খুব সুন্দর ফুলের সাজে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মচারী শান্তিব্রত এইদিন বিরজাহোম করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় স্বামী নির্গুণানন্দজী।

পরের দিন আমেরিকার মাতৃভক্ত পরিবারের একটি ছেলের পৈতা হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী কন্যাপীঠের হল ঘরে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

কন্যাপীঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রতিবছরের মত এবারও দিব্য জীবন সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ ১লা মার্চ কাশী আশ্রমে এসে পৌঁছান। ২রা মার্চ আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে কন্যাপীঠের বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হয়। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা নানা কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। কাশীর বিশিষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই উৎসবে যোগদান করেন। সুধীপ্রবর ডা০ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত কাব্যপাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরাও সুন্দর বলেন।

মুখ্য অতিথির পদ থেকে স্বামী চিদানন্দজী বলেন, "কন্যাপীঠের উদ্দেশ্য হল আদর্শ চরিত্র গঠন। আদর্শচরিত্র গঠনের জন্য তিনটি মহনীয় গুণ নিজের জীবনে আনতে হবে —

(১) পরোপকার - এর মধ্যে দয়া, প্রেম, অহিংসা, নি:স্বার্থ সেবা প্রভৃতি মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণ অবশ্যই স্বীকার্য্য হবে।
(২) সত্যভাষণ - কায়মনোবাক্যে সত্য পালন। কারণ সত্যই ভগবানের স্বরূপ।
(৩) সদাচার - উচ্চ আচরণ।"

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী বলেন, "জীবনে এই মহনীয় গুণগুলি একান্তই প্রয়োজনীয়।"

সভাপতির আসন থেকে কাশীনরেশ ডা: বিভূতি নারায়ণ সিংহজী বলেন, "এখানে 'সুকন্যার' জন্য পুরস্কার রাখা হয়েছে। যদি কন্যারা যথার্থই সুকন্যা হয় তবে মাতৃকৃপাধারা কন্যাদের উপর অবশ্যই বর্ষিত হবে। কন্যাদের সংখ্যা লঘুতা বিচারণীয় নয়, কিন্তু গুণের গরিমা ও মহদ্গুণের প্রাচুর্য্যই দেখতে হবে কার মধ্যে বিকশিত হচ্ছে। যদি একটি কন্যাও যথার্থ 'সুকন্যা' হয় তবে সে 'বিশ্বকন্যা' হতে পারবে এবং তার দ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।"

এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি সঙ্গীতের দ্বারা অনুষ্ঠানের সমাপন হয়।

মহাশিবরাত্রি গত ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে মার্চ দোলপূর্ণিমায় গোপালের মহাস্নান, অভিষেক, নূতন বস্ত্রে বিভূষিত করে ষোড়শোপচারে পূজা হয়। শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা এবার ৮ই এপ্রিল হতে ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল—

মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে এক মাসব্যাপী নি:শুল্ক শিবির ১০ই ফেব্রুয়ারী সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। প্রায় ২৩০০ রোগী এতে লাভান্বিত হয়। রোগীদের নি:শুল্ক ঔষধ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা, এক্সে এবং নি:শুল্ক অপারেশন প্রভৃতিও করা হয়।

৩রা মার্চ দিব্যজীবন সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী চিদানন্দজীর উপস্থিতিতে মা আনন্দময়ী করুণার পক্ষ হতে বালক-বালিকাদের বস্ত্র, ফল মিষ্টি প্রদান করা হয়। তাছাড়া আশ্রমের পক্ষ থেকে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে দরিদ্রনারায়ণ ভোজনে শতাধিক ব্যক্তিদের ভোজন, চাদর এবং ১০/- টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হয়।

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "অন্নদানই শ্রেষ্ঠদান। কারণ অন্নদানে মানুষকে তৃপ্ত করা যায়।" স্বামীজীর কীর্ত্তনের পর কার্য্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

স্বামীজী প্রথমেই হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং সমস্ত রোগীদের আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

৪. নৈমিষারণ্য—

পুণ্যভূমি নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে পুরাণ মন্দিরে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীমদ্‌বাল্মীকি রামায়ণ কথা মহোৎসব আয়োজিত হয়। আয়োজক ছিলেন সাণ্ডিলাবাসী শ্রী জয়নারায়ণ গুপ্ত ও শ্রীগঙ্গাসরণ গুপ্ত। বক্তা ছিলেন অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণী আচার্য্য কৃপাশঙ্করজী মহারাজ।

৫. তারাপীঠ—

তারাপীঠে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পুণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিবৎসরের ন্যায় ষোড়শোপচারে মাতৃ পূজা ও বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভজন, কীর্ত্তন, পাঠ, সৎসঙ্গ, হোম, ভোগরাগাদি ও স্থানীয় মন্দিরে পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৬. বৃন্দাবন—

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমে ৭ই মার্চ মহাশিবরাত্রি ও ১৯শে মার্চ হতে ২৫শে মার্চ দোল মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মহাশিবরাত্রির দিনে শ্রী সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের রুদ্রাভিষেক এবং চতু:প্রহর যথারীতি শিবরাত্রির পূজা হয়।

দোলোৎসব উপলক্ষ্যে ১৯শে মার্চ হতে ২৩শে মার্চ পর্য্যন্ত আশ্রমে রাসলীলা সম্পন্ন হয়। ২৩শে মার্চ রাত্রি ৯টায় নাম যজ্ঞ অধিবাস ও সারারাত্রি অখণ্ড নাম কীর্ত্তন হয়। ২৪শে মার্চ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি পূজা, শ্রীকৃষ্ণছলিয়া এবং শিবের ষোড়শোপচারে পূজা হয়।

সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের পরিসমাপ্তি হয়। ২৫শে মার্চ সাধুসেবা ছিল।

৭. পুরী —

পুরীধামে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতটে অবস্থিত শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রম ভারতের অতি প্রাচীণ আশ্রমদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রী মায়ের একান্ত বিশ্রামের জন্য পুরী আশ্রম এক সময়ে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করত। ১৯৭৯ সনের এক মাস ব্যাপী অবস্থানই শ্রীশ্রী মায়ের এখানে শেষ পদার্পণ।

ঘটনাচক্রে ইতিমধ্যে বেশ কিছু সময় পুরী আশ্রম প্রায় বন্ধই ছিল। দীর্ঘদিন পরে কলকাতাবাসী ভক্ত শ্রী অনিল দেওয়ানজীর বিশেষ প্রচেষ্টায় গত ১৫ই এবং ১৬ই মার্চ ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে আশ্রমটি পুনরায় উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে। কলিকাতা ও বর্দ্ধমান হতে প্রায় ৪০/৪৫ জন ভক্ত এই উপলক্ষ্যে এসে সম্মিলিত হন।

১৫ই মার্চ আশ্রমে সান্ধ্য ভজনকীর্ত্তন ও সৎসঙ্গ দিয়ে উৎসব প্রারম্ভ হয়। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দিরে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। তারপর ভক্তেরা জগন্নাথ দেব, মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রী মায়ের ছবি সহ শোভাযাত্রা করে আশ্রমে এসে প্রবেশ করে। ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা, হোম, সাধু ভাণ্ডারা আদি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধুরা এসে সবরকমে সহযোগিতা করে উৎসবকে পূর্ণাঙ্গীণ রূপে সফল করে তোলেন।

এই উপলক্ষ্যে আশ্রমটিরও সম্পূর্ণরূপে মেরামত ইত্যাদির দায়ীত্ব শ্রী অনিল দেওয়ানজী গ্রহণ করে এক বিশেষ সেবার কাজ পূর্ণ করেন।
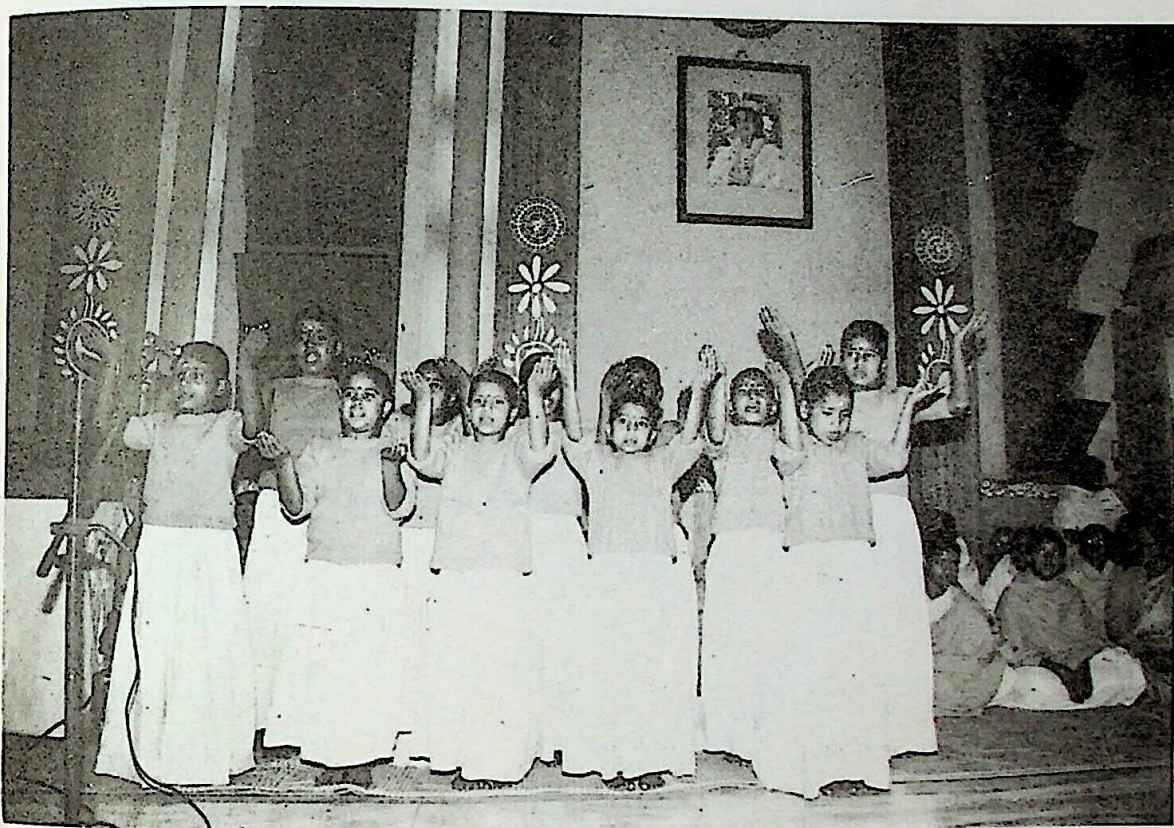
A scene from the annual function of the Ma Anandamayee Kanyapeeth
Varanasi on March 3, 1997

Another scene from the Kanyapeeth function. Dr. Vibhuti Narain Singh, Maharaja Benares. addressing the girls with Swami Chidanandaji sitting on the dais.

শোক-সংবাদ

১. শ্রী সুবোধ কুমার বসু—

আমরা অতি দু:খের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ শ্রীশ্রী মায়ের অতিপুরাতন ভক্ত শ্রী প্রাণকুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী সুবোধ কুমার বসু (বুনিদির ছোট মামা) মাতৃভক্তদের অতিপ্রিয় মিনুদা স্বজ্ঞানে পরলোক গমন করেছেন।

২. শ্রীমতী বেলা দাশগুপ্তা—

শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত মহীশূর উচ্চ ন্যায়ালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ৺সুবোধ রঞ্জন দাশগুপ্তর (কোহিনূরদা) স্ত্রী-শ্রীমতী বেলা দাশগুপ্ত গত ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৯৭ পূর্ণজ্ঞানে শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে স্থান লাভ করেছেন। ১৯৪৬ সালে শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন লাভের পর থেকেই বেলাদি শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন। অত্যন্ত মৃদুভাষী, প্রচারবিমুখ, মাতৃগতপ্রাণা বেলাদি শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তবৃন্দের অতি প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মার ঊর্দ্ধগতি কামনা করি। আমরা মায়ের চরণে পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

৩. শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সেনগুপ্তা—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সেনগুপ্তা, আশ্রমবাসিনী স্বর্ণদি মায়ের চরণে চির শান্তি লাভ করেন।

স্বর্ণদি চট্টগ্রামের এক অতি প্রাচীণ বনেদী বংশের অন্তর্ভুক্তা ছিলেন। প্রায় ২৫ বছরের উপর কাশী, কনখল প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রমে সেবার কাজের সঙ্গে স্বর্ণদি সৎসঙ্গ, সাধন, ভজন নিয়ে থাকতেন।

আমরা মায়ের চরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

৪. শ্রীমতী সুষমা দেবী—

গত ৮ই মার্চ, ১৯৯৭ দিল্লীবাসী মাতৃভক্ত ডা: দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মা শ্রীমতী সুষমা দেবী সজ্ঞানে শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে বিলীন হয়েছেন।

আমরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, Maharashtra.

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P.

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 310054+311794)

23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, U.P.

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL. 1 JULY, 1997 No. 3

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P.
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, Gujarat
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009
U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road,
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P.
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel:426575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P.
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী—–অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ—১ জুলাই, ১৯৯৭ সংখ্যা—৩

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারতে—৬০/- টাকা
বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা
প্রতি সংখ্যা —২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

★ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভা বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে । পত্রিকা বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয় ।

★ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমুল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিক মুখ্য উদ্দেশ্য । অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক ব দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে । নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয় লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে ।

★ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক ।

★ বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্নলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম :
Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c

★ পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে-

Managing Editor,
Ma Anandamayee—Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221001

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম :-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা--২০০০/- বাৎসরিক ।
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা -- ১০০০ বাৎসরিক ।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী-১০ হইতে মুদ্রিত । সম্পাদক-শ্রী পানু ব্রহ্মচারী ।

সূচী পত্র

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়
শিবালা, বারাণসী-২২১০০১

একটি বিশেষ আবেদন

পবিত্র বারাণসী ধামে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার সন্নিকটে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় প্রতিষ্ঠিত মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মনির্বিশেষে গরীব দু:খীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা। শ্রীশ্রী মায়ের অমর বাণী — "কাশী বিশ্বনাথ মুক্তিক্ষেত্র — জনজনার্দ্দন সেবা।"

সেবার কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে —

(১) অসহায় দু:স্থ রোগীদের সর্ব্বপ্রকার নি:শুল্ক চিকিৎসা হেতু একটি স্থায়ী কোষ স্থাপন। **(Medical Relief Fund for the poor)**

(২) রোগীদের আবাসের জন্য আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধাযুক্ত ১২টি অতিরিক্ত কক্ষ নির্ম্মাণ। আনুমানিক ব্যয় ১৬ লক্ষ টাকা। যে কোনও সদাশয় ভক্ত তাঁহার প্রিয়জনের স্মৃতিতে একলক্ষ টাকা দিলে একটি কক্ষ স্থায়ী রূপে তাঁহার নামে উৎসর্গ করা হইবে।

চিকিৎসা সেবার জন্য প্রদত্ত দান আয়কর নিয়মানুসারে করমুক্ত হইবে ইহা বিশেষ উল্লেখনীয়।

উপরিউক্ত যে কোনও উদ্দেশ্যে প্রেরিত অর্থ সাদরে গৃহীত হইবে।

ব্যাঙ্কড্রাফট বা চেক **"Shree Shree Anandamayee Sangha — Mata Anandamayee Hospital A/c"** এই নামে হওয়া আবশ্যক। সংলগ্ন পত্রে স্পষ্ট ভাবে উদ্দেশ্য উল্লিখিত করিয়া রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

Secretary,
Mata Anandamayee Hospital
Shivala, Varanasi-221001

মাতৃ বাণী

সংকলক - চিত্রা ঘোষ

কর্ম ও ধর্ম জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই ধৈর্য্যই প্রধান অবলম্বন।

● ● ●

এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।।

● ● ●

আমি তো তুমিই, এক মাত্র তিনি আছেন বলিয়াই তো আমি তুমি। মাত্র একটি বার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করিয়া যে বলিতে পারিবে, "মাগো, তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলেনা;" তবে সত্য সত্যই মা নিজস্ব রূপে তাহাকে দেখা দিবেন। তাঁহার স্নেহময় অঙ্কে তাহাকে তুলিয়া লইবেন।

● ● ●

সর্ব ধর্মই একধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।

● ● ●

শব্দই জগতের আদি কারণ। নিত্য শব্দ বা সদ্‌বাণীর ক্রম বিকাশ বা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সৃষ্টিরও বিবর্ত্তন বা বিকাশ সমান ধারায় চলিয়াছে।

● ● ●

এক জীব হইতেই বহুজীব, এই হইল জীবধারা। এক ঈশ্বরই বিভক্ত হইয়া সব জীব রূপে। তাই বলিয়া থাকে, যত্র জীব তত্র শিব।

● ● ●

বাঃ, সর্ব্বদাই দেখা হচ্ছে। আবার দেখ, কে কাকে দেখবে? সবই যে তিনি। ভগবান ছাড়া যে আর কিছুই নেই। তোদের দেখলে কখনো কখনো তোদের জন্মজন্মান্তরের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

● ● ●

একটা কিছু আশ্রয় কর, তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা কর, তাহলে দেখতে পাবি বাঁশ-সংলগ্ন বালতিটি কুঁয়োয় ফেলে দিলে যেরূপ জলপূর্ণ হয়ে ওপরে অনায়াসে চলে আসে, তদ্রূপ তাঁর কৃপা অজস্র পেতে পারবি।

● ● ●

বেশ ভাল কথা, কেবল শিশুর মতো বিশ্বাসই চাই। অভ্যাসের দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে, শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হলে সরল প্রার্থনা আসে। প্রার্থনায় সত্যিকারের ভাব জাগলে কৃপা করে তিনি ফলস্বরূপে প্রকাশ পান।

● ● ●

আমি দেখি জগৎ ভরা একটি বাগান। জীবজন্তু উদ্ভিদাদি যতকিছু আছে সবই এই বাগানে নানা রকমে খেলছে- প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্টতা আছে, তাই দেখে আমার আনন্দ হয়। তোরা সবাই মিলে বাগানের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে দিয়েছিস্। আমি বাগানের এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাই। তাতে তোরা কেন এত আকুল হয়ে পড়িস্?

● ● ●

দেখ, কেমন অবিরাম কীর্ত্তন চলছে। ভক্তি ও সাধনার দ্বারা যদি মানুষ উন্নত হতে চায়, তবে এরূপ অখণ্ড ভাবে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন চাই। যাকে দিয়ে যে কাজ করান আবশ্যক, কর্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে তদ্রূপ কর্মে লিপ্ত থাকতেই হবে।

● ● ●

'আমাকে' সরাতে পারলে 'তোমাকে' পাওয়া যায়। সাধন ভজনের লক্ষই হচ্ছে অহঙ্কার চুরমার করে দেওয়া। যার যেমন শক্তি সপ্তাহে একদিন যদি নাও হয়, তবে অন্ততঃ মাসে বা ১৫ দিনে একদিন সংযমিত থাকতে চেষ্টা করা। খাওয়া-দাওয়া, বলা-চলা, ঘোরা-ফেরা এবং লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ সব কিছুতেই সংযম।

● ● ●

এই ছোট্ট মেয়েটারত উপদেশ লেকচার কিছুই আসেনা। যেমন তোমরা বাজাও তেমনিই শোন। ছোট্ট মেয়েটার আবদার যে তোমরা তাঁর নামের সঙ্গ সর্ব্বদা করতে চেষ্টা কর।

■

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

—শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে মার অবস্থান

২৮শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫/১১/৫১)

গীতাজয়ন্তী শেষ হইয়া গিয়াছে। গোপাল দাদা রওনা হইয়া যাওয়ার পরই শ্রী শ্রী মা শিশু কল্যাণের ছাগশালায় আসিয়া স্থান নিয়াছেন, এই ছাগশালাটি সংকটমোচনের নিকট করা হইয়াছে। এখানে শ্রী শ্রী মায়ের জন্য একটি গৃহও পাকা করা হইয়াছে; যাহাতে ছোট ছোট কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে। উহার সম্মুখে এবং পিছনের দিকে দুইটি বারান্দা, রান্নাঘর, বাথরুম প্রভৃতি সমস্তই ঐ গৃহের মধ্যে। ছাগশালাটি একটি লম্বা একচালা ঘর, এখানে কয়েকটি ছাগ আছে। শিশুদের কল্যাণের জন্য এই ছাগশালাটি স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে ছাগদুগ্ধ দান করাই ইহার উদ্দেশ্য। যে কটি ছাগ আছে উহাদের দুগ্ধ এখন ১০/১২ টি শিশুদের দেওয়া হইতেছে। শীঘ্রই আরও কিছু ছাগ ক্রয় করা হইবে। এই ছাগশালাতে প্রায় একশত ছাগ প্রতিপালন করা কর্ত্তৃপক্ষের সংকল্প।

আজ সন্ধ্যার পর যখন ঐখানে গেলাম তখন ডা:গোপাল দাশগুপ্ত, জাস্‌টিস্ এস. আর. দাশগুপ্ত, স্বামী শাশ্বতানন্দ প্রভৃতি প্রায় ১০/১৫ জন ভক্তকে ঐখানে দেখিতে পাইলাম। খুকুনীদিদি আমাকে ছাগশালা এবং মায়ের জন্য যে গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছে ঐ সকল দেখাইলেন। ডা: দাশগুপ্ত বলিলেন, "এখানে যে মায়ের একটি আশ্রম হইয়াছে ইহা বোধহয় আকস্মিক নয়। কারণ যে দিন এই জমি পাওয়া গেল সেদিন যখন মাকে এ কথা বলা হইল, উহা শুনিয়াই মা এই জমির বর্ণনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জমির চারিদিকে কি প্রাচীর আছে?" আমি যখন বলিলাম যে, "হাঁ, প্রাচীর আছে।" তখন মা বলিলেন, "উহা বোধ হয় অল্পদিন হয় করা হইয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে জ্যোতিষ (ভাইজী) এই দিকে একটি আশ্রম করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কারণ এই দিকটা নিরিবিলি", তাই দেখা যাইতেছে যে ভাইজীও এইদিকে আশ্রম করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই এখানে আশ্রম হইয়াছে"।

একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ডা: গোপাল দাশগুপ্তের চেষ্টাতেই গাছপালা এবং মায়ের জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জমিটিও ডা: গোপাল দাশগুপ্তের পরিচিত কোন ব্যক্তি দান করিয়াছেন। শিশুদিগকে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ করিবার পরিকল্পনাও শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের। তিনি এই শিশু কল্যাণকে "আনন্দময়ী করুণার" অনুপূরক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমি যখন স্ত্রীসহ এই নূতন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন মা বাহিরে বেড়াইতে ছিলেন। আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "এইমাত্র তোমার কথা খেয়াল হইয়া ছিল, ভাবিয়াছিলাম যে বাবা আসিলে গোপীবাবার সংবাদ পাওয়া যাইত।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম যে গোপীবাবু

এবং তাঁর নাতি ভালই আছেন।

তবে গোপীবাবু আহারের পর বুকের মধ্যে একটা অশ্বস্তি বোধ করেন, উহা বোধ হয় অম্বলের জন্য। মা বললেন, "হাঁ, শীতকালে অনেক সময় পেটে বায়ু জমে, উহাই কখনো কখনো বুকের উপর চাপ দেয়। যাহা সহজে হজম হয় তাহাই খাওয়া ভাল এবং উহা গরম গরম খাওয়া ভাল।"

স্থান-মাহাত্ম্য

বাহিরে কিছুক্ষণ পা'চারি করিয়া মা গৃহের ভিতর গিয়া বসিলেন।আমরাও সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাছে গিয়া বসিলাম। মা খাটের উপর বসিলেন, আমরা নীচে শতরঞ্চীর উপর বসিলাম। নানাকথা হইতে লাগিল। শাশ্বতানন্দ স্বামীজী পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের কথা বলিবার ঢং, বৈষ্ণবদের দীনতা প্রকাশ করিবার ভঙ্গী প্রভৃতি সম্বন্ধে হাস্যকর নানা গল্প করিতে লাগিলেন। উহা শুনিয়া সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন। মাও চট্টগ্রাম এবং বরিশালের কথা অনুকরণ করিয়া সকলকে হাসাইলেন। সন্ধ্যার পর হইতে প্রায় মৌন পর্য্যন্ত এই জাতীয় কথা হইতে লাগিল। মা শেষে হাসিয়া বলিলেন, "ছাগশালায় আসা গিয়েছে কিনা তাই স্থানের প্রভাব প্রকাশ হইতেছে। (সকলের হাস্য)।

মৌনের সময় আমরা যখন নীরবে বসিয়াছিলাম তখন সঙ্কট-মোচনের আরতির শব্দ আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিতে ছিল। একে তো এই আশ্রমটি জনবিরল স্থানে অবস্থিত, তাহাতে আবার আমরা সকলে মৌন ছিলাম বলিয়া ঐ স্থানের নির্জনতা যেন জমাটভাব ধারণ করিয়াছিল। এইজন্য আরতির ঘন্টাধ্বনি সকলের প্রাণেই ধ্যানের অনুকূল এক শব্দগাম্ভীর্য ঢালিয়া দিয়াছিল। মৌন ভঙ্গ হইলে মা বলিলেন, "এই সব শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনিগুলি খুব ভাল, কারণ যে কোন অবস্থায় ইহা কানে আসিলেই লোকের মনকে ভগবানের দিকে ফিরাইয়া দেয়। ঐ সকল শব্দ শুনিলেই মনে হয় যে এখানে ভগবানের পূজা হইতেছে। তাহা ছাড়া কোন কোন স্থানের আবার আলাদা আলাদা প্রভাব আছে, যেখানে গেলে লোকের মন আপনা হইতেই ভগবানের দিকে যায়। ইহাই হইল স্থানের কৃপা। অনেক সময় হয়ত এই প্রভাবটা অনুভব করা যায় না। কিন্তু উহা জানা না গেলেও উহা যে আমাদের উপর কৃপা করে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য তীর্থ স্থানের এত মাহাত্ম্য।"

শ্রী এস.আর. দাশগুপ্ত মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেমন সমুদ্র পর্ব্বত বা চাঁদিনী রাত ইত্যাদি মনের উপর কিরূপ ক্রিয়া করে ?"

মা— "প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা যাহা বলিলে উহা প্রকৃতির সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া উহা সাধারণতঃ লোকের মনকে ভোগের দিকেই লইয়া যায়। তবে কেহ যদি আধ্যাত্মিক পথে কিছুটা উন্নতি লাভ করিয়া থাকে তবে সে ঐগুলিকেও ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া উহাদিগকে ঐ পথের অনুকূল করিয়া লইতে পারে।"

ঐ সকল কথাবার্ত্তার পর মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। মা আহার করিয়া আসিলে আমরা মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

নন্দেশ্বর শিব এবং আনন্দকাশী

২৯ শে কার্ত্তিক, শুক্রবার (ইং ১৬.১১.৫১) আজও বেলা প্রায় ১০।৷টার সময় সঙ্কটমোচনে মায়ের কাছে গেলাম। ঐখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম যে শ্রীমান্ বিভু গান করিতেছে। তাহার গান শেষ হইলে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

গত গ্রীষ্মের সময় মা কিছুদিনের জন্য আনন্দকাশীতে ছিলেন। টিহিরীর মহারাজা নির্জ্জন বাসের জন্য হৃষীকেশ হইতে ১৫ মাইল উত্তরে বশিষ্ট আশ্রমের নিকট একটি গৃহ নির্ম্মান করিয়াছিলেন। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে ঐখানে মাটি খুড়িতে গিয়া একটি শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য বিগ্রহ দেখিতে পান। ইহা দেখিয়া তিনি ঐস্থান হইতে একটু দূরে গিয়া নিজ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। শিবলিঙ্গকে তিনি যে ভাবে দেখিয়াছিলেন সেই ভাবেই রাখিয়া দেন। তাহা ছাড়া ঐখানে নন্দেশ্বর শিব নামে আরও একটি ভগ্ন শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ এই যে, যে স্থানে ঐ শিবলিঙ্গ আছেন সেখানে পূর্ব্বে একটি গরু চড়িতে আসিয়া ঐ শিবলিঙ্গের উপর দাঁড়াইলে উহার স্তন হইতে স্বত:ই দুগ্ধ বিগলিত হইয়া ঐ শিবলিঙ্গের মস্তকে পড়িত। এদিকে ঐ গরুর মালিক কি কারণে গরু হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাওয়া যায় না উহা খোঁজ করিতে করিতে যখন এই ব্যাপার দেখিতে পাইল তখন সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া এক কুঠার দ্বারা ঐ শিবলিঙ্গের মস্তকে এক ঘা বসাইয়া দিল যাহার ফলে শিবলিঙ্গের উপরিভাগটি ভাঙ্গিয়া ছিট্‌কাইয়া গিয়া গঙ্গার পারে পড়িল। যে স্থানে উহা পড়িয়া ছিল সেইখানে পরে মন্দির করিয়া উহাকে স্থাপন করা হয় এবং উহাই এখন নন্দেশ্বর শিব নামে প্রসিদ্ধ। শুনা যায় যে লোকটি ঐভাবে শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া ছিল সে নাকি পরে কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হইয়া মারা যায়।

যাহা হউক, টিহিরীর মহারাজা ঐখানে নির্জ্জন বাসের জন্য ছোট একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উহার চারি দিকে ফল ফুলের বাগান। সম্মুখে কলুষনাশিনী গঙ্গা পর্ব্বত-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তুর্য্য নিনাদে দিক্ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছেন। স্থানটি একান্ত ও অতি মনোরম। গঙ্গা এইখানে উত্তরবাহিনী এবং দুই দিক হইতে অপর দুইটি নদীও গঙ্গার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রে নাকি আছে যে যে স্থানে গঙ্গা উত্তর বাহিনী হন এবং উহার ১০ মাইলের মধ্যে যদি দুই দিক হইতে দুইটি নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হয় তবে সেই স্থান কাশী ক্ষেত্র তুল্য হয়। এই জন্য সোলনের রাজা সাহেব এবং টিহিরীর রাজমাতা এই স্থানের নাম রাখিয়াছেন "আনন্দ কাশী"। টিহিরীর মহারাজার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী (বর্ত্তমান রাজমাতা) এইখানে শ্রীশ্রী মাকে আনিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। মা গৃহস্থদের বাড়ীতে থাকেন না দেখিয়া এখানে মায়ের জন্য সুন্দর একটি কুটীয়া নির্ম্মাণ করিয়া রাজমাতা মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে গত গ্রীষ্মের সময় মা ১৫ দিনের জন্য ঐখানে গিয়াছিলেন। আজ

সকাল বেলা এই সকল কথাই হইতেছিল। ঐখানে টিহিরীর মহারাজা বাড়ী করিতে গিয়া ভূগর্ভে যে শিবলিঙ্গ দেখিয়াছিলেন সে কথাও উঠিল। মা বলিলেন, "গতবৎসর বাসন্তী-পূজার নবমীর দিন ঐ শিবলিঙ্গকে মাটি হইতে তুলিয়া আনিয়া ভাঙ্গা নন্দেশ্বর শিবের নিকট বসাইয়া পূজা করা হয়। শিবলিঙ্গকে এমনভাবে বসান হইয়াছে যাহাতে ঐ শিবের মাথায় জল দিলে উহা গিয়া নন্দেশ্বর শিবের গায়েও কিছুটা পড়িবে। এই শিবের নাম রাখা হইয়াছে, "আনন্দেশ্বর শিব।"

(ক্রমশ:)

শ্রদ্ধার্ঘ্য

—শ্রী শিশির মুখোপাধ্যায়

আনন্দময়ী আনন্দধারা বহায়েছ ধরাতলে
তোমার মননে জড়সত্তা আত্মসম্বিত লভে,
সত্যসাধনে প্রজ্বলিত তোমার যজ্ঞানলে
প্রেমাহুতি দানে ধর্ম্মার্থীর শ্রেয়োলাভ হয় ভবে।
তোমার পুন্য উদয়ে ধন্য হয়েছে সাধনক্ষেত্র
তোমার মধ্যে মূর্ত্ত হয়েছে মাতৃশক্তির লীলা,
তোমার মন্ত্র জপানুশীলনে হয়ে নিমীলিত নেত্র
অনুভূত হয় কৃপাদানে তুমি আজও ক্রিয়াশিলা।
তোমার কথিত সাধন ধারায় আত্ম নিয়োজনে
ত্রিতাপদগ্ধ মুমুক্ষু লভে ভগবদ্ অনুভূতি,
তোমার ধ্বনিত মহাবচনের অবিনাশী স্পন্দনে
চিদাকাশেতে ভাস্বর হয় অনির্বচনীয় দ্যুতি।
আনন্দময়ী নামে উদ্বেল আজি এই ধরাধাম
ভক্তচিত্ত আছে মত্ত চিদামৃত আস্বাদনে,
তোমার চরণে নিবেদন করে অনন্ত কোটি প্রণাম
ভুবন রয়েছে মগন তোমারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণে।

মা আনন্দময়ীর অমৃত আহ্বান

"হরিকথাই কথা"

(দ্বিতীয় পর্ব)

— ডা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

মার সাধনাকে এক হিসেবে বলা যায় খেলা। এক অদ্ভুত পারমার্থিক খেলা। এর ধারা থাকে বাধাবন্ধহীন, অব্যাহত। প্রথমে একটি শির শির ভাবের অনুভূতি। নাকের দুই শিরার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তা উপর দিকে যেত। তারপর দুই ভুরুর মাঝখানে কপালের সামান্য একটু জায়গা জুড়ে স্থির কিছুক্ষণ। শেষ অবধি তা তালুর দিকে গিয়ে বিচিত্র এক ভাবের সঞ্চারক। দেখা যেত, মা নিজ হাতে সংসারের কোনো কাজকর্ম করতে পারছেন না। শরীরকে কে যেন ভিতর থেকে টেনে রাখছে। এ সম্পর্কে মা'র বাণী, "ভিতরের গতি ও ভাবের প্রবলতায় বাহিরের কর্মভাবগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়। বাইরে সব ভাব একেবারে শিথিলের দিক্, একেবারে চলিয়া যাওয়ার দিক না হইলে অন্তর্জগতের দরজা পূর্ণভাবে খোলে না।"

দরজা খুলে গেলে "অচল অটল স্থির স্থিতি"। বাজিতপুরে কত সময় মা স্থিরভাবে অপেক্ষা করে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। যেন দরজা খুলে রাখা-'কোন সময় কোন ভাবের কোন ক্রিয়ারূপটির প্রকাশ হয়।' কখনও আবার দেখা যেত, 'নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বিশেষ আর নানারূপ প্রকাশ নাই, স্বাভাবিক কি এক স্থিতি, অচল অটল দীর্ঘ সময়।'

মনের দরজা খোলা, কিন্তু ঘরের বন্ধ। শোনা যায়, বাজিতপুরে যখন মা'র মন্ত্রস্ফুরণের খেলা হয়ে গেল, তখন থেকে তিনি দিনের পর দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে আসন ক্রিয়া-কর্মাদিতে থাকতেন।

ভোলানাথ বাজিতপুরে মা'র ভাবাদি ঠিক বোঝেন না। প্রশ্ন করেন এক এক সময়, "তোমার দীক্ষা হয় নাই, অথচ এই সব কি হয়?" এ সম্পর্কে অনেক পরে মা একবার বলেন, "দীক্ষার প্রয়োজন হইলে সময়মতো হইয়াই যায়। ভগবৎ চিন্তাতে থাকার চেষ্টা। যা প্রয়োজন তিনি সময় মতো করেন, এই বিশ্বাস রাখা।" ওদিকে মায়ের খেয়ালে দীক্ষার দিনক্ষণ এগিয়ে আসে। দ্রুত। বাইরের উপকরণ কিছু নেই। নিজেই নিজের গুরু, মন্ত্র এবং ইষ্ট। দীক্ষারূপে স্বয়ং ভগবানেরই প্রকাশ। নিজের কাছে নিজে। ১৯২২ এর ঝুলন পূর্ণিমার আগের দিন ক্রিয়াদির প্রকাশ খুব সামান্যই। পরের দিন প্রকাশ বিশেষরূপে। রাত্রে মন্ত্রস্ফুরণের ক্রিয়াদি।

নিজেকে নিয়েই নিজের লীলা। "নিজেতেই নিজে।" পূজা ও যজ্ঞাদির অদ্ভুত প্রকাশও সে রাত্রেই প্রথম। অবশ্য মন্ত্রস্ফুরণ হয় মধ্য রাত্রে। সব মিলিয়ে মা'র দীক্ষার খেলায় "দিব্যভাব, দিব্যপ্রকাশ।"

"খেলা" শুরু হবার পর থেকে সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি ক্রিয়াদি একটানা প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস নিয়মিত ধরে চলে। সে সময় চব্বিশ ঘন্টা মা এক অদ্ভুত নেশায় ভরপুর। কত কি দেখেন! কখনও অপূর্ব সুন্দর এক বালক, 'কালাচোরা মনোহরা', উলঙ্গ। কখনও বা সিংহবাহিনী-তৎই স্বয়ং বসা। কখনও আবার দেব দেবীরা মাতৃ সান্নিধ্যে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, হর-গৌরী, সীতা-রাম ইত্যাদি যুগল মূর্ত্তি মা'র দুপাশে। এ ছাড়া আরও কত জীবন্ত দেবী মূর্ত্তি। কখনও বা সুন্দর কোন মন্দিরে, আবার কখনও বা কোন অট্টালিকায়। ওখানকার আকাশ-বাতাস তেজোময়। দেব দেবীরা গড়া অপরূপ জ্যোতি-সৌন্দর্য্যে। অবর্ণনীয় অনিবর্চনীয় সেই সৌন্দর্য। সাধনার খেলার শেষ দিকে আপনা আপনিই মা'র কথা বন্ধ হয়। ক্রিয়া, কর্ম, কর্ত্তা- এই তিন অভেদ রূপে প্রকাশ পায় তখন। মা তখন শান্ত গম্ভীর মৌন থাকতেন। নিজের খেয়ালে। কণ্ঠে জপ-প্রতি নি:শ্বাস-প্রশ্বাসে। এ-সম্পর্কে মা'র বাণী, বাস্তবিক যদি একবার স্বাভাবিক জপ আরম্ভ হয় তাহা হইলে আর অন্য কিছু বলিবার-পড়িবার বা শুনিবার-দেখিবার অবসর থাকে না।"

মৌন অবস্থায় নানান্ লীলা মা'র। বসে আছেন, হঠাৎ দেখছেন, শরীরটা উঠে যাচ্ছে, কোথায় যাবে, কি করবে, কিছুই ঠিক নেই। ওদিকে হাত ঠিক জায়গায় পরে ঠিক কাজটি করছে। মৌন থাকার সময় কখনও বা খেয়ালে আসে মা'র মন আবার কোথায়? মনটা কি? ভগবান থেকে আলাদা কিছু মানা, এই হল মন।

ঢাকায় শাহবাগে এসেও প্রায় দেড় বছর মা মৌন থাকেন। ১৩৩২ সালের ৩০ শে পৌষ (জানুয়ারী, ১৯২৬) সূর্য্য গ্রহণ উপলক্ষে শাহবাগে কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ-সক্রান্তির দিনে ওই কীর্ত্তন শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মা'র চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সারা দেহ আন্দোলিত হতে থাকে কীর্ত্তনের সুর ও ছন্দে তালে তালে। কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ান। এ সম্পর্কে গুরুপ্রিয়া দেবী "দিদি" লিখেছেন, হঠাৎ দেখি সমস্ত শরীর দুলিতে লাগিল, মাথার কাপড় পড়িয়া গেল। চোখ বুজিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীর যেন কীর্ত্তনের তালে তালে নামের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। এইভাবে দুলিতে দুলিতেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন! যেমন ঘূর্ণি বায়ুতে কাগজ কি পাতা উড়াইয়া নেয়, অমনিভাবে শরীর দ্রুতভাবে ঘুরিতে লাগিল। আমরা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে বেগ সামলানো অসম্ভব।

মা'র ভাবাবস্থা জনসাধারণ দেখার সুযোগ পায় এই প্রথম।

শাহবাগে থাকার সময় প্রতিদিনই কীর্ত্তনে মা'র ভাব হত। কোনোদিন হয়তো খুব বেশী। মাঝে মাঝে স্তোত্রাদি বেরোয় তাঁর মুখ থেকে। কেউ তার অর্থ বোঝে না। শাহবাগে আর একদিন (ফাল্গুন, ১৩৩২) কীর্ত্তনের সময় দেখা যায়, ভাবে বিভোর তিনি। শরীরে কত রকমের ক্রিয়া! কিছুক্ষণ উগ্রমূর্তিতে। ঊর্ধ্বদৃষ্টি তখন, জিভ বেরিয়ে আসা অবস্থায়, যেন কা'রও সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত। মুহূর্ত্তের মধ্যে জিভ আবার ভিতরে, অতি দ্রুত ভাবের পরিবর্তন। ঢল ঢল শান্ত মূর্ত্তিতে কখনও, আসন করে বসে; যেন পূজায়। নিজেতেই নিজে। আবার নিজের

পায়েই মাথা লুটিয়ে প্রণাম। অসার হয়ে পড়ছেন যেন। আবার কখনও দ্রুত ঘুরছেন, মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, স্থিরভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ছেন। নাভি থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শ্বাসের ঢেউ খেলছে যেন। কখনও আবার অসার, সারা শরীর পাথরের মতো ঠাণ্ডা। মৃতের অবস্থা। আঙ্গুলের সব নখগুলো কালো। মুখ ফ্যাকাশে। শ্বাসের লক্ষণ নেই আদৌ।

দেওঘরেও কীর্ত্তনের আসরে (১৩৩৩, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) ভাবস্থ মা। কখনও বা মহাতাপস বালানন্দ স্বামীর সামনে বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দাঁড়িয়ে নৃত্যরতা। স্বামীজী মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেন। হঠাৎ মা ঐ ভাব-অবস্থায় হাত দেন বালানন্দজীর মাথায়। তারপর তাঁর হাত ধরে করণীবাদ আশ্রমে ধ্যান মন্দিরে যান। বালানন্দ স্বামী মা'র সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, "মা তো সাধিকা নন; ইনি নিত্যসিদ্ধা। কোনও কর্মের উপলক্ষ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, আবার সেই কর্ম শেষ হলেই চলে যান। এঁদের কোনো প্রকার সাধন-ভজন করতে হয় না।"

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, মা-ও তো সাধনা করেছেন! জপ-তপ, পূজা-আহ্নিক সবই করেছেন! তা হলে এতো বড় সত্যদ্রষ্টা বালানন্দজীর যুক্তির সারবত্তা কোথায়?.... এক কথায় এর উত্তর হল, সারবত্তাই এ-যুক্তির প্রাণ। কারণ, একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, প্রথামাফিক সাধনা মা করেন নি। যা কিছু করেছেন, তার সবটাই লোকশিক্ষার খাতিরে; সাধারণকে বোঝাবার জন্যে যে, আত্মকৃপা লাভ করতে গেলে নিজেকে ভেতর থেকে প্রস্তুত করতে হয়। আর এ ছাড়া, হরিকথা যে দেব মানবের প্রাণ, অনুকূল পরিবেশে তাঁর ভাব ও শক্তির কিছুটা তো প্রকাশ হয়ে পড়বেই। স্মরণে রাখা দরকার, মা চেষ্টা করে কিছু লাভ করেন নি; সব কিছুই তাঁর পূর্ব থেকে লব্ধ। নরলীলায় তিনি যেন ভক্তদের হাতের পুতুল; তা'রা যেমন বাজায়, তেমনি বাজেন। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের উপস্থিতি তাঁকে যেন দিব্যোন্মাদ হতে সাহায্য করে। তাই দেখি, দেওঘরে শুক্ল-সন্ন্যাসী প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায় হঠাৎ একদিন ভাবস্থ তিনি। বসে থাকতে থাকতেই অদ্ভুত এক ভাবে আচ্ছন্ন। নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ তখন। আছে কি নেই, ঠিক বোঝা যায় না। সারা শরীর কালো। সেদিন সবাই মিলে নাম করলে মা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসেন। অর্থাৎ, নামই প্রাণ মা'র। মা'ই নামরূপে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী।

(ক্রমশ:)

■

মাতৃ চিন্তা

(কথিকা)

— ডক্টর শুকদেব সিংহ

নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	গৌরী নারায়ণী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	কল্মষনাশিনী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	মহাযোগিনী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	ভবতারিণী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	জগত্তারিণী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	সর্বদেবময়ী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	শিবামহেশ্বরী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	মহিষমর্দিনী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গতিনাশিনী	দুর্গে
নমো	দুর্গে	নমো	দুর্গে	নমো	নমো নমো নমো	দুর্গে

শরৎকালে হয়েছিল মহাশক্তি দেবী দুর্গার অকালবোধন, জড়ত্বময় শীতের প্রাক্কালে দেবদেবী থাকেন নিদ্রিত, আপাত-নিষ্ক্রিয়তার অবগুণ্ঠনে ঢাকা থাকে দিব্য-চেতনা। সেই দুঃখের দিনে, শিশির-সম্পাতে কীর্ণ রাত্রিতে শক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র সীতারূপ তাঁর হ্লাদিনী শক্তিকে উদ্ধারের জন্য। সেই মহাশক্তির অকালবোধন। দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে আন্তর সাধনাই হচ্ছে সুখকে লাভ করার উপায়। জগজ্জননী মা আনন্দময়ী বলেছেন — "জগতের ক্রিয়ায় সাময়িক আনন্দ আর ক্লেশদায়ক দুঃখ পিছনে ছায়ার মতন। নিজেকে পাওয়ার যাত্রী হওয়া। ভগবানের দিকে যত আগ্রসর ততই সমগ্র ক্লেশদায়ক ক্রিয়া শিথিলের দিক — তা মনে রাখা।" আমরা এই সত্যটি ঠিক বুঝতে পারি না। তাই শ্রেয়ের জায়গায় প্রেয়কে বসাই, ভগবৎ-আরাধনা ছেড়ে জাগতিক সুখ-সম্পত্তি খুঁজি। অন্তর কিন্তু অমাদের বলে —

আনন্দধামে রয়েছে যে এক
মাতৃ নিকেতন,
সে বাস ত্যজিয়ে ধূলামাটি দিয়ে
গড়িলি নিজ সদন।
মায়ের নিলয় সুখের আলয়
হইলি বিস্মরণ,
খুঁজি আনন্দ পাইলি দুঃখ
নিজবাসে অকারণ।
ধন যশ মান অনিত্য যা কিছু

তাহাতে আকর্ষণ,
পাইলি কত না মরম যাতনা
রহিয়া অচেতন।
নিত্য সত্যধামে মায়ের বসতি
চল সেথা এযে মন,
মায়ের নিবাসে অপার শান্তি
আনন্দ অনুখন।

(৫৬ সংখ্যক গীত, গীতি-অর্ঘ্য, ৺শিবপ্রসাদ ঘোষ)

ভগবানকে সব রকমে আশ্রয় করাই তো তাঁর সত্যকার পূজা। এ পূজার সুফল আছেই। মা আনন্দময়ী তাই বলেছেন—"ভগবানকে ডাকবে ও তার ফল হবে না, এ হতেই পারে না। তাঁর সন্তান তিনি ধুয়ে মুছে নেন তো। তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকা। যথাশক্তি সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে নিয়ে থাকার চেষ্টা।" (বাঙ্ময়ী মা, পৃ. ৯৯-১০০)

মায়ের এই অমৃতময় বাণীতে আমাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নেচে ওঠে ময়ূরের মতো, অমোঘ মন্ত্রে গায়—

মায়ের চরণ বিনে তিন ভুবনে
শান্তি কোথাও নেই,
আমরা মায়ের মা আমাদের
সার কথাটাই এই।
জন্মাবধি মায়ের কোলে
মায়ের কাছেই রই,
আমরা জানি আমরা মায়ের
সৃষ্টি ছাড়া নই।
মায়ের লীলার সঙ্গী মোরা
জানিনে মা বই,
যখন যেমন যেখানে রাখে
মাকেই ধরে রই।
মোদের গানের ভিতর দিয়ে
মায়ের কথাই কই,
মায়ের নামের মধুপানে
সবাই বিভোর হই।

(গীত ৮৭, গীতি-অর্ঘ্য)

এই মা অপ্রাকৃতরূপে মহামায়া আদ্যাশক্তি। তিনি অহংকার রূপ বলবান্ ও একাগ্রগতি

মহিষাসুরকে বধ করেন, আমাদের সর্বপ্রকার অজ্ঞানতার তামস দূর করে আমাদের নিত্যশুদ্ধ দেবচরণে নিবেদিত পুষ্পের মতো করে তোলেন। ভক্তহৃদয় তাই গায়—

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা,
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক পালিকা।
মহাকালী মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি বেদমাতা তুমি গায়ত্রী ষোড়শী কুমারী বালিকা।
কোটি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র, মা মহামায়া, তব মায়া,
সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয়, শরতের জলবিন্দু প্রায়।
অচিন্ত্য পরমাত্মা-রূপিণী, সুর-নর চরাচর প্রসবিনী।
নমস্তে শিবে অশুভনাশিনী তারা মঙ্গল দায়িকা।

এই মা নারায়ণী। নরের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় তাঁর শ্রীচরণে বিধৃত বলেই তিনি নরের পরম আশ্রয় নারায়ণী। নরকে সর্ববিধ আশ্রয় দিতেই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী নারায়ণী তিনি মা আনন্দময়ী। মা স্বয়ং বলেছেন—"তোমাদের কর্মের জন্য এ শরীর তোমরাই নিয়ে এসেছ।" (বাঙ্ময়ী মা পৃ. ১২৮)

অন্যত্র মার উক্তি—"আনন্দময়ী মা কে? আনন্দময়ই বা কে? তিনি ঘটে, পটে, সর্ব হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। সর্বত্রই তাঁর বাস। তাঁকে দেখলে, তাঁকে পেলে, সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় হওয়া।" (তদেব, পৃ. ১২৮-২৯)।

তাই দেবী দুর্গা সম্বন্ধে যেমন মহিম্ন স্তোত্র, মা আনন্দাময়ী সম্পর্কেও তেমনি ভক্ত-হৃদয়ের নিবেদন।

আনন্দময়ী তুমি মা জননী....... অপ্রাকৃত রূপে যিনি নারায়ণী দেবী দুর্গা, আর প্রাকৃত রূপে সাক্ষাৎ নারায়ণী মা আনন্দময়ী, তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা-অন্তে ভক্তহৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা—

দয়া কর মাগো দয়াময়ী
কৃপা কর মাগো কৃপাময়ী
আনন্দে ভরে দাও আনন্দময়ী।
যুগে যুগে এসো মাগো এই ধরণীতে
সন্তানে উদ্ধার মহাশোক হতে
তুমি যে গো মা প্রেমময়ী।
দিশাহারা হয়ে সবে ডাকে মা তোমারে,
তুমি বিনে কে তরিবে এই অভাগারে,
তুমি যে গো মা স্নেহময়ী।
তুমি মা মহেশ্বরী তুমি পরমেশ্বরী
তুমি মা সুরেশ্বরী তুমি ভুবনেশ্বরী
তুমি যে গো মা মহিমময়ী।

(গীত, ড. আনন্দময়ী সিংহ)

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ও স্বামী মুক্তানন্দ গিরি মহারাজ

—শ্রী অরুণ সেনগুপ্ত

'সদানন্দময়ী আনন্দভুবনে
আনন্দে বিশ্বে চলে জননী।
আনন্দনীরে আনন্দ উথলে
আনন্দে জগতে চলে।
আনন্দে গমন আনন্দে ভোজন
আনন্দে শয়নে দোলে জননী!
ভক্তগণ দলে দলে সঙ্গে সঙ্গে চলে
কেহ তোমায় চিনিতে না পারে,
তুমি না জানাইলে পরে কে তোমায় চিনিতে পারে
জাগাইয়ে লও জননী (মাগো)
সকলের নিবেদন সদাই কর নিরীক্ষণ
তোমায় যেন কভু না ভুলে জননী।"

এই সুললিত, ছন্দোময়, আনন্দময়, অসাধারণ গানটি যিনি লিখেছেন, তাঁর সব থেকে বড় পরিচয়—তিনি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের সার্থক জননী, যিনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন মোক্ষদাসুন্দরী দেবী—আর সন্ন্যাস নিয়ে হন স্বামী মুক্তানন্দ গিরি।

সেটা বাংলার ১২৮৪ সাল। বৈশাখ মাস। এই শুভ মাসে মোক্ষদাসুন্দরীর জন্ম। তাঁর আর এক নাম ছিল বিধুমুখী। তাঁর বাবা রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরা জেলার সুলতানপুর (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) গ্রামের এক অতি নিষ্ঠাবান অভিজাত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাড়ীতে এক বিখ্যাত প্রাচীন টোল প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাড়ীতে ছিল শিক্ষার অনবদ্য পরিবেশ। বাড়ীতে খুব ঘটা করে দুর্গাপূজা হত। ভট্টাচার্য্য বাড়ীর দুর্গাপূজায় অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানান হত, আপ্যায়ন করা হত।

রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন জ্ঞানতাপস। তিনি ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর স্ত্রী হরসুন্দরীর দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। রমাকান্ত আর হরসুন্দরীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর মা মোক্ষদা সুন্দরী।

মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর সমগ্র জীবন তিন পর্বে ভাগ করা যায়। জীবনের প্রথম বারো বছর পিত্রালয়ে কাটে। এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর গার্হস্থ জীবন। বাকী প্রায় তিরিশ বছর থেকে বত্রিশ বছর সন্ন্যাস আশ্রম।

মোক্ষদাসুন্দরীর জীবনের প্রথম ভাগ শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে কেটে ছিল। আর তাঁর মহৎ গুণ তিনি ছোট বড় সকলকে স্নেহ করতেন। মোক্ষদাসুন্দরী স্কুলে পড়েন নি, উচ্চশিক্ষার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু তিনি মন দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত ভালভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। এরফলে তিনি বেশ কয়েকটি ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। তাঁর গানগুলির ভাষা সহজ, সরল, সুমার্জ্জিত।

মোক্ষদাসুন্দরীর জীবনের ভোর বেলায় মা ও বাবা দুজনকেই তিনি হারিয়ে ছিলেন। তাঁর মা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি মাকে প্রশ্ন করেছিলেন 'মা! তুমি মরে গেলে আমি কোথায় থাকবো?' মা অন্তিম মুহূর্ত্তে জ্যেঠা পুত্রবধূর হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন, 'তুমি একে দেখো, একে তোমার হাতে সঁপে দিলাম।' স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া কোলে স্থান পেয়েছিলেন মোক্ষদাসুন্দরী।

বাংলা ১২৯৬ সালের প্রথম দিকে ত্রিপুরা জেলার বিদ্যাকূট গ্রামের (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) বিখ্যাত পরিবারের সন্তান বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে মোক্ষদাসুন্দরীর বিয়ে হয়। মোক্ষদাসুন্দরী এলেন এক নতুন পরিবেশে। কিন্তু যে মানুষটির সঙ্গে তাঁর নতুন জীবন সুরু হল তিনি সংসারের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন আপনাভোলা। বিয়ের আগেই বিপিনবিহারী একবার বাড়ী থেকে চলে যান। তাঁকে বুঝিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

বিপিনবিহারী ভগবানের নাম গান করে কাটাতেন। অর্থ উপার্জনের দিকে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না। এর ফলে যে মোক্ষদাসুন্দরী প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁকে কঠিন ও চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। বিয়ের প্রায় চার বছর পরে মোক্ষদাসুন্দরীর মেয়ে হয়। কিন্তু জন্মের কয়েক মাস পরেই মেয়েটি মারা যায়।

সেটা বাংলা ১৩০৩ সাল। সেদিনের তারিখ উনিশে বৈশাখ। খেওড়া গ্রামে মোক্ষদাসুন্দরীর এক মেয়ে হল। মেয়ের নাম রাখা হল নির্মলাসুন্দরী। নির্মলাসুন্দরীই হন পরবর্ত্তী জীবনে বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

আনন্দময়ী মায়ের জন্মের পর দশ বছরের মধ্যে মোক্ষদাসুন্দরীর আরো তিন পুত্রের জন্ম হয়—কালীপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন, হরিপ্রসন্ন। কিন্তু তিনটি ছেলেই মারা গেল। ভগবান পাঁচটি সন্তান দান করে চারটিকে কেড়ে নিলেন। এরপর মোক্ষদাসুন্দরীর গর্ভে আরো দুটি মেয়ে ও একটি ছেলের জন্ম হয়। দুটি মেয়েই মারা যায়।

মোক্ষদাসুন্দরীর সদা-হাস্যময় মুখ দেখে কেউ বুঝতে পারতেন না তাঁর জীবনে এত কঠিন আঘাত এসেছিল। মোক্ষদাসুন্দরী মনে করতেন, নির্মলাসুন্দরী বয়সের অনুপাতে বুদ্ধিতে কম, তাই তিনি মেয়ের নাম দিয়েছিলেন, টেলি, বেদিশা।

নির্মলাসুন্দরীর বয়স বারো বছর হল। সেকালের প্রথা অনুসারে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হল। মেয়ের বিয়ে দিতে জমি বিক্রী করতে হয়। অনেক দিন পরে আনন্দময়ী মা একদিন বলেন, এমন যে ধার্মিক পরিবার তাদেরও জমি বিক্রী করে মেয়ের (অর্থাৎ শ্রীশ্রী মায়ের)

বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয়।

বাংলা ১৩১৫ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামের রমণী মোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে নির্মলাসুন্দরীর বিয়ে হয়। রমণীমোহনই পরবর্ত্তী জীবনে বাবা ভোলানাথ নামে পরিচিত হন।

মোক্ষদাসুন্দরী সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। তিনি নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা, জল তোলা, রান্না করা ছাড়া ধান থেকে চিড়ে তৈরী করতেন, মুড়ি ভাজতেন, বেতের ঝুড়ি, চালুনি তৈরী করতেন। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণা। বাড়ীতে অতিথি এলে তিনি খুব আদর যত্ন করতেন। গৃহদেবতা রাজ-রাজেশ্বর নারায়ণ শিলার পূজার ব্যবস্থা নিত্য করতেন। একদিন নারায়ণ বালকের বেশে মোক্ষদাসুন্দরীর সামনে এসে বলেছিলেন, "হরির লুট দিও।" সেই বিগ্রহ বর্তমানে কাশীধামে মা আনন্দময়ী আশ্রমে বিরাজ করছেন।

ঢাকায় থাকাকালে বাংলা ১৩৩৩ সালে বিপিনবিহারী আর মোক্ষদাসুন্দরী আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে কালীঘাট, কাশী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করেছিলেন। ১৩৪২ সালে বিপিনবিহারী আর মোক্ষদাসুন্দরী কলকাতায় চলে আসেন। পরের বছর ১৩৪৩ সালে বিপিনবিহারী ৭১ বছর বয়সে কলকাতায় মারা যান।

বিপিনবিহারী মারা যাবার পর আনন্দময়ী মা বাবাকে সূক্ষ্মে দেখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা বলেছেন, বৈরাগ্যের মূর্ত্তি যেন, শুভ্র ঘন জ্যোতিতে গড়া উজ্জ্বল মূর্তি।

১৩৪৫ সালে মোক্ষদাসুন্দরী আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে কনখলে যান এবং নির্বাণী আখাড়ায় উত্তরাখণ্ডের শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মঙ্গলানন্দ গিরিজীকে দর্শন করেন। এই বছরের মহা বিষুব সংক্রান্তি তিথির শুভলগ্নে মঙ্গলানন্দ গিরিজী মোক্ষদাসুন্দরীকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দেন। মোক্ষদাসুন্দরীর সন্ন্যাস নাম হল মুক্তানন্দ গিরি। পরে মুক্তানন্দ গিরি মহারাজও বহু লোককে দীক্ষা দেন।

শান্ত, শিষ্ট, ধীর, স্থির, সদাহাস্যময়ী, দীনবন্ধু মুক্তানন্দ গিরিজী ১৩৭৭ সালের ২২ শে শ্রাবণ হরিদ্বারে গঙ্গাতটে অবস্থিত জয়পুরিয়া ভবনে অমৃতলোকে চলে গেলেন। কনখল আশ্রমের উদ্যানে সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুসারে তাঁর দেহ পাথরের পেটিকার মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়। আনন্দময়ী মায়ের নির্দেশে কনখল আশ্রমে ১৩৮০ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে আর ১৩৮১ সালের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বারাণসী আশ্রমে মুক্তানন্দ গিরিজীর মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে দিল্লী, রাঁচী ও আগরপাড়া আশ্রমেও তাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

■

মোক্ষদাসুন্দরীর জীবনের প্রথম ভাগ শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে কেটে ছিল। আর তাঁর মহৎ গুণ তিনি ছোট বড় সকলকে স্নেহ করতেন। মোক্ষদাসুন্দরী স্কুলে পড়েন নি, উচ্চশিক্ষার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু তিনি মন দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত ভালভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। এরফলে তিনি বেশ কয়েকটি ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। তাঁর গানগুলির ভাষা সহজ, সরল, সুমার্জ্জিত।

মোক্ষদাসুন্দরীর জীবনের ভোর বেলায় মা ও বাবা দুজনকেই তিনি হারিয়ে ছিলেন। তাঁর মা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি মাকে প্রশ্ন করেছিলেন 'মা! তুমি মরে গেলে আমি কোথায় থাকবো?' মা অন্তিম মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন, 'তুমি একে দেখো, একে তোমার হাতে সঁপে দিলাম।' স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া কোলে স্থান পেয়েছিলেন মোক্ষদাসুন্দরী।

বাংলা ১২৯৬ সালের প্রথম দিকে ত্রিপুরা জেলার বিদ্যাকূট গ্রামের (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) বিখ্যাত পরিবারের সন্তান বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে মোক্ষদাসুন্দরীর বিয়ে হয়। মোক্ষদাসুন্দরী এলেন এক নতুন পরিবেশে। কিন্তু যে মানুষটির সঙ্গে তাঁর নতুন জীবন সুরু হল তিনি সংসারের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন আপনাভোলা। বিয়ের আগেই বিপিনবিহারী একবার বাড়ী থেকে চলে যান। তাঁকে বুঝিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

বিপিনবিহারী ভগবানের নাম গান করে কাটাতেন। অর্থ উপার্জনের দিকে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না। এর ফলে যে মোক্ষদাসুন্দরী প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁকে কঠিন ও চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। বিয়ের প্রায় চার বছর পরে মোক্ষদাসুন্দরীর মেয়ে হয়। কিন্তু জন্মের কয়েক মাস পরেই মেয়েটি মারা যায়।

সেটা বাংলা ১৩০৩ সাল। সেদিনের তারিখ উনিশে বৈশাখ। খেওড়া গ্রামে মোক্ষদাসুন্দরীর এক মেয়ে হল। মেয়ের নাম রাখা হল নির্মলাসুন্দরী। নির্মলাসুন্দরীই হন পরবর্ত্তী জীবনে বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

আনন্দময়ী মায়ের জন্মের পর দশ বছরের মধ্যে মোক্ষদাসুন্দরীর আরো তিন পুত্রের জন্ম হয়—কালীপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন, হরিপ্রসন্ন। কিন্তু তিনটি ছেলেই মারা গেল। ভগবান পাঁচটি সন্তান দান করে চারটিকে কেড়ে নিলেন। এরপর মোক্ষদাসুন্দরীর গর্ভে আরো দুটি মেয়ে ও একটি ছেলের জন্ম হয়। দুটি মেয়েই মারা যায়।

মোক্ষদাসুন্দরীর সদা-হাস্যময় মুখ দেখে কেউ বুঝতে পারতেন না তাঁর জীবনে এত কঠিন আঘাত এসেছিল। মোক্ষদাসুন্দরী মনে করতেন, নির্মলাসুন্দরী বয়সের অনুপাতে বুদ্ধিতে কম, তাই তিনি মেয়ের নাম দিয়েছিলেন, টেলি, বেদিশা।

নির্মলাসুন্দরীর বয়স বারো বছর হল। সেকালের প্রথা অনুসারে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হল। মেয়ের বিয়ে দিতে জমি বিক্রী করতে হয়। অনেক দিন পরে আনন্দময়ী মা একদিন বলেন, এমন যে ধার্মিক পরিবার তাদেরও জমি বিক্রী করে মেয়ের (অর্থাৎ শ্রীশ্রী মায়ের)

বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয়।

বাংলা ১৩১৫ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামের রমণী মোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে নির্মলাসুন্দরীর বিয়ে হয়। রমণীমোহনই পরবর্ত্তী জীবনে বাবা ভোলানাথ নামে পরিচিত হন।

মোক্ষদাসুন্দরী সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। তিনি নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা, জল তোলা, রান্না করা ছাড়া ধান থেকে চিড়ে তৈরী করতেন, মুড়ি ভাজতেন, বেতের ঝুড়ি, চালুনি তৈরী করতেন। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণা। বাড়ীতে অতিথি এলে তিনি খুব আদর যত্ন করতেন। গৃহদেবতা রাজ-রাজেশ্বর নারায়ণ শিলার পূজার ব্যবস্থা নিত্য করতেন। একদিন নারায়ণ বালকের বেশে মোক্ষদাসুন্দরীর সামনে এসে বলেছিলেন, "হরির লুট দিও।" সেই বিগ্রহ বর্তমানে কাশীধামে মা আনন্দময়ী আশ্রমে বিরাজ করছেন।

ঢাকায় থাকাকালে বাংলা ১৩৩৩ সালে বিপিনবিহারী আর মোক্ষদাসুন্দরী আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে কালীঘাট, কাশী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করেছিলেন। ১৩৪২ সালে বিপিনবিহারী আর মোক্ষদাসুন্দরী কলকাতায় চলে আসেন। পরের বছর ১৩৪৩ সালে বিপিনবিহারী ৭১ বছর বয়সে কলকাতায় মারা যান।

বিপিনবিহারী মারা যাবার পর আনন্দময়ী মা বাবাকে সূক্ষ্মে দেখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা বলেছেন, বৈরাগ্যের মূর্ত্তি যেন, শুভ্র ঘন জ্যোতিতে গড়া উজ্জ্বল মূর্তি।

১৩৪৫ সালে মোক্ষদাসুন্দরী আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে কনখলে যান এবং নির্বাণী আখাড়ায় উত্তরাখণ্ডের শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মঙ্গলানন্দ গিরিজীকে দর্শন করেন। এই বছরের মহা বিষুব সংক্রান্তি তিথির শুভলগ্নে মঙ্গলানন্দ গিরিজী মোক্ষদাসুন্দরীকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দেন। মোক্ষদাসুন্দরীর সন্ন্যাস নাম হল মুক্তানন্দ গিরি। পরে মুক্তানন্দ গিরি মহারাজও বহু লোককে দীক্ষা দেন।

শান্ত, শিষ্ট, ধীর, স্থির, সদাহাস্যময়ী, দীনবন্ধু মুক্তানন্দ গিরিজী ১৩৭৭ সালের ২২ শে শ্রাবণ হরিদ্বারে গঙ্গাতটে অবস্থিত জয়পুরিয়া ভবনে অমৃতলোকে চলে গেলেন। কনখল আশ্রমের উদ্যানে সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুসারে তাঁর দেহ পাথরের পেটিকার মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়। আনন্দময়ী মায়ের নির্দেশে কনখল আশ্রমে ১৩৮০ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে আর ১৩৮১ সালের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বারাণসী আশ্রমে মুক্তানন্দ গিরিজীর মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে দিল্লী, রাঁচী ও আগরপাড়া আশ্রমেও তাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইষ্ট লাভ

—শ্রী শৈলেশ

জ্যোতিষ চন্দ্র রায়,
একদা ছিলেন আপন আলয়ে
একান্তে নিরালায়।
সন্ধ্যার ছায়া ঘনায় গগনে,
জ্বলি ওঠে দীপ ভবনে ভবনে,
বিহঙ্গকুল দিবা অবসানে
ফিরিছে নিজ কূলায়।

উদাস চিত্ত জ্যোতিষ বসিয়া
গভীর চিন্তা মগ্ন।
জীবনের দীপ প্রায় নিবু নিবু,
ইষ্টের দেখা মিলিল না তবু,
এ জীবনে আর আসিবে না কভু
পরম সে শুভ লগ্ন।

সেবিলাম কত সাধু সন্ন্যাসী
যোগী মহাজন কত না!
ধর্মের ধ্বজা সকলে উড়ায়,
আসল রত্ন মেলেনি কোথাও,
ধরা-মরু মাঝে মরিচিকা প্রায়
সবে করে শুধু ছলনা!

এসেছেন শুনি কে এক
যোগিনী
শাহবাগ প্রান্তরে।
কুলবধূ তিনি। তাঁর দরশন
লভিলে ধন্য মানে জনগন,
দিব্যমূরতি, আনন্দ ঘন
দুনয়নে সুধা ক্ষরে!

কী ভাবি সহসা আলোক দীপ্ত
হ'ল তাঁর দুনয়ন।
ভাবিল তাঁহারে দেখিব পরখি
ইষ্টেরে যদি তাঁহাতে নিরখি,
ভক্তি অর্ঘ্য শ্রীচরণে রাখি
সঁপিব তাঁহারে জীবন!

চলেছে জ্যোতিষ, দুলিছে চিত্ত
আশা-নিরাশার দোলে।
তখনো হয়নি নিশা অবসান,
বিহগ কণ্ঠে জাগে নাই গান,
বাজেনি ঘণ্টা বাজেনি বিষাণ
সুপ্ত দেবাঞ্চলে।

দাঁড়ায় জ্যোতিষ যোগিনীর দ্বারে,
দুয়ার তখনো রুদ্ধ।
অচিরে খুলিল রুদ্ধ সে দ্বার,
হেরিল জ্যোতিষ সম্মুখে তার
দুর্গা-প্রতিমা। দুনয়ন তার
অপরূপ রূপে মুগ্ধ!

আসিল ভাসিয়া কোথা দূর হ'তে
বাঁশীর মদির মন্দ্র!
বহিল বাতাস উতলা আকুল,
শাবাগ কাননে ফুটিল বকুল,
সুদূর গগনে হাসিয়া আকুল
চৈত্র-পূর্ণচন্দ্র।

পলকে মিলাল দুর্গা প্রতিমা
যোগিনী দাঁড়ায়ে দ্বারে!
শুধান হাসিয়া: শংকামোচন
চিত্তের মাঝে হ'ল কি এখন?
যদি আরো থাকে কর সমাপন
নি:শেষ কর তারে।

চকিতে ফুকারি উঠিল জ্যোতিষ,
ভাসিয়া অশ্রুধারে।
চীৎকারি' কহে, লভিয়াছি পথ
ভরিয়া গিয়াছে আমার জগৎ,
পূর্ণ আজিকে সব মনোরথ
আসিয়া তোমার দ্বারে।
যাচিগো শরণ, কহিতে কহিতে
পড়িল চরণ পরে।

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা

(একাদশতম প্রকাশ)

—প্রতিভাকুমার কুণ্ডু

আমেরিকায় গিয়ে নায়াগ্রা জল প্রপাত দেখিনি, ডিস্‌নেল্যান্ড দেখিনি, কলোরেডো দেখিনি, অনেক কিছুই দেখিনি, দেখবার আগ্রহও নেই। কিন্তু মায়ের কৃপা দেখেছি, মায়ের খেয়াল অনুভব করেছি। এই খেয়ালটুকু অনুভব করার এবং একটু কৃপা পাওয়ার লোভেই আমেরিকায় আবার নামযজ্ঞ হওয়ার কথা, ১৪ ও ১৫, জুন ১৯৯৭, কলোরেডোর ডেনভার শহরে। ইস্‌কন সেন্টারে।

তার আগে আমরা গোবিন্দপুরের কথিকা বলে নিই। অপূর্ব্ব চিত্তগ্রাহী সে কথিকা। গোবিন্দপুরের মাটি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের চরণধূলিতে পূত, বিশুদ্ধ। মা বলেছিলেন, 'গোবিন্দপুর গোবিন্দের জায়গা।' 'গোবিন্দের জায়গা' গোবিন্দপুর ধন্য।

পঞ্চম কথিকা : পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের গোবিন্দপুরে আগমন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী কথিকা।

১৯৭৫ সনের জন্মোৎসব আগড়পাড়া আশ্রমে সাড়ম্বরে পালিত হোল। উৎসবের পর দক্ষিণ কোলকাতায় এক মাতৃভক্তের বাড়ীতে মা ছিলেন। একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় মাকে গোবিন্দপুরে আসার কথা বলতে সেখানে গিয়েছিলাম। আমার নিবেদন শুনে মা বললেন, 'পরমানন্দকে বল।' প্রথম ফাঁড়া কাটল। ঐ কথা বলার অর্থই হোল, মা মত দিলেন।

পরমানন্দ স্বামিজী তখনও যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। মায়ের প্রোগ্রাম তখন তিনিই করতেন। মাকে গোবিন্দপুরে নিয়ে যাওয়ার কথা স্বামিজীকে বললাম। বললাম, 'ওখানে আমাদের বড় বাগান আছে, অনেক গাছপালা আছে। ঘর বাড়ী আছে। মা যদি অন্ততঃ একটা দিন থাকেন তাহলে খুব ভালো হয়।'

স্বামিজী বললেন, 'সকলের থাকার ব্যবস্থা করতে পারবে ?' আমি বললাম, 'সব সাধুদের, সব দিদিদের আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা তো করতে পারব না, অত ঘর নেই।'

দিদিরা সোৎসাহে প্রায় সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমাদের শোবার দরকার নেই। একটা রাত তো, আমরা বাগানে ঘুরে বেরিয়ে কাটিয়ে দেব। আমরা সবাই যাব।'

আমি হাতজোড় করে সবিনয়ে বললাম, 'আমি আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেও পারছি না, আবার সবাইকে যেতেও কিন্তু বারণ করছি না। সকলেরই খুব কষ্ট হবে।'

অনেকগুলি স্বরের হৈ-চৈ শোনা গেল একসঙ্গে। বুঝলাম, ওঁরা সকলেই যাবেন, যতই

কষ্ট হোক।

এইভাবেই শ্রীশ্রী মায়ের গোবিন্দপুরে শুভাগমনের সূচনা হোল। বাড়ী ফিরে এসে বিরাটভাবে ও বিস্তারিতভাবে প্রস্তুতি পর্ব্বের তোড়জোড় শুরু হোল। এক রাত্রির জন্যে হলেও মাকে আনা ও সব কিছু সুবন্দোবস্ত করা খুবই কঠিন কাজ। সময়ও স্বল্প। যাঁরাই দায়িত্ব নিয়ে একাজ করেছেন, তাঁরাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৯৭৫ এর ৫ই জুন বৃহস্পতিবার দুপুরের পর মা সদলবলে সোনারপুরে শ্রীমহাবীর সেনের বাড়ীতে এলেন। এখান থেকে বিকেল চারটের সময় মা গোবিন্দপুর যাবেন। পরমানন্দ স্বামিজী এইরকমই বলেছিলেন।

খোলা মাঠে সুসজ্জিত আসনে মাকে সুন্দরভাবে বসানো হয়েছে। মাকে ঘিরে বহু ভক্ত বসে আছেন। অনেকে দাঁড়িয়েও আছেন। মাকে একজন পাখার হাওয়া করছেন। সবাইকে ডাব খাওয়ানো হচ্ছে। শ্রী সেন আমাকেও একটা ডাব খাওয়ালেন। চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি, মা নিজে গান গাইতে শুরু করলেন। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, ভাবছি কতক্ষণে মাকে গোবিন্দপুরে নিয়ে যাব, এই সময়ে মা স্বয়ং গান ধরলেন। আমি মায়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। মাও মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। এত দূর থেকে মায়ের চোখের ভাবটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মনে হোল মা যেন কৌতুক করছিলেন।

ক্রমশ: আমার অস্থিরতা তো লক্ষণীয়ভাবে বেশ বাড়ছিলই। বোধহয় কিছুটা উষ্মা ও উত্তেজনার প্রকাশও আমার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল। কারণ শ্রী সেন তাড়াতাড়ি আরও একটি ডাব এনে আমাকে খাওয়ালেন। চারটের সময় মা গোবিন্দপুরে যাবেন, এটা নিশ্চয়ই উনি জানতেন। উষ্মা ও উত্তেজনা উপশমে ডাবের জল পান করানোর উপদেশ দেওয়া চলে কারণ, আমিও যেন অনেকটা শান্ত হয়ে গেলাম। মা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে স্নিগ্ধ কণ্ঠে গান গেয়েই চলেছেন। মায়ের কোনোই তাড়া নেই।

এদিকে অনেকক্ষণ হোল ঘড়িতে চারটে বেজে গেছে। প্রায় পাঁচটা বাজতে চলল। ভেবেছিলাম, অন্ধকার হওয়ার আগেই মাকে গোবিন্দপুরে নিয়ে যাবো। গ্রামের মধ্যে কাঁচা রাস্তায় বেশ অনেকটা পথ ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাকেই গাড়ী চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমি অনর্থক চিন্তা করছিলাম, একেবারেই অনর্থক। যার চিন্তা, তিনি তো সবকিছু চিন্তা করেই রেখেছেন। আমরা তো কিছুই বুঝি না। পরে তা পরিষ্কার বুঝলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, লক্ষীবার। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে তবে মা গোবিন্দপুরে ঢুকলেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য এত খুঁটিনাটির দিকে মায়ের সবিশেষ নজর ছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়। যেই মায়ের লীলার ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, সেই মা সামান্য একজন গৃহীর বাড়ীতে বারবেলা পার করে তবে ঢুকবেন, অচিন্তনীয়। সেই মা আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা। আমাদের জীবনে এই মঙ্গলময়ী মাকে যদি না পেতাম, তাহলে, কোন অজানা পঙ্কিল আবর্তে আমাদের জীবনের

শুরু ও শেষ কর্দমাক্ত হয়েই পড়ে থাকত।

গোবিন্দপুরে বাগানের মাঝখানে ছোট খোলা মন্দিরে মাকে বসিয়ে পদ্মা সন্ধ্যা-আরতি করে বরণ করল। মাকে ১০৮টি লাল পদ্মের মালা পরানো হয়েছিল। উপরের ঘরখানায় পূর্ব্বে গৃহীরা বাস করায় মা ঘরে প্রবেশ করলেন না। নতুন তৈরী বারান্দায় মা রইলেন। বারান্দার একপাশে মায়ের রান্না ঘর। মায়ের যাতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে না হয়, তার সব ব্যবস্থাপনা করতে আমি আপ্রাণ সচেষ্ট হলাম। সব দেখে শুনে মা বললেন, 'সব কিছু আমার উপর ছেড়ে দাও। আমাকে নিজের মত থাকতে দাও। কোনো চিন্তা কোরো না। তুমি বরং অতিথিদের খাওয়াওগে।' যেন মায়ের নিজের ঘরবাড়ী, মায়েরই আশ্রম। আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম।

কতবার কত রাজপ্রাসাদে দেখেছি, জরির মখমলের সুসজ্জিত আসনে মাকে বসিয়ে কি বিপুল বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা। সেখানে আমাদের মা একেবারেই ধরাছোঁওয়ার বাইরে। দীনহীন কাঙ্গালের মত দূর থেকে সকরুণ দৃষ্টিতে মাকে শুধুই দেখতাম। মনে হোত, মা যেন আমাদের মা নন, অন্য জগতের মা।

আর আজ এখানে, এই গোবিন্দপুরে মাকে এত আপনার ও এত কাছের মনে হোল যে, মাকে ধরা ছোঁওয়ার প্রশ্নই উঠল না। মা সর্ব্বক্ষণ এত কাছে কাছে, একেবারে নাগালের মধ্যে, কাকে ধরব, কাকে ছোঁব। মা তো আমাদেরই একজন হয়ে আমাদেরই মধ্যে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎই এক সময় উঠোনে আমাদের ব্যবহার করা একখানা পুরোনো বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। একটা আসন আনবারও সময় পেলাম না। মা এখানে একেবারেই ঘরোয়া মা। ব্যবধান ও নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নেই। মনে মনে খুবই আনন্দ ও সুখানুভূতি হচ্ছিল এই ভেবে যে, মা গোবিন্দপুরের এই বাড়ীঘর, বাগান গাছপালা, সামান্য বহু পুরোনো চেয়ার ইত্যাদি কতখানি একেবারে নিজের বলে মনে করছেন।

শয়নের পূর্ব্বে রাত্রে মা বিশেষ কিছুই খেলেন না, মনে হয় শরীরটা বেশী ভাল ছিল না। অবশ্য মায়ের শরীরের ভাল বা মন্দ, আমরা ভক্তরাই সৃষ্টি করি। আমাদের কাছে জাগতিক ক্ষেত্রে আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে এটি একটি আপেক্ষিক তত্ত্ব। শ্রীশ্রী মায়ের নিজস্ব খেয়ালে মায়ের শরীরের ভাল বা মন্দ কোনো কিছুই নেই। যাই হোক, রাত্রে মা খেলেন না, সে কারণে মন বেজায় খারাপ। এত উপচার ও এত সামগ্রী এনে রেখেছিলাম মায়ের জন্য! নিশ্চয়ই কোনো দোষ বা ভুল ত্রুটি হয়েছে। মা ভোগ নিলেন না, যে ভোগের কণিকা প্রসাদের জন্য আমরা সর্ব্বদাই লালায়িত থাকি!

বালীগঞ্জের সুনীলকৃষ্ণ পাল ও আমি সমস্ত রাত গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের গল্প, রাতটুকু তো নিমেষেই কেটে গেল। মাঝখানে রাত আড়াইটের সময় দেখলাম, মা বারান্দায় রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে। সামনে দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে মা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে

রইলেন। প্রায় পনের মিনিট পর মায়ের রান্নাঘরের আলো জ্বলল। পরদিন মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন, 'হ্যাঁ, খেলামইতো, সব কিছুই খেলাম!' মা অত রাত্রে কষ্ট করে সব কিছু খেলেন। নিজে কষ্ট স্বীকার করলেন। কিন্তু স্নেহময়ী মা সন্তানের মনে ব্যথা দিলেন না। মায়ের জন্য কত ফল তরকারি, কত উপচার এনে রেখেছিলাম!

পরদিন খুব ভোরবেলা উদাসদির হাত ধরে মা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। ঘন সবুজ বাগান। ফুলে ফলে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব শোভামণ্ডিত ঈশ্বর-সৃষ্ট বৃক্ষরাজি। মৃদু বাতাসে পত্র পুষ্প ঈষৎ দুলছে। মাটির ও ফুলের প্রাকৃতিক সুগন্ধে সমস্ত বাগান আমোদিত। শুভ্রবসনা শ্রীশ্রী মা পদ্মপুকুরে ভাসমান শ্বেত রাজহংসের মত দিব্য ছন্দে ভেসে চলেছেন সাবলীল পদক্ষেপে। স্বর্গের পারিজাত-কানন আমরা দেখিনি, এ দৃশ্যর চেয়ে কখনই সুন্দর হবে না।

বেড়াতে বেড়াতে মা বললেন, 'করম্‌চা দিয়ে ডাল কর, সজনা ডাঁটার চচ্চড়ি কর।' প্রচুর নানা রঙের ফুল মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে মা বললেন, 'এত ফুল, বিক্রি কর, না দেবতার পূজায় লাগে?'

মা বেড়াচ্ছেন আপন খেয়ালে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলাম। হঠাৎ এক সময় উদাসদি মাকে বললেন, 'প্রতিভাদার হাতের তালুতে একটা ফোসকা কি হয়েছে দেখ, মা।'

মা বললেন, 'কই দেখি।' আমি ডান হাতের তালুটা মেলে ধরে দেখিয়ে বললাম, 'দুদিন আগে একটা ইলেক্‌ট্রিক প্লাগ হাতে ফেটে গিয়েছিল। তাই বিরাট ফোসকা পড়ে গেছে।'

মা গম্ভীর হয়ে কঠিন স্বরে বললেন, 'এক্ষণি যাও। ডাক্তার দেখাও! আমি অপরাধীর মত দ্রুত পদে সরে পড়লাম। সকলের সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেলাম। এর মধ্যেই আরও দুবার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মা বললেন, 'একি! এখনও তুমি যাও নাই? যাও, যাও।' মোটামুটি সব কিছুর ব্যবস্থা করে রেখে কোলকাতা চলে এলাম।

হাতখানা দেখেই ডাক্তার বললেন, 'করেছেন কি! তিনদিন পার হয়ে যাচ্ছে। এতো পেকে ভয়ানক বিষাক্ত হয়ে গেছে! এক্ষুনি কাটতে হবে। আর দু'এক ঘন্টা দেরি হলে তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি হোত!'

ছুরি কাঁচি সব ফুটিয়ে হাতের তালুর অসহ্য যন্ত্রনাময় ফোসকাটি ডাক্তার মহাশয় ঘ্যাচ করে কেটে দিলেন। বিষাক্ত পুঁজ রক্ত জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য উষ্ণ। গড়িয়ে হাতের উল্টোদিকে চামড়ায় লাগল। মনে হোল কেউ যেন জ্বলন্ত কয়লার ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। তার উপর ডাক্তারখানায় লোডশেডিং। জুন মাসের গরম। কি বিষম পরীক্ষা।

ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ডাক্তারখানা থেকে কোলকাতার বাড়ীতে এলাম। মায়ের জন্য একটা টেবিল পাখা নিয়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে পৌঁছোলাম প্রায় দুপুর সাড়ে বারোটায়। মা বারান্দায়

খাটের উপর বসেছিলেন। পুনর্জীবনদায়িনী মা বসেছিলেন যেন প্রাণ-সঞ্জীবিত এই লেখকের অপেক্ষাতেই। আমাকে দেখামাত্রই মা সস্নেহে বললেন, 'প্রাণ সংশয় ছিল।'

ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দজী বললেন, 'মাকে প্রণাম কর, প্রণাম কর।' আমি সাশ্রুনয়নে শ্রীশ্রী মাকে সবিশেষ প্রণিপাত করলাম। বললাম, 'মা, বড় গরম। তোমার মাথার কাছে একটা টেবিল পাখা লাগিয়ে দিই?'

মা বললেন, 'কই গরম? দেখ, কি সুন্দর হাওয়া!' মায়ের জন্য এই নবনির্মিত বারান্দাটা সাদা চাদর দিয়ে ঘেরা ছিল। মা ঐ কথা বলামাত্রই হঠাৎ একটা চাদর উড়ে এসে আমার মুখে সজোরে ঝাপটা মারল। প্রকৃতির হাওয়াটুকুতো মায়ের ইচ্ছাতেই বইল। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা যে স্বয়ং মহামাতৃকা, ঈশ্বর-স্বরূপা, তার প্রমাণ আমরা আর কতভাবে চাইব? আর মাও কতবার কতভাবে প্রমাণ দেবেন? তবু মাঝে মাঝে আমাদের মঙ্গলের জন্যই মায়ের স্বরূপ মায়ের খেয়ালেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মা আবার বললেন, 'আমি সব খেয়েছি।' ছোট্ট শিশুর মত বললেন। ভাবখানা এই, আবার বোকো না যেন, অথবা মন খারাপ কোরো না, সব খেয়েছি। আমি বললাম, 'বাবা! বারোটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছ, খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার।'

গ্রামের বাসিন্দারা কিন্তু সকাল থেকেই এসে বসে আছেন, মাতৃদর্শনের জন্য। মা এ-কথা জানেন। কিন্তু ক'টার সময় দর্শন দেবেন, সে বিষয়ে কিছুই বলছেন না। তাঁরাও ধৈর্য্য ধরে বসেই আছেন। কোনোরকম চঞ্চলতা, উত্তেজনা বা বিরক্তির প্রকাশ কিছুই নেই। মায়ের লীলা আমরা প্রায় সময়েই কিছুই ধরতে পারি না। সংসারের কাজকর্ম, রান্নাবান্না, সব কিছু ভুলে গিয়ে মহিলারা সকাল থেকে এসে বসে আছেন। ঠিক যেন উন্মাদিনী গোপিনীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছেন।

বাগানের ছোট্ট খোলা মন্দিরটায় মায়ের বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিকেল প্রায় তিনটে নাগাদ ওখানেই স্নান করতে লাগলেন মা। মন্দিরের চারিদিক খোলা। পর্দা দিয়ে সব দিক ঘিরে দেওয়া হোল। আমাদের কয়েকজন, পনের কুড়ি জন হবে, সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের টিউব ওয়েল থেকে বালতি বালতি ঠাণ্ডা জল মাকে সরবরাহ করছিলাম। আশ্চর্য্য, মায়ের স্নান যেন আর শেষই হচ্ছে না। যে মা রৌদ্রতপ্ত ঈষদুষ্ণ জলে কদাচিৎ স্নান করেন, সেই মা আজ কুড়ি বালতিরও বেশী ঠাণ্ডা জল দিয়ে আধঘন্টার বেশী সময় ধরে স্নান করলেন। এও মায়ের আরেক লীলা। মায়ের স্নান-অভিষেক জলে গোবিন্দপুরের মাটি পবিত্র হয়ে গেল। এই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে নূতন এবং অভূতপূর্ব্ব।

মায়ের স্নানের পর গ্রাম-বাসিন্দাদের মাতৃদর্শন শুরু হোল। সবাই যেন মায়ের কত পরিচিত, সেইভাবে বৌদের সঙ্গে তাদের জা, শাশুড়ি, ভাসুর, সকলের সম্বন্ধেই মা বেশ সহজ এবং

ঘরোয়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। মাকে প্রণাম করে যখন সবাই একে একে চলে যাচ্ছিলেন, আমরা সকলের হাতেই একটা করে ফল দিচ্ছিলাম। মা বললেন, 'তোমাদের দিতে হবে না, ওরা নিজেরাই তুলে নিক।' এটিও একটি নতুন আনন্দ। মায়ের লীলার অন্ত নেই।

সন্ধ্যার আগে বিকেল পাঁচটায় শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা গোবিন্দপুর ছেড়ে চলে গেলেন অন্যত্র। আনন্দের হাট নিমেষে ভেঙ্গে গেল। গোবিন্দের জায়গা গোবিন্দহীন মনে হতে লাগল। পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় যেমন অন্ধকার নেমে আসে, সেই রকম ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যা আমাদের হৃদয়ের আলো কেড়ে নিল।

আমি বললাম, 'মা, আবার এসো!' মা, বললেন, 'আনলেই আসব। আনলেই আসব। আনলেই আসব।' আমি বললাম, 'তিনবার বললে কিন্তু! এঁরা সবাই সাক্ষী!' তরুণ ঠাকুর, অরবিন্দ চ্যাটার্জ্জি এবং আরও অনেক মাতৃভক্ত তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মায়ের গাড়ী চলে গেল।

(ক্রমশ:)

পথের সন্ধান

—ডঃ দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তুমি কি ভেবেছ কভু
জীবনদীপ নিভে যাবে,
কত কলহ, কত অহংকার, ধূলায় মলিন হবে।
সে "ক্ষণ" কার কখন প্রকাশ, জানে নাকো কেহ হায়!
কার সাথে কে মিলিবে তখন, ভাবনা নাহিকো হয়।।

সে এক অজ্ঞাত জগৎ, হয়তো আঁধার, হয়তো জ্যোতির্ময়।
তুমি হে পথিক, পথের যাত্রী! জানা তো তোমার নাই।
গুরুবাক্য যদি করহ পালন, কাণ্ডারী তিনি হন;
বিশ্বাস যদি করহ ধারণ, অবিশ্বাসী তিনি নন।।

সে কোন জগৎ, কেমন সঙ্গী, কেমন আকাশ-বাতাস?
আছে কি দুঃখ, আছে কি শোক, সংসার হা-হুতাশ!
তোমার এত হিসেব-নিকেশ, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা!
এ বড় বিচিত্র, যে তোমার নাইকো কোন ভাবনা।।

মা বলেন যে আছে "পেনসন্" মৃত্যুরও পরপারে,
আছে যে "রিটার্ণ টিকেট", তোমার কর্মচিন্তার পরে।
তাই হে বন্ধু! করহ বিচার, কি তোমার অভিলাষ,
কোথায় তোমার ধ্রুবতারা, আর কোথায় বিবেক-বিচার?

মাতৃচরণ করহ শরণ। সব কিছু পেয়ে যাবে,
কামনা-বাসনা থাকেও যদি, ভোগের সুখে রবে।
স্বর্গসুখ চায়না সাধক, ভোগান্তে ফেরার পালা,
মাতৃচরণ চায় যদি কেউ, মুক্তির পথ খোলা।।

মা কি সাকার, মা নিরাকার, যা কিছু ভাবনা মনে।
মা স্বয়ং পরব্রহ্ম, মিশে হবে 'এক' তাঁর সনে।।

গীতার কথা

(দুই)

— 'তাপস'

দশম অধ্যায়ে "কেষু কেষু ভাবেন চিন্ত্যয়সি ভগবন ময়া" (১০/১৭) অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান তাঁর বিভূতি বর্ণনা করলেন। ভগবান বিশ্বে থেকেও বিশ্বের অতীত। তাঁর আদি নাই অন্ত নাই। সব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে, শ্রেষ্ঠ অংশে ভগবানের বিকাশ প্রকাশ। তাই তার উৎকৃষ্ট বিভূতিতে তাঁর চিন্তা করতে হয়, উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। অনন্যভাবে নিত্যযুক্ত ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগের দ্বারা ভক্ত ভগবদ্ সাযুজ্য লাভ করেন। ভগবান তাঁর বিশেষ বিশেষ বিভূতির কথা উল্লেখ করে বললেন, তাঁর যোগশক্তির একাংশদ্বারাই এই সমস্ত জগত ধরে আছেন।" (১০/৪২)

একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে অর্জুনের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা। ভগবানের মধ্যে বহুর ঐক্য সাধিত হয়েছে। ভগবান এক হয়েও বহু, বহু হয়েও এক। অর্জুন তার মানবীয় দৃষ্টিতে ভগবানের যোগৈশ্বর্য, ভগবানের বিশ্বরূপ দেখতে পারবেন না বলে তাকে দিব্য দৃষ্টি দিলেন। অর্জুন দেখেছিলেন জগতের সব কিছুই, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তাঁর মধ্যে অনুসৃত। ভগবানের মধ্যেই কালের মূর্ত্তি, নারায়ণের মূর্ত্তি। সব কিছুই নিয়তি-নির্দ্দিষ্ঠ হয়ে আছে। ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন অভিভূত হয়ে তাঁর স্তুতি করলেন, "আপনিই জানবার যোগ্য পরমব্রহ্ম, আপনিই এই জগতের পরম আশ্রয়। আপনি অনাদি, ধর্মের রক্ষক, আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ।"(১১//১৮)

ভগবান অর্জুনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগ্রত করে তাকে পরিশেষে বললেন, — "হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি মৎকর্মকারী, সন্নিধ, মদ্ভক্ত ও আত্মীয় স্বজনাদিতে আসক্তিশূন্য এক সর্বভূতে, এমন কি অত্যন্ত আকারীর প্রতিও বৈরভাব হীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।" (১১/৫৫)

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান ভক্তিযোগের কথা বললেন। সাকার, নিরাকার উপাসকের কথা ও ভগবত প্রাপ্তির উপায় এক ভগবদ্ ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন। ভগবান অর্জুনকে দৃঢ়ভাবে বললেন — "ভগবান একাগ্র নিত্যযুক্ত, যে ভক্তগণ শ্রদ্ধার সাথে সগুণ ভগবানের উপাসনা করেন, তাদের আমি শ্রেষ্ঠ যোগী মনে করি।" (১২/২)

অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেও সেই একলক্ষ্যে পৌঁছান যায়, কিন্তু সে পথ অধিকতর কঠিন। তা পূর্ণ ও অখণ্ড নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ব্যক্তরূপী ভগবানে মনবুদ্ধি অর্পন করতে এবং অভ্যাস যোগের দ্বারা তাঁকে পেতে। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ

শ্রেষ্ঠ। তাতেই পরম শান্তি লাভ হয়। তারপর শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে বলে ভগবান বলছেন, — "যে সকল ভগবৎ অনুরক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্তভাবে ধর্মময় অমৃতের নিষ্কাম উপাসনা করেন, সেই সকল ভক্ত ভগবানের অতিপ্রিয়।" (১২/২০)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন ক্ষেত্রও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে। এই দেহই ক্ষেত্র, এক এরমধ্যে, যিনি জ্ঞাতা পুরুষ তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রের মধ্যে আছে পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান যার হয়েছে, তার জ্ঞাননেত্র খুলেছে। জ্ঞেয় বস্তু হচ্ছে একমাত্র পরমাত্মা। তিনি অনাদি ব্রহ্ম। তিনিই বিশ্বময়, বিশ্বাতীত, তিনিই ক্ষর এবং অক্ষর। আত্মজ্ঞ পুরুষ এই শাশ্বতরূপকে জ্ঞাত হন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি। পুরুষ সাক্ষী, প্রকৃতিই কার্য করে। প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়।

চতুর্দশ: অধ্যায়ে প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণের বিষয় ও গুণাতীতের লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান অর্জুনকে বললেন — ঈশ্বর হতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হতে গুণত্রয়ের উৎপত্তি। গুণত্রয়ের প্রকাশ কর্ম ও মোহ দেহীকে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ অবশ্য মুক্তির সহায়ক। কিন্তু ভগবান বলছেন, সাধনার দ্বারা ত্রিগুণাতীত হয়ে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ: ও তম গুণের ঊর্ধ্বে যে চৈতন্য সত্তা আছে, তার সাযুজ্য লাভ করতে হবে। সত্তায় ও প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হতে হবে। এ সম্ভব অনন্য ভক্তির সাথে ভজনার দ্বারা, সততা জ্ঞানলাভের দ্বারা। তাই বলছেন, — "যে পুরুষ অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজনা করে সেই এই সকল গুণকে অতিক্রম করে পরব্রহ্মে একত্বভাব প্রাপ্ত হবার যোগ্য হয়।" (১৪/২৬)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান পুরুষোত্তম তত্ত্বের কথা বলছেন। সংসার জড় অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল, কিন্তু ঊর্ধ্বে পরমাত্মার সাথে যুক্ত। জড়-প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী মায়াতে সংসারী জীব মুগ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা সংসার বৃক্ষের ছেদন করে অনাসক্ত পুরুষ পরমপদকে লাভ করেন। ভগবান বলছেন, তিনি ক্ষর অর্থাৎ নাশবান এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী জীবাত্মা হতেও উত্তম পুরুষোত্তম। তাই মানবের কর্তব্য নাশবান সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে পরমাত্মার শরণাপন্ন হয়ে ভজনা করা। তবেই তার সাথে যুক্ত হওয়া যায়। তাই বলছেন, — "এই প্রকার তত্ত্বত: যে জ্ঞানী পুরুষ আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বভাবে বাসুদেব পরমেশ্বর রূপ আমাকেই ভজনা করে।" (১৫/১৯)

ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন দৈবী প্রকৃতি ও আসুরিক প্রকৃতির কথা। অভয়, অন্ত:করণের স্বচ্ছতা, জ্ঞানযোগ, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি দৈবী গুণ সত্ত্বপ্রধান এবং মুক্তির দিকে মানুষকে নিয়ে যায়। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, অজ্ঞান, অনাচার, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, অহংভাব আসুরিক গুণ, রজো তামসিক এবং বন্ধনের দিকেই মানুষকে নেয়। তারা কামনা বাসনায় জর্জরিত। তারা গর্বিত, অহংকারী, শাস্ত্র বিরোধী কর্মে লিপ্ত থাকে।

তাই জন্মে জন্মে অধোগামীই হয়। তাই শাস্ত্র-নির্ধারিত পথে চলে সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে সাধনার দ্বারা শ্রেয়কে লাভ করতে হয়। তাই বলছেন— "কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার উপদেষ্ঠা। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের স্বরূপ জানিয়া ইহলোকে তোমার কর্ম করা উচিত।" (১৬/২৬)

সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলছেন শ্রদ্ধা তিন প্রকার— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। আহার, বিহার, সবই এই তিন ভাবের আশ্রিত। ভগবান বলছেন— "সকল মানুষের শ্রদ্ধা অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। মানুষ শ্রদ্ধাময়, কারণ যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেই রূপই হন।" (১৭/৩)

শ্রদ্ধাই আমাদের জীবনের মূল নীতি। মানুষের অন্তরের যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, দেখবার, জানবার, বিশ্বাস করবার, তাই আমাদের দিব্যতম শাশ্বত স্থিতির দিকে নিয়ে যায়। তাই প্রয়োজন সাত্ত্বিকভাবকে আশ্রয় করে উচ্চতর সত্যনীতির একনিষ্ঠ অনুশীলন।

পরিশেষে অষ্ঠাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের পথ। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা নিষ্কামভাবে করতে হয়। কর্মের সিদ্ধির পাঁচটি কারণ, জীবাত্মার আধার, প্রকৃতিরূপকর্তা, চক্ষুরাদি করণযন্ত্র, নানারূপ চেষ্টা এবং দৈব বা অদৃষ্ট বা ভাগবতী ইচ্ছা। কর্মের পশ্চাতে যে জ্ঞান থাকে, তাই আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিপুল পার্থক্য এনে দেয়। জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা গুণভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিতর দিয়াই আসে শ্রেষ্ঠতম মুক্তকর্ম। সকলেই প্রকৃতিজাত গুণ থেকে মুক্ত নন। সত্ত্বের বিকাশ দ্বারাই ঊর্ধ্বের দিব্য প্রকৃতিতে নবজন্ম লাভ হয়।

প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং তাদের কর্মও সেইরূপ। কিন্তু সব মানুষই যথাযথ জ্ঞানে তৎ উদ্দেশ্যে কর্ম করলে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। তাই ভগবানকে সর্বাবস্থায় স্মরণীয়। সকলের হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ রূপে ভগবান বিরাজমান। সেই পুরুষের উপলব্ধি অভ্যাস ও ভগবত কৃপায় সম্ভব।

পরিশেষে ভগবান অর্জুনের কাছে তাঁকে পাবার সহজ উপায় বলছেন, — "নিরন্তর অচল মনযুক্ত হও, একনিষ্ঠ ভক্ত হও, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের সাথে আমার পূজা কর, নমস্কার কর, তবেই তুমি ভগবানরূপী আমাকেই প্রাপ্ত হবে। সকল ধর্ম (অর্থাৎ কর্মের আশ্রয়) পরিত্যাগ করে কেবল পরমাত্মারূপ আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক করোনা।" (১৮/৬৪,৬৫)

বস্তুত: গীতার এই আঠারটি অধ্যায়ে সাতশ শ্লোকে যে সব উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা মানব জীবনের প্রকৃত দিশারী। পুরুষোত্তম ভগবানের অনন্য শরণ নিলে তিনিই ভক্তের ত্রাতা, রক্ষাকর্তা, সিদ্ধি ও মুক্তির কারণ হন।

"ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়।"

শ্রীশ্রী মায়ের কৈলাশ যাত্রা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রী শিবানন্দ

গাইডের নির্দ্দেশে অতি প্রত্যুষে-ই ভিডি পো হ'তে রওয়ানা হ'তে হ'ল। গাইড বলেছিল আজ বুঁদ পৌছাতে হবে। তাই এই ব্যস্ততা। যা হোক, কিছু দূর অগ্রসর হয়ে প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে মা এসে উপস্থিত হলেন যে স্থানে, তার নাম 'জি জি পো।' স্থির হয়েছিল, মধ্যাহ্ন ভোজন এখানেই সমাপ্ত করে নিতে হবে। তাই হ'ল। মধ্যাহ্ন ভোগের পর প্রায় পরন্ত বেলায় পৌঁছান গেল বুঁদে। বুঁদ বা বুন্দ। মাত্র কয়েক ঘর বাসিন্দা নিয়ে গড়ে ওঠা এক লোকালয়, এই বুঁদ। এস্থানেই রাত্রি বাসের পরে রওয়ানা হয়ে প্রায় ৯/১০ মাইল চলার পরে মায়ের দল উপস্থিত হল বিরাট এক জলাশয়ের তীরে। গাইড বলল, এর নাম লাংচো। বোঝা গেল লাংচো হ'ল এই জলাশয়ের তিব্বতী নাম। এ হ'ল রাক্ষস তালাও। রাবণ হ্রদ নামেও এর পরিচয় আছে। গাইড বলল, রাক্ষস-রাজ রাবণ এ স্থানেই তপস্যা করে ছিলেন, তাই ওর ঐ নাম। এ দেশীয়দের মতে এর জল অস্পৃশ্য। সুতরাং যাত্রীরা দূর থেকে-ই দর্শন করে চলে যায়। মা দেখালেন, এ স্থান হতেও দূরে কৈলাশের তুষারশুভ্র চূড়াটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

যাবার সময় মা যে পথে গিয়েছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তনের এ পথ, সে পথ নয়। সুতরাং এ পথ মানস সরোবর হয়ে যাবে না। যাবে মান্ধাতা পর্বতের পাশ দিয়ে।

চলার পথে মা বলছেন, "দেখ ভগবানের কি সৃষ্টি! কী প্রকাণ্ড সব সরোবর। দেখলে মনে হয় দেবতারা মানস সরোবর তৈরী করার সময় যে মাটী তুলেছেন তা দিয়েই যেন এই সব পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে।"

গুরুপ্রিয়া দিদি বলেছিলেন, মা দেবতারা যেমন মানস সরোবর তৈরী করেছেন, এই রাবণ হ্রদ কে তৈরী করল? রাক্ষস রাজ রাবণ কী? যদি তাই হয় তবে রাবণ তো কম ছিল না।

মা বললেন— "অসম্ভব কি? সম্ভবও অসম্ভব, আবার অসম্ভবও সম্ভব।"

মা চলেছেন। মাঝে মাঝে, দূরে দূরে ২/১ টী লোকালয় চোখে পড়ছে। গাইড তাদের নামও জানাচ্ছে, দীলারিং, বালকাদ ইত্যাদি।

দিবা অবসান হয়ে আসায় একটি সমতল ভূমি দেখে রাত্রি বাসের আয়োজন হ'ল। রাত্রিতে ছাতু-ই খাওয়া হ'ল। চলার পথে এ দেশে যাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদ শোনা গিয়েছিল। প্রবাদটি হ'ল— "পুরী পয়সা, সরোবর ছাতু।" অর্থাৎ পুরীর পথে পয়সাই সম্বল। যার পয়সা আছে তার সে পথে অসুবিধা নাই। কিন্তু এই সরোবরের রাজ্যে পয়সার কোন মূল্য নাই, ছাতু

থাকলেই আর কোন কষ্টের কারণ নাই।

যাক, পর দিন শনিবার, ১ লা শ্রাবণ। আজ তাকলাকোট পৌঁছাতে হবে। গাইড বলল, তাকলাকোট এখান থেকে ৫/৬ ঘন্টার পথ। সুতরাং অতি প্রত্যুষেই রওয়ানা হয়ে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই তাকলাকোট পৌছে আহারাদি করা হবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েই রওয়ানা হওয়া গেল।

পথ চলেছে আঁকা বাঁকা সাপের মত। সরোবরের তীরে তীরে কোথাও অল্প অল্প ঘাস জাতীয় তৃণ কিন্তু তার বর্ণ সবুজ নয়, কিছুটা দগ্ধ হরিৎ বর্ণ। তৃণগুলো কোমলও নয়, কন্টক জাতীয় শক্ত এবং রুক্ষ। অথচ সঙ্গের ঘোড়াগুলো তাই মধ্যে মধ্যে খেয়ে নিচ্ছে। এই সব শোভা যাত্রীদের মন মুগ্ধ করে রেখেছিল। সুতরাং মনে হয়েছিল যেন অল্প সময়েই পৌঁছান গেল। তাকলাকোটের অদূরেই একটি প্রশ্রবণ, তারই নিকটবর্ত্তী স্থানে পড়ল মায়ের পড়াও।

এ স্থানে চতুর্দ্দিকে বহু গুহা-মঠ। বহু লামার বাস। কঠিন শীত অতিক্রম করে এসে এখানে শীতের প্রকোপও অসহ্য বোধ হচ্ছে না। যাদের শ্বাস কষ্ট বেশ হয়েছিল তারাও অনেকাংশে আরাম বোধ করছেন। রন্ধনাদি সমাপনান্তে মায়ের ভোগ হ'তে হ'তে প্রায় অপরাহ্ন ৫ টা হয়ে গেল। সকলের অন্তরেই খুশীর আমেজ।

এখানে একটি অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় তিব্বতীদের অনেকের পৃষ্টদেশেই একটি করে মাছ বাঁধা। জিজ্ঞাসায় জানা গেল ওরা মানস সরোবর থেকেই ওগুলো সংগ্রহ করেছে এবং তার কারণ হিসেবে ওরা যা বলল, সে এক বিচিত্র ব্যাপার। ওরা বলল, ঐ মাছ ওরা আহারের জন্য সংগ্রহ করে নাই। মানস সরোবরের এই মাছ ওদের নিকট এক বহু মূল্য বস্তু। ওরা বলে, এদেশে গদ্দি (ভেড়া পালক), হাঁস পালক, কিংবা অশ্বারোহীকে যদি বাঘ আক্রমণ করে তবে ঐ মাছ অগ্নি দগ্ধ করলেই তার খুসবাই (সুগন্ধ) যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ততদূর পর্যন্ত বাঘের দৃষ্টিতে শুধু মানস সরোবরের তরঙ্গ মালাই দৃষ্টিগোচর হবে এবং তাতে বাঘ অত্যন্ত ভয়ভীত ও অসহায় বোধ করে। তখন বাঘটীকে 'খতম' করা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার।

ক্রমে দিনের আলো কোমল হয়ে আসছে। সেই ম্লান আলো মধ্যেই হঠাৎ কতিপয় তিব্বতী মহিলা মায়ের তাঁবুর সম্মুখে এসে উপস্থিত। এ আবার মায়ের এক অদ্ভুত লীলা। মেয়েদের আসাতেই মায়ের কী খেয়াল হ'ল। মা গুরুপ্রিয়া দিদিকে ডেকে বললেন, — দিদি আমাকে করতাল দেও। মহিলাগণ বোধ হয় আমাদের এই বেশবাস এবং কথাবার্ত্তায়ই আকর্ষিত হয়ে এসেছে। কারণ দেখা যাচ্ছে তারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সকলকে লক্ষ্য করছে।

ইতিমধ্যে দিদি মাকে করতাল দিতেই মা বাজাতে আরম্ভ করলেন এবং মহিলাদের বললেন, গান কর। ওরা তো বোঝে না। তাই গাইডকে বলা হল বুঝিয়ে দিতে। আশ্চর্য্য, গাইড বলতেই ওরা নি:সঙ্কোচে অতি সহজ সরল ভাবে হাত ধরাধরি করে নাচ-গান সুরু করে দিল। কী সে গান, ভাষা তো জানা নাই, কিন্তু লক্ষনীয় ছিল ওদের আনন্দ উচ্ছাস। নাচ-গানের শেষে মা

ওদের মধ্যে পেস্তা-বাদাম-কিসমিস আদি বিতরণ করলেন। ওরা কী খুশী।

পরদিনও স্থির হ'ল এখানেই বিশ্রাম। কারণ পার্বতীর ইচ্ছা মা একবার লামাদের গুম্ফা দর্শন করেন। তার প্রস্তাবে মাও অনুমতি দিলেন। স্থির হ'ল এখনই মাকে নিয়ে যাওয়া হবে গুম্ফা দর্শনে।

যথা সময়ে সবাই মাকে নিয়ে চললেন। গাইড বললেন, — পাহাড়ের উর্ধ্বদেশে বৃহদাকার ঐ গুম্ফাগুলি স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিদের। ওখানেও দর্শনীয় আছে। সুতরাং মাকে সেদিকেই নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাদের উচ্চতা নেহাৎ কম নয়। সুতরাং অশ্বপৃষ্টেই যেতে হয়েছিল। কিয়ৎ দূর অগ্রসর হয়ে গাইড বলল, — ঐ মঠটির নাম পুরাং। পুরাংএর দিকে অগ্রসর হবার পথে বেশ কয়েকটি অন্য গুম্ফাও দেখা গেল। সাংঘাতিক চড়াই, পথ বলতে কিছুই নেই — পাকদণ্ডী বিশেষ।

পর্বতশীর্ষে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল বেশ কয়েকটী গুহা। ওদের প্রবেশ দ্বার গুলি বিভিন্ন রংএর। রং করা হয়েছে এলাকাটা দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের, গৈরীক লাল সাদা এবং পীত। গাইড জানাল রক্তবর্ণের ঐ প্রবেশ দ্বারটাই রাজ প্রতিনিধির প্রাসাদের ফটক। হরিদ্র বর্ণগুলি লামাদের বাসস্থলী এবং অন্যান্য রং এর গেট মন্দির বা শিক্ষানবিশীদের বাস প্রকোষ্ঠ। গুহাগুলি বিশালায়তন এবং প্রতিটিতেই অনেক লামার বাস। রাজ প্রতিনিধি 'জুম্পান পুশো।' এটি কি তার নাম বা উপাধি তা ঠিক বোঝা গেল না। একটা গুহাতে প্রবেশ করে দেখা গেল বেশ কয়েকজন লামা। লামা অর্থাৎ সর্বত্যাগী। প্রত্যেকেরই মুণ্ডিত মস্তক এবং লোহিত বস্ত্রধারী। শোনা গেল এদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। এগুহার সবাই এক শ্রেণীর চিরকুমার, শাস্ত্রজ্ঞ, তপস্বী ও সাধক। আর এক শ্রেণী, তাঁরা গৃহী ছিলেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন। এতদতিরিক্ত আরও এক শ্রেণী আছে তাঁরা হলেন ভিক্ষু, পর্যটন করাই এদের কাজ।

যাক, ঘুরে ফিরে গাইড মাকে নিয়ে গেল রাজ প্রতিনিধির গুম্ফাতে। গাইড দেখাল, সম্মুখেই একটি কাষ্ঠ সোপান। তাতে আরোহন করেই গুম্ফাতে প্রবেশ করা গেল। সোপানে তিনটি মাত্র ধাপ।

প্রবেশ করেই গাইড দেখাল, সম্মুখেই উপবিষ্ট বড় লামা। একটি রক্তবর্ণ গদির উপরে আসীন, তাহার সম্মুখেই একটি কুকুরও উপবিষ্ট। লামার বয়স ৬০/৬৫ বোধ হল। মুণ্ডিত মস্তক, সৌম্য ধীর শান্ত মূর্ত্তি। মুখমণ্ডলে প্রসন্ন ভাব। চক্ষু দুটি এত ক্ষুদ্র যে প্রায় দেখাই যায় না। ইনিই প্রধান লামা, রাজ প্রতিনিধি। ইনি তিব্বতের রাজধানী লাসা হতে নির্বাচিত হয়ে আসেন। ৫,৭ কিংবা ১০ বৎসর এক এক লামার কার্যকাল।

গুম্ফার চতুর্দ্দিকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও চিত্র। প্রত্যেক মূর্ত্তি বা চিত্রের সম্মুখেই এক একটি জল পাত্র এবং দেয়ালের গায়ে তিব্বতী অক্ষরে বড় বড় হরক লেখা। পার্বতী তা পড়ে বলল, লেখা রয়েছে — "ওঁ মণিপদ্মে হুং হ্রীং।"

রাজ প্রতিনিধির আদেশে অপেক্ষারত ২ জন লামা প্রসাদ দিল। পার্বতী বলল, এ সব তীর্থপুরী ও খচ্চর নাথের প্রসাদ। সঙ্গে এক এক টুকরা লাল কাপড়ও দিল। এই বস্ত্র খণ্ড নাকি অত্যন্ত শুভ এবং কল্যাণকর। চতুর্দ্দিকের সব মন্দিরের সম্মুখেই ঐ বস্ত্রের পতাকা উড্ডীন।

বাইরে এসে কিয়দ্দূর যেতেই কতগুলি বর্গাকার রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত প্রস্তর-স্তূপ দেখা গেল। তার উপরেও ঐ মন্ত্রই লেখা। শোনা গেল ও গুলো "থুলো" অর্থাৎ প্রধান লামাদের সমাধি।

অন্য একটি গুম্ফাতে দর্শন মিলল এক দেবী মূর্ত্তির। ইনি নাকি তারা মূর্ত্তি। বুদ্ধমূর্ত্তি ও চিত্র সব গুম্ফাতেই আছে।

আর এক গুহাতে রয়েছে তিনটি রজত-নির্মিত শতদল পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান তিনটি মূর্ত্তি। মধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিটি স্বর্ণময়ী-বিচিত্র এবং সুন্দর রত্নগ্রথিত মুকুটধারী। তার সম্মুখে এক অতিবয়োবৃদ্ধ মুণ্ডিতমস্তক লামা উপবিষ্ট। অবোধ এক ভাষায় তিনি যা বললেন, পার্বতী তার অর্থ করে বলল, তিনি জানতে চাইলেন, কেউ চা পান করবেন কিনা? শোনা গেল এ মন্দিরে চা ভোগ হয়। চা তারই প্রসাদ। মার নির্দ্দেশে সে স্থানে মেওয়া এবং টাকা ভেট দেওয়া হল।

পরবর্ত্তী গুহাটির দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে বহু প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র। গুহাটির ছাত হতে একটি শিকলে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক চামরীগাইয়ের কর্ত্তিত মুণ্ড। যেমন বিরাট তেমন বিকট। এখানেও এক লামা উপবিষ্ট। তার সাজ সজ্জা আবার পৃথক। কৃষ্ণ বর্ণের বস্ত্র এবং ফতুয়া জাতীয় জামা গায়ে। মুখমণ্ডল ভাবোজ্জ্বল। সম্মুখে তার গোলাকৃতি অনেক কাগজে কি যেন লেখা। ভাইজী তার এক খানা ৮ আনার বিনিময়ে ক্রয় করলেন। বিক্রীর উদ্দেশ্যেই ও গুলো রক্ষিত।

এই রূপ আরো কতিপয় গুহা দর্শনান্তে বেলা প্রায় ১২ টায় তাঁবুতে ফেরা হল।

যদিও আজ এ স্থানেই বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ফেরার পরও যথেষ্ট বেলা অবশিষ্ট থাকায় গাইডের ইচ্ছায় আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে থাকাই স্থির হ'ল। সুতরাং ভোগাদি হয়ে যাবার পর বেলা প্রায় ১॥ টায় রওয়ানা হওয়া গেল। প্রায় ছয় মাইল চলার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় এক নির্ঝরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। গাইড বলল, কাল লীপু পাস অতিক্রম করতে হবে, সুতরাং আজ এখানে বিশ্রাম নেওয়াই ভাল। স্থানটিও সুন্দর, তৃণ গুল্মের বহু বর্ণের ফুলে ফুলে যেন কার্পেট বিছানো।

(ক্রমশ:)

উড়াপাখি

—*দীপালি বসু মল্লিক*

শ্রীশ্রী মা একবার আদিনাথ পাহাড়ের ওদিকে ছিলেন। একদিন পথে যাওয়ার সময় একজন মহিলা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাড়ী কোন দেশে? মা উত্তর দিলেন, নাই দেশে। কোন জিলা? মা বললেন, ব্রহ্ম জিলা। আবার একজন জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ী কোথায়? মা বললেন, ব্রহ্মনগরে। তোমার কে আছে? মা বললেন, 'আত্মানন্দ'।

(শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবীর লেখা শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী-৪র্থ ভাগ-১৬ পৃ:)

প্র :- ওগো মেয়ে - তুমি উড়া পাখি, উড়ে উড়ে
কোন দেশে যাও ঘুরে ঘুরে?
বল তোমার কোথায় বা ঘর - কোন সুদূরে যাও ভেসে?
কোন দেশে গো কোন দেশে?

উ :- বাড়ী আমার ভুবন ভরে
আছি সবার হৃদয় জুড়ে,
সবার সাথে সবার মাঝে
আছি আবার নাই - আছি যে।
বললে পাখি মিষ্টি হেসে,
"নাই দেশে" গো "নাই দেশে"।

প্র :- ওগো মেয়ে - বাড়ী তোমার কোন গিরামের কোন জিলায়?
মিষ্টি মধুর কথা তোমার, শুনলে পরে প্রাণ জুড়ায়।

উ :- আমার জিলা সবার জিলায়
সবার সাথে আমার খেলায়,
নিত্যদিনের সকল মেলায়,
ভুবন ব্যাপী আমার লীলায়
বাস যে আমার "ব্রহ্ম জিলায়"।

প্র :- ওগো মেয়ে - বাড়ী তোমার কোন বিদেশের কোন নগরে?
তোমায় বড় আপন লাগে - হৃদয় কাঁদে পরশ তরে,
জানতে কেবল ইচ্ছা করে
কোথায় থাক? কাদের ঘরে?
কোন বিদেশের কোন নগরে?

উ :- আছি আমি আকাশ পারে,
আছি আমি বাতাস ভরে,
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে,
অন্তরীক্ষের সীমার পারে।
থাকি সবার হৃদয় জুড়ে,
বাড়ী আমার "ব্রহ্ম নগরে"।

প্র :- ওগো মেয়ে-আপন তোমার কে আছে গো কে আছে?
আমায় নাওনা আপন করে,
আমার দাওনা হৃদয় ভরে,
তুমি আমার আপন হয়ে রও গো চিরতরে।

উ :- চিৎশক্তি পরমাত্মা
জীবের আমি অন্তরাত্মা,
দ্যুলোকে ভূলোক গোলোকে।
আছি রূপের ঘরে অলক্ষে।
মোহশূন্য মায়ের রূপে
ঘুম ভাঙিয়ে জাগাই চুপে,
আমি পূর্ণ - স্বভাব, সদানন্দ,
আছে আমার "আত্মানন্দ"॥

পাদপীঠম্ স্মরামি

(প্রাচীন ঢাকা-রমণা আশ্রম)

— কুমারী গীতা ব্যানার্জী

"খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা
নিরজনে প্রভু নিরজনে.....
ভাঙ্গিছ গড়িছ নিতি আপন মনে
নিরজনে প্রভু নিরজনে।।"

মহাশক্তি মহামায়ার নিত্যলীলা বিলাসে আবহমান কাল ধরে ভাঙ্গা গড়া দুই-ই চলে আসছে। তাই ঢাকাতে রমণার ঐ চিহ্নিত জমিতে গড়ে ওঠা মায়ের সুরম্য আশ্রমটি যখন ১৯৭১ সনে পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তখন শ্রীশ্রী মা নির্লিপ্ত মৌনউদাসীনতায় আপনভাবে স্থিত হয়ে সব শুনেছিলেন। কারণ মায়ের কাছে ভাঙ্গা গড়া যে দুই-ই সমান। মা বলেন— "এই শরীরটা একটি উড়া পাখী। কখনও আপনভাবে ঢুকে পড়ে। আবার উড়ে চলে যায়। তোমাদের আশ্রম। তোমাদেরই সব।"

ঢাকা রমণা আশ্রমের ইতিহাস আমরা প্রাত:স্মরণীয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শ্রদ্ধেয় ভাইজীর রচিত গ্রন্থ 'মাতৃদর্শনে' বিশদভাবে বর্ণিত দেখতে পাই। সেই মহাপুরুষের ইচ্ছাতেই এই রমণা আশ্রমের সৃষ্টি। তাই তাঁর বইয়ের 'আশ্রম' পরিচ্ছেদ হতে এখানে উদ্ধৃত করছি—

"ঢাকায় শ্রীশ্রী মায়ের একটি আশ্রমের অভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রি আমি শাহবাগে গিয়াছি। মা বলিলেন, "চল্ মাঠে যাই।" পিতাজী, মা ও আমি রমণা মাঠে যেখানে ভগ্ন দেবালয়টি (বর্ত্তমান আশ্রম) ছিল, তাহার কিছু দূরে গিয়া বসিলাম। আমি মার চরণে নিবেদন করিলাম শাহবাগে তো আগে পরে কীর্ত্তনাদি চলিবে না, একটি আশ্রমের বিশেষ দরকার। মা বলিলেন— 'জগৎ ভরাইত আশ্রম, নূতন করিয়া আশ্রম করবি কি?' আমি বলিলাম— 'আমরা তো বেশী কিছু চাহি না, কেবল এমন একটি স্থান চাই— যেখানে আপনার চরণের চারিধারে আমরা সবাই মিলে কীর্ত্তন করতে পারি।' পিতাজীও আমার কথায় সায় দিলেন। মা তখন বলিয়া উঠিলেন— 'যদি এরকম কিছু করিস্, তবে ঐ যে ভাঙ্গা বাড়ীখানি দেখছিস্ ঐ স্থানই প্রশস্ত, উহা তোদেরই পুরোনো বাড়ী।' এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চুপ করিয়া গেলেন।

বার্ষিক ৩০০/- টাকা খাজনায় ৺কালী মন্দিরের মোহন্তের নিকট হইতে উক্ত স্থানটি গ্রহণ করা ঠিক হইয়া গেল। ৩১ শে চৈত্র, ১৩৩৫ (ইংরাজী ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৯) সেই পুরানো মন্দিরের ভগ্নাবস্থায় মায়ের পাদস্পর্শ করানো হইল।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৬ (১৯২৯, ইংরাজী ২রা মে) শ্রীশ্রী মা নূতন রমণা আশ্রমে প্রবেশ করেন।

১৯২৬ সনে দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে যে কালী পূজা হয়েছিল সেই মূর্ত্তির তখনও বিসর্জন দেওয়া হয়নি ও সেই পূজা উপলক্ষ্যে যে যজ্ঞ হয়েছিল, সেই যজ্ঞাগ্নি ও নির্ব্বাপিত করা হয় নি। ১৯২৯ অক্টোবর মাসে রমণা আশ্রমে টিনের একটি এক চালা করিয়া ৺কালী মূর্ত্তি তথায় স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়াদিদি এই সম্বন্ধে নিজের গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে লিখছেন — '১৩৩৬ সনের আশ্বিন মাসে মহালয়ার দিন সন্ধ্যার সময় মা ও ভোলানাথ রমণার আশ্রমে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ৺কালীমূর্ত্তিটি ও যজ্ঞাগ্নি ঐ আশ্রমে নেওয়া হইল।'

আশ্রমে ধীরে ধীরে গৃহনির্মাণ হতে লাগল। উত্তরে যে ঘরটি নির্মিত হয়েছে, সেখানে মা ও ভোলানাথ থাকলেন। সর্ব প্রথমে মায়ের জন্য যে কুটীরটি নির্মিত হয়েছিল, সেই কুটীরে শিব স্থাপিত হলেন এবং একটি ছোট নতুন মন্দিরে ৺কালী মূর্ত্তি স্থাপিত হলেন।

১৯৩০ সনে বাবা ভোলানাথ আশ্রমে যথাবিধি পূজা ইত্যাদি করে পঞ্চবটী স্থাপনা করলেন। এবছর মে মাসে ভোলানাথ কালীপূজা করলেন।

১৯৩১ সনের জানুয়ারীর প্রথমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র রায় ও শ্রী ভূপতিনাথ মিত্রের বিশেষ উৎসাহে বড় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মন্দিরের ভিত্তি খুঁড়িতে দেখা গেল যে বসা এবং শোয়া অবস্থায় ৪/৫ টি বড় ও ছোট সমাধি রহিয়াছে। এ সমাধিগুলির সম্বন্ধে মা একদিন বলিয়াছিলেন — 'এখানকার সারা জায়গাটি অতি পবিত্র, পূর্ব্বে ইহা সন্ন্যাসীদের স্থান ছিল। ভাইজীও তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমি ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন মহাপুরুষকে রমণার মাঠে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। সাধুদের নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাঁহাদের সমাধিতে মন্দিরাদি স্থাপিত হউক এবং তাহাতে দেবতার নিত্য পূজা, সাধন ভজনাদির দ্বারা এই স্থানটি জনসাধারণের ধর্ম্মভাবের সহায়ক হইয়া পবিত্রতা রক্ষা করুক। যাহারা এই অনুষ্ঠানের সম্পর্কে আসিয়াছে এবং আসিবে সকলেরই এ সকল মহাপুরুষদের সঙ্গে কোন না কোন বন্ধন ছিল।'

শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদি দ্বিতীয় ভাগে লিখছেন — "আশ্রমে বড় মন্দিরের মাটি খুঁড়িবার সময় অনেকগুলি সমাধি বাহির হইল। এমন কি, শরীরের হাড় পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। কোন জায়গায় হাড়ির ভিতর ভস্ম ও মাটির প্রদীপ পাওয়া গেল। মা-ই ইহা দেখাইলেন। তিনটি সমাধি বড় মন্দিরের মধ্যে পড়িল। দুই দিকের দুইটি ছোট মন্দিরের নীচে এক একটি সমাধি পড়িল। মধ্যের মন্দিরে ৺কালী মূর্ত্তির স্থাপনা হইল। আর দুই মন্দিরে একটিতে ৺শিব ও অপরটিতে মার পাদপদ্ম স্থাপিত হইল। মায়ের কুটীরের তলায়ও সমাধি ছিল। মা বলেন, "এই আশ্রমের প্রায় সব জায়গাতেই সমাধি আছে।"

শ্রীশ্রী মা গুরুপ্রিয়া দিদির পিতা স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে একবার বলেছিলেন, "যাঁরা এখানে আসা যাওয়া করে, তাদের মধ্যে তুমিই প্রথম সন্ন্যাসী হয়েছ। এরপর আর যাদের ভাগ্যে থাকবে, হবে। আর কেমন যোগাযোগ দেখ, রমণার আশ্রমেও প্রথম গিরি সম্প্রদায়ের সাধুরাই থাকতেন। তুমিও গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছ।" মায়ের এই কথায় মনে হয় কনখলের শ্রীমঙ্গলগিরি মহারাজের সঙ্গে রমণার আশ্রমের এই পরম পবিত্র স্থানটিরও সম্বন্ধ ছিল। রমণার আশ্রমের তিন চারটি সমাধি অতি বড় ছিল, যা দেখলেই বোঝা যেত যে এঁরা অতি দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। এঁরা ভারতের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এই সমাধিগুলি সুরক্ষিত ভাবে রাখা হয়েছিল।

একবার বাজিতপুরে থাকাকালীন ভোলানাথ মাকে বলেছিলেন, "আমার একটি বাড়ী করতে ইচ্ছা করে।" এই কথা শুনে মা বললেন, "বাড়ী তো তোমার আছে। ঢাকার গোকুল ঠাকুরের বাড়ীই তো তোমার বাড়ী।" তখনও মা ঢাকা আসেননি। পরে যখন ঢাকাতে রমণা আশ্রম হয়, তখন সেখানকার মোহন্তদের কাগজ পত্র দেখে জানা যায় যে কোন ও সময়ে গোকুলঠাকুর ঐ জায়গার মালিক ছিলেন।

এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে রমণার আশ্রমের এই বিশেষ স্থানটির সঙ্গে বাবা ভোলানাথ, ভাইজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পূর্বজন্মের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

শ্রীশ্রী মা একবার প্রসঙ্গবশত: বলেন, "রমণার আশ্রমের এই জায়গায় পূর্ব্বে ঘোর জঙ্গল ছিল। কোনও সময় লোহাগড়ের রাজা সেখানে শিকার করতে আসেন। সেখানে তিনি এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখেন। তাঁর কাছেই বাঘ ও হরিণ এক সঙ্গে বসে রয়েছে দেখেন। সাধুর দর্শনে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন। সাধুদের সমাধির কাছে একটি জায়গায় পোড়ামাটিও পাওয়া গিয়েছিল। অনুমানে বোঝা যায় যে এখানে পূর্ব্বে যজ্ঞাদিও সম্পন্ন হয়েছে।" পরে ওখানে মায়ের আশ্রম হওয়ার পর ঐ পবিত্র ভূমিতেই যজ্ঞাগ্নি রক্ষিত হয়েছে ও প্রতিদিন হয়েছে। শ্রীশ্রী মা কখনো বলেছিলেন যে ভোলানাথের সাধনার দৃষ্টিতেই ভোলানাথের সঙ্গে মায়ের সিদ্ধেশ্বরী রমণা প্রভৃতি স্থলে যাওয়া হয়েছিল। এই স্থান অতি পবিত্র। ভোলানাথ, ভাইজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পূর্বজন্মের তপোভূমি।

শ্রীশ্রী মা বলেছেন যে পাঁচ হাজার পাঁচশো বছর পর-পর এইস্থানে সাধকেরা এসে তপস্যা করতেন।

(ক্রমশ :)

আশ্রম-সংবাদ

১. বারাণসী —

বারাণসী আশ্রমে এবারে চৈত্র নবরাত্রিতে গত ৮ই এপ্রিল হতে ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিপদ থেকেই এবারে চণ্ডী মণ্ডপে দেবীর ঘটস্থাপন, ভোগরাগাদি, আরতি, কীর্ত্তন, ভজন প্রভৃতি আরম্ভ হয়। পূজার বেদীতে শ্রী বাসন্তী মায়ের মনমোহিনী প্রতিমার দর্শন লাভে সকলে আনন্দিত হন। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্য্যন্ত দেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই শুভ অবসরে কলকাতা হতে প্রচুর মাতৃভক্তের সমাগম হয়েছিল।

এবারের নবরাত্রিতে উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলার স্বনামধন্য সুধী সমাজের অগ্রগণ্য ড: গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের শ্রীদেবী ভাগবত পাঠ। তাঁর সুকণ্ঠের সুললিত অপূর্ব মেধা প্রসূত সুমধুর ব্যাখ্যা শুনে সকলেই মুগ্ধ হন। সকালে পূজার পর স্বামী নির্মলানন্দজীর ভাগবত ব্যাখ্য হত। কন্যাপীঠের কন্যারা প্রতিদিন পূজার সময় কীর্ত্তনের পর নানা রাগরাগিণীতে রামায়ণ গান করতেন।

১৭ই এপ্রিল বিজয়া দশমীর দিন দেবীর বিসর্জনের পর উৎসবের উদ্যাপন হয়। প্রতিবছরের মত এবারও কাশীর মহারাজ কুমার ও মহারাজকুমারীরা এসে উৎসবে যোগদান করেন।

১৩ই এপ্রিল দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষ্যে দিদিমার পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়।

২রা মে হতে ২৬শে মে শ্রীশ্রী মায়ের ১০১ তম জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আনন্দ জ্যোতির্মন্দির ফুল মালা দিয়ে বিশেষ করে সাজানো হয়। পূজা করেন কন্যাপীঠের অধ্যক্ষা ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য। মায়ের শ্রী বিগ্রহে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২রা মে মাতৃ মন্দিরে চণ্ডীর ঘট স্থাপন করা হয় এবং ২৫শে পর্য্যন্ত প্রতিদিন পূজা ও সম্পুটিত চণ্ডী পাঠ হয়েছে। প্রতিদিন মায়ের পূজা, কীর্ত্তন, পাঠ, ভোগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ভোগে বিশেষ করে শ্রীশ্রী মা যা গ্রহণ করতেন, মায়ের সেই ঝোল, রুটি, ক্ষীর প্রভৃতি আলাদা করে কন্যাপীঠের কন্যারা রান্না করে মায়ের ভোগ দিতেন। এছাড়া অন্ন, পঞ্চ ব্যাঞ্জন, মিষ্টান্ন সহ নিত্য মায়ের ভোগ হত।

৯ই মে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শ্রীশ্রী মা, গোপাল, যোগমায়া, শিব ও দিদিমার বিশেষ পূজা ও সাধু সেবা ছিল।

এবারে মায়ের জন্মোৎসবের মধ্যে আরেকটি উৎসবের সূচনা, শ্রীভাগবত সপ্তাহ। মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালের বরিষ্ঠ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: শৈল দুবেজীর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং তাঁরই উদ্যোগে ৭ই মে হতে ১৩ই মে পর্য্যন্ত ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকরণ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত, ড: রামচন্দ্র ত্রিপাঠী। তাঁর সাবলীল সরস ব্যাখ্যা শ্রবণ করে সকলেই আনন্দলাভ করেন। আনন্দ

জ্যোতির্মন্দিরে প্রচুর শ্রোতাদের আগমনে মায়ের জন্মোৎসব বেশ জমে উঠেছিল। মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে সকলে ফিরে যেতেন।

১৪ ই মে হোম, মায়ের বিশেষ পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজনও ভাণ্ডারার পর ভাগবত সপ্তাহের উদ্যাপন হয়। এদিন বাবা ভোলানাথের নির্বাণ তিথি অনুসারে বিশেষ শিব পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়।

২৫ শে সকালে চণ্ডীর হোম হয়। শেষ রাত্রিতে মায়ের তিথি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সাদা বেলী ফুল দিয়ে মন্দির ও হল ঘর বিশেষ করে সাজানো হয়েছিল। পূজার সময় ১০১টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। পূজা, কীর্ত্তন সবই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। পূজার অন্তে প্রত্যেকে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদী রুমাল গ্রহণ করেন।

২৬ শে শ্রীশ্রী মায়ের রাজভোগ সত্যই দর্শনীয় হয়েছিল। সুন্দর আলপনায় সুসজ্জিত মন্দিরে একদিকে মেয়েদের বানানো মিষ্টি সাজানো হয়েছিল। মা যা সশরীরে গ্রহণ করতেন সেই সমস্ত রান্না পৃথক ভাবে এবং ভোগের যাবতীয় রান্না মন্দিরে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছিল। মায়ের শ্রীবিগ্রহ থরে থরে পুষ্পমালায় ভরে গিয়েছিল। পদ্মের মালা শ্রীচরণ পর্য্যন্ত সুশোভিত হচ্ছিল। সারি সারি প্রদীপ প্রজ্বলিত, প্রাণমাতানো কীর্ত্তন, বাজনা প্রভৃতিতে সকলেরই প্রাণে কি এক নবচেতনার সাড়া জেগে উঠেছিল। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছিল। সবশেষে "মৈয়া তেরা বনা রহে দরবার" এই গানের সঙ্গে আরতির বাজনা বেজে উঠেছিল। আরতির পর চণ্ডীপাঠ, প্রণাম মন্ত্রের পর ভোগদর্শন করে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসেন। সকলেই মায়ের পূজার মধুর স্মৃতি নিয়ে ঘরে ফিরে যান।

২. কনখল —

কনখলে মায়ের আশ্রমে যথারীতি ২ রা মে হতে ২৫ শে মে শ্রীশ্রী মায়ের ১০১ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লী, বোম্বে, কলকাতা হতে ভক্ত সমাগম হয়। প্রতিবছরের মত বিশিষ্ট সাধুরা হৃষিকেশের কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরীজী, হৃষিকেশ দিব্য জীবন সংঘের অধ্যক্ষ শ্রী ১০০৮ স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ, সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য বিশিষ্ট মহাত্মারা যথা সময়ে নিজেদের অমৃতময় ভাষণে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। বৃন্দাবনের শ্রী হরগোবিন্দজীর রাসলীলা পার্টীর ভাবময় শ্রীকৃষ্ণ লীলা ও মহাপ্রভু লীলা দর্শন করে সকলেই আনন্দিত হন। সাধুভাণ্ডারা, শতচণ্ডী পাঠ, কুমারী ভোজন, পূজা প্রভৃতিও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের শেষে নামযজ্ঞ। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমধুর 'হরে কৃষ্ণ' নামে আশ্রম মুখরিত হয়ে ওঠে।

৩. রাঁচী

রাঁচীতে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ২৫ শে মে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২৬ শে মে ভাণ্ডারা ছিল। প্রচুর ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৪. পুণা —

পুণাতে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ২৫ শে মে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী মহারাজের ভাষণ একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল। সারা রাত কীর্ত্তন, ভজন ও ভিডিয়ো দেখানো হয়। শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ শে মে ভাণ্ডারা, ভজন, কীর্ত্তন ও ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণ হয়।

৫. ডিব্রুগড় —

আসামে সুদূর ডিব্রুগড় শহরেও শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জন্ম জয়ন্তী উৎসব ২ রা মে ও ২৫, ২৬ শে মে আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ শে মে সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অখণ্ড মৌন, জপ, বিকাল ৪ টা হতে মাতৃপ্রসঙ্গ আলোচনা ও কীর্ত্তন, তিথিলগ্নে রাত্রি ৩ টায় বিশেষ পূজা ও হোম হয়। ২৬ শে মে দুপুর ১২ টায় পূজা ও ভোগারতি, কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

৬. আগরতলা

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের জয়ন্তী উৎসব ২৫, ২৬ শে মে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আলোক সজ্জা, মাতৃপূজা, বিশিষ্ট শিল্পীগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীতানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ, মৌন, প্রভাতী অনুষ্ঠান, উদয়াস্ত সংকীর্ত্তন, ভাণ্ডারা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭. জামশেদপুর —

জামশেদপুরে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে মাতৃভক্তদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২৪ শে ও ২৫ শে মে শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর ভাষণ, ভক্তি সঙ্গীত, ভজনকীর্ত্তন, উদয়াস্ত মা নাম কীর্ত্তন, মায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম, সাধুসেবা ও দরিদ্রনারায়ণ ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ইন্দোর —

ইন্দোরে শ্রীশ্রী মায়ের কোনও আশ্রম না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ভক্তদের উদ্যোগে "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী পীঠে" শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পূজা, ভাষণ, সাধু ভাণ্ডারা ও ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শোক-সংবাদ

১. শ্রীমতী কণিকা রায় চৌধুরী —

এম.পি. জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা কলকাতাবাসী মাতৃভক্ত শ্রী ফণীন্দ্র বিকাশ রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী শ্রীমতী কণিকা রায়চৌধুরী ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে করতে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে সুরলোকে প্রয়াণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত সেবা পরায়ণা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রী মায়েরও সান্নিধ্যে এসে তাঁর কৃপালাভ করেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ৺দুর্গা পূজা ও অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানাদিতে ও সেবাকার্য্যে তাঁদের অবদান প্রশংসার্হ।

প্রার্থনা করি তাঁর স্বর্গতঃ আত্মা চির শান্তি লাভ করুক এবং তাঁর পরিবারবর্গের জীবনে শান্তি নেমে আসুক।

২. শ্রী প্রফুল্লকান্তি গুহঠাকুরতা —

অতি পুরাতন বিশিষ্ঠ মাতৃভক্ত শ্রী ক্ষিতীশ গুহঠাকুরতার পুত্র শ্রী প্রফুল্ল কান্তি গুহঠাকুরতা (হরিদাস) গত ২১ শে এপ্রিল ১৯৯৭, সোমবার সজ্ঞানে শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে লীন হয়েছেন।

এককালে এই যতীশ গুহ, ক্ষিতীশ গুহদের বাড়ীই কলকাতায় মাতৃ সৎসঙ্গের প্রাণ কেন্দ্র ছিল। শ্রীশ্রী মা বহুবার এঁদের বাড়ীতে এসেছেন। কীর্ত্তনে মায়ের ভাব সমাধি হয়েছে এই বাড়ীতে। বুনিদি এই বাড়ীরই কন্যা ছিলেন।

ঢাকার প্রাচীন মাতৃভক্ত শ্রী মনমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রমার সঙ্গে শ্রী প্রফুল্ল কান্তি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

বেশ কিছু বছর ধরে শ্রী প্রফুল্ল কান্তি হৃদয়রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখে সদা প্রশান্তি দেখা যেত। কেউ তাঁর কাছে গেলে অতি আনন্দিত হয়ে মার কথাই বলতেন। মায়ের লীলা কথা বলতে তিনি খুবই ভালবাসতেন।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি আর মায়ের চরণে জানাই যে মা যেন তাঁর পরিবারজনকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

৩. শ্রীতরুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর —

মাতৃভক্ত শ্রী তরুণ ঠাকুর কলকাতার নামযজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রাণপুরুষ গত ১৭ই মে, ১৯৯৭ শনিবার রাত্রি ৩টায় ৭২ বৎসর বয়সে স্বজ্ঞানে 'জয় মা' বলতে বলতে তাঁর সাধনোচিত আনন্দধামে গমন করেছেন। অগণিত মাতৃভক্তবৃন্দ এবং আশ্রমবাসী সাধু, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণীরাও তাঁর এই অকাল প্রয়াণে বিশেষ মর্ম্মাহত।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বংশধর ছিলেন শ্রী তরুণ ঠাকুর। পরবর্ত্তীকালে মাতৃভক্ত প্রণয়লাল গাঙ্গুলীর কন্যা চিত্রার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৪৭ সনে শ্রী তরুণ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী কলকাতায় প্রথম শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন করেন। ১৯৬৮ সনের এপ্রিল মাসে এক স্বপ্নের অনুভূতির বিশেষ প্রেরণায় ওঁনারা কাশী আসেন এবং শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গোপাল মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীমতী চিত্রা ঠাকুর মায়ের কৃপা ও আশ্রয় লাভ করেন। আর শ্রীতরুণ ঠাকুর মার কৃপায় দীক্ষা লাভ করেন ১৯৭০ সনের অক্টোবরে দিল্লী আশ্রমে দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে।

বিভিন্ন সময়ে কলকাতায় বিভিন্ন ভক্ত বাড়ীতে বা আশ্রমে অনুষ্ঠিত নামযজ্ঞে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তরুণ ঠাকুর ছিলেন অগ্রণী। সদা হাস্যময় প্রাণোচ্ছল তরুণ ঠাকুর তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সেবা দ্বারা সকলকে আপন করে নিতেন। ১৯৮৬ সনে চৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষ পূর্তি উৎসবের শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন তরুণ ঠাকুর। ১৯৯৫ সনে শ্রীশ্রী মায়ের শতবার্ষিকীর উদ্বোধনে উভয়ে বাংলাদেশে খেওড়া ও ঢাকাতে আনন্দোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। শতবার্ষিকীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আগড়পাড়া ও পরে কনখলেও তাঁর একান্ত পরিশ্রম ও অবদান প্রশংসনীয়। দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক সম্মিলনী 'আনন্দমিলনী'র তিনিই ছিলেন প্রাণ।

তাঁর প্রয়াণে মাতৃ ভক্তরা হারাল একজন নাম প্রেমী, সংস্কৃতির ধারক, বিশিষ্ট মাতৃগত প্রাণকে। প্রার্থনা করি শ্রী তরুণ ঠাকুরের আত্মা মায়ের কোলে চির শান্তিতে থাকুক এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার ও ভক্তজনকে মা শান্তি দিন।

৪. শ্রীমতী সুধারাণী গাঙ্গুলী—

শ্রীমতী সুধারাণী গাঙ্গুলী, আশ্রমবাসিনী 'সুধাদি' গত ৩ রা জুন মঙ্গলবারে দ্বিপ্রহরে সজ্ঞানে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার নাম উচ্চারণ করে চিরতরে মাতৃ ক্রোড়ে শায়িত হন।

সুধাদি প্রথম জীবনে উড়িষ্যায় মেয়েদের কোনও বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষিকা ছিলেন। সেখান থেকে বৃন্দাবনে আসেন। সেখানে রাধেশ্যাম কুঞ্জে কিছুদিন ছিলেন। তারপর ১৯৭৬ সনে মায়ের আশ্রমে যোগদান করেন। দিল্লী, বৃন্দাবন, দেরাদুন, হরিদ্বার প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রমে দীর্ঘকাল তিনি সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং মার সঙ্গেও বহু জায়গায় ঘুরেছেন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি হোক মায়ের চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

উৎসব-সূচী

১.	গুরুপূর্ণিমা	২০ শে জুলাই, ১৯৯৭
২.	শ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি	১০ ই অগাষ্ট, ১৯৯৭ শ্রাবণী শুক্লা সপ্তমী
৩.	শ্রী মৌনানন্দ পর্বত তিরোধান তিথি	১৫ ই অগাস্ট, ১৯৯৭ ঝুলন দ্বাদশী
৪.	ঝুলন পূর্ণিমা	১৮ ই অগাস্ট, ১৯৯৭
৫.	শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	২৫ শে অগাস্ট, ১৯৯৭
৬.	শ্রীমদ্ভাগবত জয়ন্তী	৫ ই-১২ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭
৭.	শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবী তিরোধান তিথি	৯ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ ভাদ্র শুক্লা সপ্তমী
৮.	স্বামী অখণ্ডানন্দ তিরোধান তিথি	২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ পিতৃপক্ষ সপ্তমী
৯.	মহালয়া	১ লা অক্টোবর, ১৯৯৭
১০.	শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা	৮ ই-১১ ই অক্টোবর, ১৯৯৭
১১.	শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা	১৫ ই অক্টোবর, ১৯৯৭
১২.	শ্রী শ্রী কালী পূজা ও অন্নকূট	৩০ শে ও ৩১ শে অক্টোবর, ১৯৯৭
১৩.	সংযম সপ্তাহ	৭ ই-১৩ ই নভেম্বর, ১৯৯৭

■

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ :—

★ **Pictorial Biography of Ma** — মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র-সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ মূল্য ৩৫০/- ইংরাজি সংস্করণ ৪৫০/-

★ **মাতৃদর্শন** — শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত মূল বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় গ্রন্থ। মূল্য ২৫/-

★ **বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা** — মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত বাংলায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ডা: গীতা ব্যানার্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/-

★ **আনন্দ জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক)** — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনা পঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্বাচিত শত উদ্ধৃতি, মাতৃ-আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী-নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোকচিত্রের বহু-সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/-

★ **In your heart is my abode** — ডক্টর বীথিকা মুখার্জী রচিত ইংরাজিতে মায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত সার এবং শ্রীশ্রী মায়ের শত উপদেশ। মূল্য ২০/-

★ **Matri Vani** — মায়ের অমূল্য উক্তিগুলির ইংরাজিতে সংকলন। হাতে রাখার মত আকার। মূল্য ২০/-

★ **Words of Sri Anandamayee Ma** — মায়ের অতিমূল্যবান কথোপকথন আত্মানন্দ (কুমারী ব্ল্যাংকা শ্লাম) কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজিতে অনুদিত। মূল্য ৩০/-

★ **Mother as seen by her devotees** — বিশিষ্ট বিদ্বৎমণ্ডলী ও শ্রীশ্রী মায়ের প্রধান ভক্তদের ইংরাজিতে লেখা মাতৃ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মূল্য ৩০/-

আবশ্যক সূচনা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ একটি আবাসীয় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কন্যাপীঠের কন্যাদের দেখাশুনার জন্য আধ্যাত্মিক রুচি সম্পন্না ও সেবা পরায়ণা শিক্ষিতা মহিলা আবশ্যক যাঁহারা কন্যাপীঠের আদর্শ গ্রহণ করিয়া শিক্ষারতা বালব্রহ্মচারিণীদের সর্বপ্রকার সেবাভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আশ্রমোপযোগী আবাস এবং নি:শুল্ক ভোজনের ব্যবস্থার সহিত ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসারে ন্যূনতম মাসিক হাত খরচার ও সুবিধা থাকিবে।

অবিবাহিতা এবং সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক বন্ধনমুক্ত মহিলাদের প্রাথমিকতা দেওয়া হইবে।

উপর্য্যুক্ত সেবাকার্য্যে ইচ্ছুক মহিলারা অথবা তাঁহাদের অভিভাবকেরা সম্পূর্ণ বিবরণ সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে সম্পর্ক স্থাপন করুন —

সচিব
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ
ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১০০১

"হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।।"

—শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

★ শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নাম যজ্ঞের ক্যাসেট নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ :

★ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
★ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
★ মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

★ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত দ্বিতীয় ক্যাসেট "আনন্দ সংগীত" প্রকাশনার প্রাক্‌পর্ব্বে আছে।
গায়ক — শ্রী জয়ন্ত পাঠক।

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365)
16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, Maharashtra.
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362)
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082)
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731233, W.B.
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P.
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 310054+311794)
23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, U.P.
24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

मुद्रक—रत्ना प्रिंटिंग वर्क्स, कमच्छा, वाराणसी फोन : 322820

অমৃত বার্তা
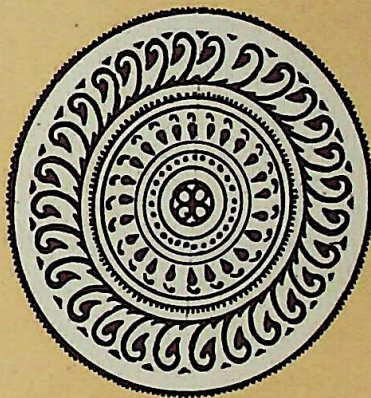
VOL. 1 OCTOBER, 1997 No. 4

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P.
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, Gujarat
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009
U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road,
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P.
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P.
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel:426575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok,
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P.
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir,
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী - অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ-১ অক্টোবর, ১৯৯৭ সংখ্যা - ৪

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে-৬০/- টাকা

বিদেশে — ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা

প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

★ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে । পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয় ।

★ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমুল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য । অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও সাদরে গৃহীত হইবে । নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে ।

★ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক ।

★ বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্নলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম ঃ
Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c

★ পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অর্থাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে-

Managing Editor,
Ma Anandamayee—Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221001

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা--২০০০/- বাৎসরিক ।
অৰ্দ্ধেক পৃষ্ঠা -- ১০০০ বাৎসরিক ।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী-১০ হইতে মুদ্রিত । সম্পাদক-শ্রী পানু ব্রহ্মচারী ।

সূচী পত্র

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়
শিবালা, বারাণসী-২২১০০১

একটি বিশেষ আবেদন

পবিত্র বারাণসী ধামে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার সন্নিকটে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় প্রতিষ্ঠিত মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মনির্বিশেষে গরীব দু:খীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা। শ্রীশ্রী মায়ের অমর বাণী — "কাশী বিশ্বনাথ মুক্তিক্ষেত্র — জনজনার্দ্দন সেবা।"

সেবার কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে —

(১) অসহায় দু:স্থ রোগীদের সর্ব্বপ্রকার নি:শুল্ক চিকিৎসা হেতু একটি স্থায়ী কোষ স্থাপন। **(Medical Relief Fund for the poor)**

(২) রোগীদের আবাসের জন্য আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধাযুক্ত ১২টি অতিরিক্ত কক্ষ নির্ম্মাণ। আনুমানিক ব্যয় ১৬ লক্ষ টাকা। যে কোনও সদাশয় ভক্ত তাঁহার প্রিয়জনের স্মৃতিতে একলক্ষ টাকা দিলে একটি কক্ষ স্থায়ী রূপে তাঁহার নামে উৎসর্গ করা হইবে।

চিকিৎসা সেবার জন্য প্রদত্ত দান আয়কর নিয়মানুসারে করমুক্ত হইবে ইহা বিশেষ উল্লেখনীয়।

উপরিউক্ত যে কোনও উদ্দেশ্যে প্রেরিত অর্থ সাদরে গৃহীত হইবে।

ব্যাঙ্কড্রাফট বা চেক **"Shree Shree Anandamayee Sangha — Mata Anandamayee Hospital A/c"** এই নামে হওয়া আবশ্যক। সংলগ্ন পত্রে স্পষ্ট ভাবে উদ্দেশ্য উল্লিখিত করিয়া রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

Secretary,
Mata Anandamayee Hospital
Shivala, Varanasi-221001

মাতৃ বাণী

সংকলক - চিত্রা ঘোষ

সংসার আশ্রমে বা সন্ন্যাস আশ্রমে সব আশ্রমেই গুরু করণ প্রয়োজন। ইষ্ট, গুরু, মন্ত্র তিনই তো এক। গুরু মূর্ত্তি ভগবানেরই ব্যক্ত মূর্ত্তি।

● ● ●

শিশু যেমন মা অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকলেও থাপ্পড় খেয়েও ছাড়েনা—ভক্ত সন্তানের রূপটিতে এরূপেরই প্রকাশ। বারবার প্রার্থনা কোন্ মুহূর্ত্তে ফলবতী রূপ ধারণ করে।

● ● ●

ভগবানের রাজ্যে সত্যের আশ্রয়ে যে থাকে তার সত্যের দিকই। সত্যকথা মানুষ মন খুলে বুক খুলে যখন বলতে পারে, ভগবানের রাজ্যে ভগবানের দিক্ হওয়ার তার সরল সোজা রাস্তা। মিথ্যা কথা, মিথ্যাভাব যেখানে, সেখানে দুঃখ দ্বন্দ্ব, মৃত্যুর দিক্। মানুষের কর্ত্তব্য অমৃতের দিকে যাত্রা। অমৃতের সন্তান, অমৃতত্বই প্রকাশ হওয়া।

● ● ●

যদি কেউ মাকে সত্যি ভালবাসে তবে নিশ্চয় জেনো যে সে মার খেয়ালে।

● ● ●

নিন্দাটা হইতেছে গোবরের ন্যায়। গোবর এমনি পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উহাই যদি মাটীর সঙ্গে মেশানো হয় তবে সার হয় ও গাছের গোড়ায় দিলে ফুল ফল শস্য হয়, সেইরূপ নিন্দাটা সহন করিলে অর্থাৎ গায়ে মাখিয়া নিলে ফল ভালই হয়।

● ● ●

কেউ কেউ ভাবে যে অতিথি সেবা করা সময় নষ্ট, মার সেবাই আসল সেবা। এ শরীর বলবে যে যারা এখানে শুদ্ধভাব নিয়ে সৎসঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে তাদের জন্য কাজ করা তো জন জনার্দ্দনেরই সেবা করা। এতে পরমার্থ পথেরই সহায়তা হয়।

● ● ●

এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করলে সকলকে বলা হয়, দেশে যা পাওয়া যায় খেয়ে পড়ে শান্তিতে থাকতে পারলেই হলো। বিদেশে যেতে এ শরীর কাউকে বলে না।

● ● ●

ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন, পাঠ ও সৎসঙ্গ এই পাঁচটার যে কোনোটা নিয়ে থাকা পাঁচ তরকারী দিয়ে খাওয়া আর কী? এক তরকারীতে অরুচি হতে পারে!

● ● ●

কাঁদছো কেনো? তুমি সর্ব্বত্র গুরুদেবকে দেখতে চেষ্টা করো। গুরু কি এতটুকু? মনে করো আকাশ বাতাস-গুরু। এই যে বস্ত্র পরেছি এও আমার গুরু, এই ভাবে তিনি আমাকে জড়িয়ে আছেন। আমার হাড় মাংস ইত্যাদি সবই গুরু। গুরু ছাড়া কিছুই নাই। আমার প্রাণবায়ু রূপে গুরু আছেন, এইভাবে সর্ব্বাবস্থায় তাঁকে সবটার ভিতর পেতে চেষ্টা করা।

● ● ●

সকলে যেন মনে রাখে দীননাথ-দীনবন্ধু যেখানে, ভিতরে প্রকাশ হওয়ার রাস্তায় যে ব্রতী, সর্ব্বক্ষণ শান্ত, সৌম্য, প্রসন্ন যেখানে আত্মস্থ ভগবৎ লাভ ইচ্ছার যাত্রায় ব্রতী। যাহার যে প্রাপ্তি লক্ষ্য মনে রাখা।

■

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

—শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

অবচেতন মনের ক্রিয়াকেই অনেক সময় ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়

কথায় কথায় একটি মহিলার কথা উঠিল যিনি বিধবা হওয়ার পর হইতেই এমন একটি অবস্থা লাভ করিয়াছেন যাহার ফলে তাঁহার আপনা হইতেই অনেক তত্ত্বকথা লেখা হইয়া যাইতেছে। তিনি যাহা লেখেন উহার অর্থও তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। মহিলাটি ইংরাজী জানেন এবং যাহা লেখা হয় তাহা ইংরাজীতেই লেখা হয়। মহিলাটি বলেন যে তাঁহার মাঝে মাঝে কিছু লিখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় এবং সেই সময় তিনি কলম লইয়া বসিলেই আপনা হইতেই তাঁহার লেখা হইয়া যায়। লেখাগুলির ভাব গভীর, অদ্বৈত তত্ত্ব পূর্ণ এবং অনেক সময় তিনি এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন যাহার অর্থ তিনি নিজেও জানেন না। তাঁহার বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত পতির আত্মাই তাঁহাকে দিয়া এই সব লেখাইতেছেন। সাংসারিক অশান্তির সময় যখন এইরূপ লেখা হইয়া যায় তখন তিনি ঐ উপদেশ পূর্ণ লেখা পড়িয়া মনে শান্তি পান এবং যে কারণে তিনি উদ্বেগ ভোগ করিতেছিলেন উহাও যেন অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সময় এরূপও অনুভব করেন যে, কেহ যেন তাঁহার পশ্চাৎ দিকে দাঁড়াইয়া আছে বা তাঁহার পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। অবশ্য তিনি কোন মূর্ত্তি দেখিতে পান না, কিন্তু কেহ যে তাঁহার আসে-পাশে আছে এরূপ যেন তাঁহার মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহিলাটি বিশ্বাস করেন যে তাঁহার মৃত পতিই তাঁহাকে যন্ত্র মাত্র করিয়া এই সকল কথা লেখাইতেছেন। কিন্তু লেখাগুলির মধ্যে যে রূপ অদ্বৈত তত্ত্ব পূর্ণ উপদেশ দেখা যায় তাঁহার স্বামীর জীবিতাবস্থায় কিন্তু এ জাতীয় কোন জ্ঞানই তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই। মহিলাটি শ্রীশ্রী মায়ের নিকট জানিতে চাহেন যে কে তাঁহাকে দিয়া এই সকল উপদেশ লেখাইতেছেন।

মহিলাটির বয়স এখন ৪০/৪৫ বৎসর হইবে। তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি বিবাহের পর হইতেই ধর্ম্ম পথে চলিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। ধ্যান এবং আসনাদি তিনি অভ্যাস করিতেন এবং অনেক সময় ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার মনে হইত যে তিনি যেন কোন এক রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন এবং সেখানে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া মা তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন যে যে সকল কথা সে তাহার লেখার ভিতর দিয়া পাইতেছে, ঐগুলিকে তাহার স্বামীর মনে না করিয়া উহা যে তাহার আত্মারই বাণী ইহা যেন সে মনে করিতে অভ্যাস করে। কারণ ঐগুলিকে স্বামীর কথা মনে করিলে তাহার মৃত স্বামীর প্রতিই আসক্তি বাড়িয়া যাইবে এবং উহা তাহার আধ্যাত্মিক পথে চলিবার পক্ষে এক অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া জগতে যখন এক আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই তখন ঐ স্বামীই বা কে? সেও ত ঐ আত্মাই। জগতে যাহা

কিছু দেখা যায়, জানা যায় তাহা যখন এক আত্মাই, আত্মারই বিভিন্ন প্রকাশ, তখন তাহার স্বামীকে অন্তরাত্মা হইতে আলাদা দেখিবার কোন কারণ নাই। আর সে যে সকল উপদেশ পাইতেছে উহার মধ্যেও সে অদ্বৈত তত্ত্বের কথাই পাইতেছে। কাজেই সে এবং তাহার স্বামী যে অভিন্ন উহা ত ঐ উপদেশ হইতেই প্রমান হইতেছে।

মা আরও বলিলেন, লোকে সাধন ভজনাদি যাহা করে তাহার ফলে অনেক সময় তাহাদের কোন কোন গ্রন্থি খুলিয়া গিয়া মনের এমন একটা কথা বলা বা লেখা হইয়া যাইতে পারে যাহা তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন, অথচ উহা তাহার নিজেরই মনের ভাব। মনের এই স্থিতির প্রকাশ নাই বলিয়া যে এগুলিকে নিজের বলিয়া জানিতে বা ধরিতে পারে না।

মুক্তি বাবা। আপনা হইতে যে সকল লেখা হইয়া যায়, যাহার অর্থ লেখক নিজেও জানে না উহা ভৌতিক কাণ্ড। উহা দ্বারা লোকের কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না, কারণ দর্শন শ্রবণের ফলে লোকে যদি বদলাইয়া না যায় তবে উহাকে খাঁটি দর্শন শ্রবণ বলা যায় না।

মা। হাঁ, দর্শন শ্রবণের ফলে লোকে যদি বদলাইয়া যায় তবেই উহাকে প্রকৃত দর্শন শ্রবণ বলা হয়। তবে এই মহিলার বেলায় দেখিতেছ যে সাংসারিক অশান্তির সময় যখন তাহার এই জাতীয় লেখা হইয়া যায় উহার ফলে সে শান্তিই লাভ করে। এইভাবে সে ধীরে ধীরে অদ্বৈত তত্ত্ব প্রকাশের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই জাতীয় কথা আসিতেছে দেখিয়া মৃত স্বামীকেই ইহার কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে এখন কোন কথা নয়। লোকে শোক দু:খাদি যাহা ভোগ করে ভগবান উহার ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রকাশের পথ করিয়া দেন। এগুলি তাঁহার নিগ্রহ কৃপা।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১১॥ টা হইল দেখিয়া দিদি মাকে ভোগের জন্য ভিতরে লইয়া গেলেন। আমিও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

গুরুর আদেশ মত চলিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে অপরাধ হয় না

১ লা অগ্রহায়ণ, শনিবার (ইং ১৭/১১/৫১)

সঙ্কট মোচনের "শিশু কল্যাণে" শ্রীশ্রী মা মাত্র একদিন ছিলেন। আজ বেলা ১০॥ টার পর আশ্রমে গিয়া মাকে হল ঘরেই পাইলাম। পাঠ, কীর্ত্তনাদি সবই তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি যুবক মাকে বলিলেন যে তিনি গুরু হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া কিছুদিন বেশ ভালভাবে সাধন ভজন করিয়াছেন, কিন্তু এখন তাঁহার মনে হইতেছে যে তিনি গুরুর নির্দ্দেশ মত যেন সাধন করিতে পারিতেছেন না। এখন তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য যে সম্বন্ধে তিনি মায়ের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

মা। তোমার গুরুকেই এসব জানান উচিত। তিনি তোমাকে যেমন চলিতে বলেন তুমি সেই ভাবে চলিও।

যুবক। আমার এখন গুরু নাই, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

মা। তোমার কোন জাতীয় প্রতিবন্ধক হইতেছে? গুরুর উপদেশ অনুসারে চলিতে গিয়া তুমি এই বাধা পাইতেছ? না, তোমার নিজের কোন অসুবিধার জন্য গুরুর কথা মত চলিতে পারিতেছ না?

যুবক। আমি গুরুর উপদেশ মতই চলিতেছি, কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে তিনি আমাকে যে ভাবে চলিতে বলিয়াছিলেন আমি সে ভাবে চলিতে পারিতেছি না। যতদিন তিনি দেহে ছিলেন ততদিন ঠিক ঠিক কাজ করিয়া গিয়াছি। তাঁহার দেহ ত্যাগের পর কিছুদিন আমার কাজ ভালই চলিয়াছিল। এখন মনে হইতেছে যে গুরুর কৃপার জন্যই আমি ঐভাবে চলিতে পারিয়াছি। এখন আমার কোন অপরাধের জন্যই বোধ হয় এ রূপ হইতেছে।

মা। কি অর্থে তুমি গুরুর নির্দ্দেশ মত চলিতে পারিতেছ না? তিনি তোমাকে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছেন এবং যেমনভাবে করিতে বলিয়াছেন তাহা কি করিতেছ না?

যুবক। হাঁ, তিনি যাহা যাহা করিতে বলিয়াছেন আমি উহা তেমনভাবেই করিতেছি, কিন্তু মনের চঞ্চলতার জন্য বোধ হয় উহা ঠিক ভাবে হইতেছে না। তিনি যতসংখ্যক জপ করিতে বলিয়াছেন ঐ সংখ্যা প্রত্যহ রাখা হইতেছে না। কোন দিন হয়ত কিছু বেশী হইতেছে আবার কোন দিন কম হইতেছে। সকাল সন্ধ্যায় জপ ও ক্রিয়া করিতে বলিয়াছেন, সকাল বেলাটায় যদিও কিছু হয় কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সময় বসা হয় না। কর্ম্মস্থানে ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়াই উহা হয় না।

মা। গুরু তোমাকে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছেন তুমি যদি তাহা করিয়া যাও, যেমন তিনি তোমাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ দিয়াছেন, তুমি যদি ঐ সংখ্যক জপ করিয়া যাও তাহা হইলেই হইল। মনের চঞ্চলতার জন্য ত তুমি দায়ী নও। চঞ্চলতা মনের স্বভাবই। গুরু যখন উহা স্থির করিয়া দিবেন তখনই উহা স্থির হইবে। তোমার কর্ত্তব্য হইল গুরুর আদেশ মত সংখ্যা রাখিয়া জপ করিয়া যাওয়া। তবে যাহাতে মন একাগ্র হয় সে বিষয়ে তোমার চেষ্টা করা দরকার। সংসারের অন্যান্য কাজে মন স্থির হইতেছে, কেবল এই বেলায়ই উহা স্থির হয় না ইহা ত হইতে পারে না। কাজেই তোমার দিকে অনবরত চেষ্টা থাকিবে মন স্থির করিয়া গুরুর আদেশ মত চলা। তোমার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি মন চঞ্চল হয় তাহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। কিন্তু চেষ্টা থাকা দরকার। চাকুরী কর বলিয়া যদি ঠিক সন্ধ্যার সময় জপ এবং ক্রিয়াতে বসিতে না পার তবে সন্ধ্যার সময় যেখানেই থাক না কেন গুরুকে স্মরণ করিয়া মনে মনে জপ করিয়া লইবে, পরে বাড়ীতে আসিয়াই আবার জপ এবং ক্রিয়াতে বসিয়া যাইবে। সংসার লইয়া থাকিলে কাজের চাপে মাঝে মাঝে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জপে বাধা আসিতে পারে বটে, কিন্তু বাধাটা যেন তোমার আলস্য বা সিথিলতা হইতে না আসে। তাহা ছাড়া রবিবার বা ছুটির দিনে ত ঠিক সময়েই জপ ও ক্রিয়াদি করিতে পারিবে। আরও একটা কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে গুরু নাই

এ কথা হইতেই পারে না। গুরু সর্ব্বদাই আছেন এবং তিনি সর্ব্বদাই কৃপা করিতেছেন। শুধু মনের চঞ্চলতার জন্যই উহা ধরা যাইতেছে না। তাঁহার উপদেশ মত চলিতে চেষ্টা করিলেই একদিন তাঁহার কৃপায় তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে। তাঁহাকে লইয়া থাকাই একমাত্র পথ, আর সকলি ত বিপথ, বিপদ। আমি গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছি না, চলিতে পারিতেছি না-এই চিন্তা করিয়া যে অশান্তি ভোগ করা যায় তাহা ত ভালই। ইহাতে বুঝা যায় যে তুমি চলার পথে আছ। চঞ্চল না হইলে যে অচঞ্চল হওয়া যায় না। তাঁহার জন্যই চঞ্চল হইতে হয় এবং তাঁহার জন্য বিশেষ ভাবে চঞ্চল হইলেই শান্তির পথ পাওয়া যায়।

এইভাবে মা যুবকটিকে কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। যুবকটি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার কথায় প্রকাশ পাইল যে তিনি বাবা বিশুদ্ধানন্দের শিষ্য। তাঁহার পিতাও ঐ একই গুরুর শিষ্য। পিতা পুত্র দুইজন একত্র হইয়া মায়ের নিকট আসিয়াছেন। ছেলেটির নাম শ্রী সচ্চিদানন্দ চৌধুরী এবং পিতার নাম শ্রী ভোলানাথ চৌধুরী।

মা আনন্দময়ীর অমৃত আহ্বান
"হরি কথাই কথা"

(তৃতীয় পর্ব)

— ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

নামই ওষুধ। মা আনন্দময়ীর নামই পথ্য, খাদ্য। শোক-তাপ ও দুঃখ-দৈন্যে জর্জরিত মানুষকে নাম-মাহাত্ম্যে উদ্বোধিত করার জন্যই তাঁর নরদেহ ধারণ। নাম গুণ গানে দেহমনকে উন্মুখ করার জন্য নিজেকে কী করে প্রস্তুত করতে হয়, মা তাঁর সাধনার খেলা'র মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করলেন।

এ প্রকাশ তাঁর নরলীলার আদ্যন্ত। শৈশবে যেমন, লীলা-সংবরণের মুহূর্তেও ঠিক তেমনি; বিপুল জনসমাবেশে বা উৎসবে অনুষ্ঠানে যেমন, নিভৃত আশ্রম-পরিবেশেও তেমনি। কখনও সিমলার কালী বাড়ীতে ভাবে মাতোয়ারা তিনি, কখনও আবার কক্সবাজারে বা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে কীর্ত্তনের বিরাট দল নিয়ে পরিক্রমায় রতা। এ ছাড়া, বিভিন্ন সংযম-সপ্তাহে, জন্ম-জয়ন্তীতে, ভাগবত ও গীতা-সপ্তাহে হরিগুণ গান তাঁকে ভাবস্থ করে।

আজন্ম তিনি পূর্ণজ্ঞানে স্থিতা। হরি-কথাই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান এবং ভক্তদের কাছে উপহার।

১৯৮২-র ২৭ শে আগষ্ট। মা'র শরীর ছাড়ার আগে তাঁর শয্যা শিয়রে দাঁড়ান নির্মলানন্দ স্বামী বলেন, "মা, কী নিয়ে থাকবো?" মা বলেন, "ভগবানকে নিয়ে, ভগবানকে নিয়ে, ভগবানকে নিয়ে।" বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবিকা উদাসজীকে বলেন, "জপ বাড়াও।" পাশে দাঁড়ান অন্যান্য সেবিকারা তখন শুনতে পান, মা খুব ক্ষীণকণ্ঠে কয়েকবার বলছেন, "নারায়ণ হরি" — এই তাঁর শেষ কথা।

অতএব দেখছি, হরি-কথাই মা'র কথা। হরি-স্মরণেই মাতৃস্থিতি। হরি-কথার তাৎপর্য মা নিজেই ব্যাখ্যা করেন একবার। উপস্থিত ভক্তদের বলেন, "হরি মানে, যিনি দুঃখ হরণ করেন। অর্থাৎ, যাহা অমৃতবান। অমৃতবান মানে অমরবান। যাহা অমৃতের পথে নিয়ে যায়। সেই হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা, ব্যথা।"

একবার এক ভদ্রলোক আসেন মা'র কাছে। শোকে মুহ্যমান। তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। ভদ্রলোক কান্নাকাটি করছেন। মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "বাবা, তার জন্য শোক করিও না। তার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। যে চলিয়া যায় তাহার জন্য কান্নাকাটি করিলে তাহার কষ্ট হয়। যদি কাঁদিতেই হয় তবে ভগবানের জন্য কাঁদ। তাহাতে সকল দুঃখের শান্তি হয়। সেই হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা।"

ভগবানের জন্যে কাঁদা কেন? কারণ, একমাত্র তিনিই যে নিত্য! আর সবই যে অনিত্য। সবই যে কালক্রমে হারাইয়া যায়! হারান না শুধু ভগবানই। মা তাই বলেন, "যা' হারায় না তাঁকে ভাববে। সেই মঙ্গলময় ভগবানকেই একমাত্র ভাববে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তাঁর উপর নির্ভর করবে।"

প্রশ্ন উঠবে, কী প্রার্থনা হবে আমাদের? কীভাবে নির্ভরতা আসবে?......প্রার্থনা সম্পর্কে মা কনখল (হরিদ্বার) আনন্দময়ী আশ্রমে এই লেখককে বলেছিলেন, "ভগবানকে বলবে, হে ঠাকুর, আমার মন প্রাণকে তোমার দিকে নিয়ে চলো। আমি যেন তোমার কথাই শুধু ভাবি। তোমাকেই নিয়ে থাকি।"

কীভাবে ভগবানকে নিয়ে থাকা যায়, তারও পথ-নির্দেশ করছেন মা আনন্দময়ী। ভক্তদের বলছেন, "চব্বিশ ঘণ্টা রয়েছে সাধন-ভজনের জন্য।....যতটুকু সংসারের সেবায় সময় দেওয়া হয়, আর বাকী সময় ভগবৎ চিন্তায় রাখা কর্তব্য। জপ, ধ্যান, সৎগ্রন্থাদি পাঠ, পূজা, প্রার্থনা, আত্মনিবেদন, তাঁর জন্যই তাঁকে চাওয়া ও কাঁদা। সৎসঙ্গ অনুকূল হলে চেষ্টা করা, না পেলে সদ্ভাবের বাঁধ সর্বক্ষণ হৃদয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা।" কিন্তু এই চেষ্টা যে প্রায়ই ব্যর্থ হয়, তার কারণ, আমাদের মধ্যে সমর্পণ ভাবের অভাব। আত্মনিবেদনের চেয়ে কর্তৃত্বের দিকেই আমাদের প্রবণতা। আমরা অনুক্ষণ শান্তির সন্ধানে ছুটে বেড়াই, কিন্তু শান্তি কী করে মিলবে, তা নিয়ে ভাবি না। কিছুতেই পূরণ করতে চাই না শান্তির সর্ত্ত। নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি কামনা-বাসনায় জর্জরিত হয়ে ও বাজে চিন্তা করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, আমাদের স্বভাব হয়ে পড়ে মাছির মতো। এই সন্দেশে বসা, পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায়। অর্থাৎ, অধিকাংশেরই ভালো চিন্তা ক্ষণিকের; তপ্ত খোলায় কয়েক ফোঁটা জলের মতো। নিমেষের মধ্যে আবার যে-কে সেই। অর্থাৎ, জীব-স্বভাবের আবর্তে আবার। তাহলে উপায়? মা বলছেন, "হরি-কথায় মন রাখা। যাঁর মন, যাঁর প্রাণ, যাঁর দেহ তাঁকেই সমর্পণ করে শান্তি। দুনিয়ায় শান্তি চাইলে দু:খ পেছনে সঙ্গে থাকবেই। সাধুবৃত্তি অবলম্বনের চেষ্টা, অর্থাৎ সৎভাব, সৎপ্রবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। বাজে চিন্তা করে কেন শরীর ও মন নষ্ট করা? তিনি যাহা মঙ্গল তাই করেন। শুধু বাসনা, চাওয়া নিয়ে কেন দু:খ টেনে আনা? যখন যে ভাবে থাকা, এই ঠিক, এই ভাবেই আমার প্রয়োজন ছিল, এইভাবে রেখেই তিনি আমায় চরণে টানবেন, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা। কেবল তা'কেই হৃদয়ে রাখা।

সন্দেহ নেই, রাখতেই হবে তাঁকে। ভক্তের হৃদয়ই যে তাঁর বৈঠকখানা। কিন্তু হাতে কাজে ও মুখে নাম না নিয়ে থাকলে তিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে অধরাই থেকে যাবেন। যে কাজ করলে ভগবানের চিন্তা জাগ্রত হয়, সে কাজই আমাদের করা উচিত। মনে রাখতে হবে, সেটাই আসল কাজ, কাজের কাজ। আর সবই অকাজ। মা আনন্দময়ীর কথায়, "যে ক্রিয়া করিলে ভগবৎ-ভাব উদ্দীপিত হয় সেই কর্মই কর্ম, আর সব অকর্ম। যে পথে ভগবৎ-ভাব নাই তাহা প্রেয় হইলেও ত্যাজ্য। আর যাহাতে ভগবৎ-ভাব উদ্দীপিত হয় তাহা অপ্রিয় হইলেও গ্রহণীয়।

সত্য লাভের দিকই মানুষের নেওয়া কর্তব্য। শ্রেয়ের পথ, অমৃতের দিক। প্রেয় হইল যাহা আপাত মনোরম, পরিণামে বিষকর, অমঙ্গল অশান্তির দিক, মৃত্যুর দিক।"

কিন্তু আমরা যে প্রেয়কে লাভ করতে অস্থির! অশান্তির জিনিস নিয়ে থেকে শান্তির আশা করাটাই যে আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে! আসল আপন জন যে ভগবান, তিনিই যে 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' তা ক'জন আর মনে রাখি? ক'জন বুঝতে চাই যে দু:খ-দাতা তিনি, আবার ত্রাতাও তিনি? দু:খের অনলে দগ্ধ করে অহরহই যে তিনি আমাদের কাছে টানছেন! এ তাঁর খেলা, আমাদের ময়লা পরিষ্কার করে অমৃতপথিক করবেন বলে। মা'র কথায় "অমৃতের সন্তান, তাঁকেই ভাবতে হয়। তা' ছাড়া যে শান্তির আশা আর নাই, নাই, নাই—যাতে শান্তি পাবে, আবরণ নষ্ট হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে। বিপদ-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন। সেই যে আপন এক মাত্র হৃদয়ের ধন।" "তিনি পরম পিতা, তিনি পরম মাতা, তিনি পরম বন্ধু, সখা, সবই যে একেবারে। সর্বনাম, সর্বরূপ, অনাম, অরূপ তাঁহারই যে। অতএব, যে ভাবে তাঁকে সব সময় মনে প্রাণে স্মরণ করলে শান্তি হয় তাই করা।"

এজন্য ধৈর্য চাই। "বীরের মত ধৈর্যের আশ্রয়ে নিজে শান্ত হবার চেষ্টা।" শান্ত থাকলেই ভগবানের দিকে মনপ্রাণ একাগ্র হয়, তাঁর কৃপালাভের জন্যে ব্যাকুলতা আসে। এদিকে কৃপা সারাক্ষণই বর্ষণ করছেন তিনি। কিন্তু আমরা গ্রহণ করার পাত্রটিকে যদি উল্টে রাখি তো সেই পরম সুধা পাবো কী করে? সংসার—সঙ্ই যার সার তা নিয়েই যে অনুক্ষণ মেতে আছি সব। আসল সুখ যে পরমার্থ পথে তা যে প্রায় কারোই মনে থাকে না। মা আনন্দময়ী তা'ই মনে করিয়ে দেন, "তাঁর কৃপা আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষণ হচ্ছে। তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়।.....সংসার যাত্রায় কেহ কখনও সুখী হয় না। পরমার্থ যাত্রাই পরম সুখের রাস্তা। সেই নিজের পথে নিজে চলবার চেষ্টা করা সেখানে সুখ দু:খের প্রশ্ন নাই—অভিমানশূন্য পরমানন্দের দিক।" সেই আসল দিকে লক্ষ্য রেখে চললে কোনো কিছুরই আর অভাব থাকে না; ভগবানই সব জুটিয়ে দেন। খাদ্য আশ্রয় সব কিছু।

(ক্রমশ:)

■

মাতৃবন্দনা

—শ্রী শিশির মুখোপাধ্যায়

সকলি অসার তুমি মাগো সার দুদিনের এ জীবনে
সবই অনিত্য তুমিই নিত্য বিদিত এই ভুবনে
ভক্তপ্রাণা মা আনন্দময়ী
সাধন সমরে হইবারে জয়ী
সরালে বেদনা দানিলে চেতনা কৃপা করে অচেতনে।

তুচ্ছ ফেলে সদা প্রাণ ঢেলে কৃচ্ছ্রতারে বরণে
তুমি মা শেখালে পথটি দেখালে সত্যানুরাগীজনে।
ভবে ধর্ম্মের সংরক্ষণে
ধর্ম্মার্থীর সম্বর্দ্ধনে
তত্ত্বোপচার দিলে উপহার তুমি মা ভক্তজনে।

মিষ্টভাষিণী ইষ্টদায়িনী তুমি মা আর্ত্ততারিণী
শুদ্ধাচারিণী কৃচ্ছ্রসাধিনী তুমি সন্তাপনাশিনী
মহাশক্তির মহতী প্রভাবে
জীবেরে মজালে তুমি মহাভাবে
ভক্ত হৃদয়বাসিনী তুমি নিত্যসত্য স্বরূপিনী।

বিভু বন্দনে ভেদ খণ্ডনে সর্ব্বভয়নিবারিণী
বাণী গ্রন্থিলে জীবে বন্টিলে তুমি আনন্দদায়িনী।
চিত্তহারিনী মোক্ষদায়িণী
ব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বব্যাপিনী
মহামায়ার অংশভূতা মা প্রণমি তোমারে নারায়ণি।

মননের বিষয় - ভাইজীর প্রথম বাণী

— *জয় মুখার্জ্জী*

"ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারণায় যাহা আনিতে পারি, শ্রীশ্রী মা তাহারই মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার দেহ ও লীলা বিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ। এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্মে ধ্যানে ও জ্ঞানে তিনিই একমাত্র পরম উপাস্য ইহা স্থির করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয় বসাইতে পারিলে পরমার্থ-পথে অন্য কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে না।"

শ্রী মায়ের অনুধ্যানের পরম সহায়ক, ভাইজীর দ্বাদশ বাণী। প্রতি সংখ্যায় এক একটি বাণী মননের বিষয় হিসাবে প্রকাশিত হতে পারে। ভক্তেরা ইচ্ছা করলে নিভৃতে একান্তে বাণীটির মনন নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন ও মাতৃ কৃপায় আরও যা ভাব প্রস্ফুটিত হবে, তা অমৃতবার্তার প্রকাশের জন্যে পাঠাতে পারেন তাতে আমাদের সকলেরই ভাব রাজ্য পুষ্ট হবে। জয় মা।

প্রথমে আমরা একটু আলোচনা করে নিই, মনন মানে কি? মনন হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে মানস জগতে একটা হিল্লোল তোলা, আলোড়ন করা। এটা ভাবের দিক থেকে অনেকটা মন্থন শব্দের সমর্থক। মন্থনে জলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়। মননে আলোড়ন হয় মানস জগতে। দুধের মধ্যে মাখন অপ্রত্যক্ষ ভাবে থাকে। মন্থনে তা দানা বেঁধে বোধের মাঝে প্রতিভাসিত হয়। বিদ্যুতের মত আনন্দ ঝলক তুলে জানিয়ে দিয়ে যায় "আমি আছি", তারপরই সে অরূপে আঁধারে লুকিয়ে পড়ে। সাধক আমার মননে বসে। লক্ষ্য তেমন ভাবে স্থির হলে, মনন তেমন ভাবে অখণ্ড হলে, হৃদয়ের ঘট ভরে ওঠে। পরম ধ্যেয় থেকে পরম আনন্দ মূর্ত্ত হয়ে ধরা দেন। এরই নাম — "তোরা চেয়েছিলি, তাই পেয়েছিস।"

মননের স্তর-ভেদ আছে। তিলে তেল আছে। হাতের উপর রেখে হাত দিয়ে ঘসলে তেল বেরোয় না। শিল নোড়াতে ফেলে পিসলে একটু হড় হড়ে, তেল তেলে হয়। ঘানিতে ফেলে পেসার সময় তেল হুড় হুড় করে বেরোয়। জীবকুল অহরহ রোমন্থন করেই চলেছে, ভাব অনুযায়ী স্তর ভেদে। যার যেমন ভাব, তার তেমন কর্ম, যার যেমন কর্ম তার তেমন লাভ। আমি সারাদিন টাকা, পয়সা, লাভ-লোকসান, আলু, পটল, খাওয়া, ঘুম নিয়ে ভাবি, আমার কাছে তাই নিত্যদিনের সংসার ফুটে ওঠে। এর মধ্যে আইনষ্টাইন, নিউটন এঁরা বিশ্বের রহস্য নিয়ে মনন করেন, তাঁদের কাছে মহাব্যোম থেকে আলোর গতি, মাধ্যাকর্ষণ সব ফুটে ওঠে। ভাইজী, গুরুপ্রিয়াদি এঁরা অখণ্ড, নিরলস ভাবে মাতৃচিন্তায় মগ্ন, এঁদের কাছে তাই মায়ের স্বরূপ ফুটে উঠছে। রুচি লক্ষ্য ও সংস্কারের বিভিন্ন স্তর থেকে মনন হয়, আর তার থেকে সেই পরম আনন্দময়ই ফুটে ওঠেন। কোথাও ক্ষণিকের মাঝে স্বরূপকে আবরিত করে, কোথাও অনাবিল স্বরূপে।

বাণী ভাবের বাঙ্ময় রূপ। বাক্যের মধ্য দিয়ে ভাবের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র প্রকাশিত হয়।

তার অধিকাংশই থাকে অপ্রকাশিত। মননের দ্বারা ধ্যানের গভীরে প্রবেশ হলেই বাণীর পূর্ণরূপ বোধিতে ধরা দেয়। ভাইজীর বাণীর বিষয় "মায়ের স্বরূপ", তাই মায়ের স্বরূপ জানতে গেলে ভাইজীর বাণীর মনন ও নিদিধ্যাসন আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

ভাইজীর বাণীর মননের আগে আমরা একটু চোখ ফেরাই ভাইজীর জীবনদর্শনের দিকটাতে। ভাইজীর সাধনা ছিল স্বরূপ স্থিতি লাভ করা। শ্রীমায়ের স্বরূপ, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ উপলব্ধি করে তাতে লয় হয়ে যাওয়া। শ্রীমা কৃপা করে ভাইজীকে তা পূর্ণভাবে দিয়েছেন। ভাইজী প্রয়াণের আগে বলছেন, "আমি ও মা এক, আমরা সকলে এক।" সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম — এই মহাবাক্যের পূর্ণ অনুভব। সাধকের শরীর ঐ অবস্থায় তখন চিন্ময়। পরমের অনুভবে জ্বর জ্বর। অঙ্গার অগ্নিময় হয়ে গেলে যেমন হয় তেমন ভাবেই সাধকের তনু আর আত্মার ভেদ থাকে না। কিন্তু এততেও সাধকের ক্ষুধা যেন মেটেনা, যে বিশুদ্ধ অহং দিয়ে ভাইজী মায়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন, তাও তিনি মায়ের চরণে গলিয়ে দিতে চান। কারুর অন্তরের কোন চাওয়াইত মা অপূর্ণ রাখেন না। ভাইজীর প্রয়াণের কয়েক মাস পরে মা ভাইজীকে সূক্ষ্মে দেখছেন, মায়ের কথায় "জ্যোতিষের দেহ বস্ত্রাদি শূন্য, শরীরটা যেন ধোঁয়ার মত বেশ উজ্জ্বল, শুভ্র জ্যোতিতে গড়া এক রকম মূর্ত্তি। ধোঁয়া এক জায়গায় জমলে যেমন মূর্ত্ত আকারে প্রকাশ ঐ রকমটা বেশ স্পষ্ট। সাধারণত: কেউ যদি ধরতে যায়, স্পর্শ বোধ হবে না। কিন্তু স্পষ্টই। তোদের স্পর্শের মতই মনে করনা, এইভাবে ঐ মূর্ত্তিটা এর মধ্যেই (নিজ শরীর দেখাইয়া) ব্যাস্, স্বরূপে আর কি? আবার শোন, মিলবার সময় বলা হল খেয়াল হলে সাময়িক আলাদা মূর্ত্ত আকারে প্রকাশ করাও হতে পারে। সেই অবস্থাতেই জ্যোতিষও মাথা নেড়ে স্বীকার প্রকাশ করল।" (মায়ের-কথায় মা পৃ: ৪৩)।

কথার মধ্যে দিয়ে মা এখানে সুন্দর ভাবে নিজের আসল পরিচয়টুকু প্রকাশ করে দিলেন। বললেন ভাইজীর ঐ সূক্ষ্ম শরীর মায়ের শরীরের সঙ্গে মিশে গেল, "ব্যাস, স্বরূপে আর কি?" অর্থাৎ স্বরূপ স্থিতি আর মায়েতে আমির বিলয় একই।

ভাইজী কৈলাসের পথে মানস সরোবরের ধারে মাকে বলছেন, "আমরা এই যে চরণের আশ্রয়ে আছি তার উদ্দেশ্যইত হল স্বরূপ স্থিতি লাভ করা। কেহ ঐ দিকে যাইতে পারিলেই যে আপনার আনন্দ, আমরা যে তাহা বুঝি না, এই দু:খের বিষয়"। (মায়ের কথায় মা, পৃ: ৪২)।

তাহলে আমরা ভাইজীর অন্তরের চাওয়াটার খবর পেলাম, মায়ের কিসে আনন্দ তাও জানলাম। এখন ভাইজীর বাণীর মনন করে আমরা নিজেদের চাওয়াটাকে জ্যোতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলি।

যে স্বরূপের কথা আমরা শুনলাম, তা অখণ্ড, অনন্ত, আনন্দময়, কালাতীত, অব্যয়, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত যুগপৎ। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, কোন নাম দিয়ে রূপ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাকে জানা

যায় না। তাই ঋষিরা বলেছেন "অবাঙ্‌মানসোঽহগোচর", বাক্য মনের অগোচর। শুধু বোধে বোধ দিয়ে, তাঁর সৎ, চিৎ, আনন্দময় সত্তা "অস্তি মাত্র", তিনিইত আছেন, এই বোধ হয়। পাণ্ডিত্যের বাক্য দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না।

তাহলে কি হবে? এই স্বরূপের নাগাল আমরা কি করে পাব? ভাইজী আমাদের এই ভয়ের কথা জানতেন। আমাদের নাম রূপের সংস্কারে সংস্কৃত মন বুদ্ধির কথা জানতেন। তাই প্রথমেই স্বরূপের প্রসঙ্গ না তুলে বললেন "ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা যা ধারণায় আনিতে পারি শ্রীশ্রীমা তাহারই মূর্ত্ত প্রকাশ।" আমরা কিছু মূর্ত্ত হলেই তার অস্তিত্ব ধারণায় আনতে পারি। অমূর্ত্ত হলেই তা হারিয়ে গেছে অনুভব হয়। মায়ের স্বরূপ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যুগপৎ। অমূর্ত্ত, যা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেনি, এমন স্বরূপের ধারণা সাধারণে সহজে করতে পারে না বলে ভাইজী মায়ের মূর্ত্ত লীলা বিগ্রহের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মূর্ত্ত রূপটি যে অমূর্ত্তেরই। যে ঘরে বসে এই প্রসঙ্গটি পাঠ করছি সেই ঘরের হাওয়াতে সূক্ষ্মভাবে জলকণা আছে। Radio & report এ যাকে বলে humidity। কিন্তু হাওয়ার সেই জল ও সাধারণ ভাবে অনুভবে আসে না। সেই সূক্ষ্মজল জমে যখন বৃষ্টি হয়ে পড়ে, তখন তা দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবগ্রাহ্য হয়। এমন করেই অমূর্ত্ত আত্মা মূর্ত্ত হয়ে জগৎ হন। জীব হন। ঈশ্বর বা ভগবান হন।

ঈশ্বর কথাটি এসেছে ঈশ ও বর কথা দুটি একত্র করে। ঈশ মানে প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। যিনি সকলের প্রধান ও বরণীয়। আর ভগবান কথাটি এসেছে ভগ, বান দুটি শব্দ থেকে যার অর্থ ঐশ্বর্য্যবান। ফলে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান, শ্রী ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। শুধু ষড় কেন ভগবান সর্বঐশ্বর্যাপূর্ণ। সেই অনন্ত বিভূতি অখণ্ড, অব্যয় ভগবান যে মানুষের মত দেহ ধারণ করে লীলা করেন একথা সহজে ধারণা হয় না। গীতাতে দেখি ভগবান যেন খেদ করে বলছেন —— মানুষীং তনুমাশ্রিতং মাম্ অবজানন্ত — আমাকে মানুষের মত দেহধারী দেখে সাধারণের মতই মনে করে। তারা আমার ভূত-মহেশ্বর ভাবকে ধারণা করতে পারে না। সত্যিইত মাকেও আমরা আমাদের মত দেহ ধারণ করতে দেখে ক্ষুধা তৃষ্ণার ব্যবহার দেখে, রোগের প্রকাশ দেখে অনেক সময়ই আমাদেরই মত কেউ বলে মনে করেছি। কত সময়ে তাঁর কাজের ও ব্যবহারের মনে মনে বিচার করেছি। ভাইজী তাঁর শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এত তা নয়। শ্রীমায়ের অন্তর্য্যামী রূপ তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। ভাইজী দেখেছেন সকলের হৃদয়ে বসে সকলের সব ভাবের খবর মা জানেন। তারপর দেখেছেন যে রোগ জ্বালা থেকে সব মানুষই পরিত্রাণ চায় সেখানে মাকে রোগ সারাবার জন্যে ওষুধ দিতে গেলে বলেন, "ওদের উপর দ্বেষ কর কেন? তোমরা যেমন এ শরীরটার কাছে এলে চলে যেতে বলি না, ওদেরই বা চলে যেতে বলি কেমন করে। ওরা সাময়িক এই শরীরটাকে নিয়ে খেলা করে চলে যাবে।" আবার ভাইজী কখনও মার কাছ থেকে শুনেছেন, "জেনে রেখ এ শরীরের জন্ম কোন প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয়নি।" ভাইজী এত দেখে নিজের জীবনে অনুভব করে আমাদের বললেন শ্রীমায়ের দেহ ও লীলাবিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হও। যে বুদ্ধিতে আমাদের

মায়ের কর্মের বিচারের দিক এসে যায়, সেই বুদ্ধি দিয়ে স্বরূপ ধারণায় আসবে না। বুদ্ধি যত শুদ্ধ হয়, তত সে নির্বিচার স্থিতি পায়। মা আনন্দময়ীর আনন্দসত্তার ছোঁয়া লেগে জীবন ধন্য হয়ে যায়। তখনই কর্মে ধ্যানে জ্ঞানে তিনিই পরম উপাস্য জেনে সাধক তাঁরই ইচ্ছার বাহক হয়ে জীবনে চলে। সাগরের বুকে ঠাণ্ডায় যেমন স্থানে স্থানে জল জমে বরফের রূপ পরিগ্রহ করে, তেমন করে অমূর্ত্ত আত্মা ভক্তের আকুতিতে তাঁর করুণার রূপ নিয়ে মূর্ত্ত হন। তাই ত মা বলেন, "মা মানে আত্মা, মা মানে ময়।"

শীতের সময় একজন কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালে আগুন পোহাবে বলে। তপস্যা তার। কিন্তু আগুন জ্বলার পর আরও দশজন তাই দেখে এসে আগুন পোহায়, শীত থেকে বাঁচে। ভাইজী, গুরুপ্রিয়াদিদি এঁরা সব তপস্যা করে তাঁদের তপস্যার স্পন্দনে অমূর্ত্তের মাঝ থেকে করুণামূর্ত্তিকে পেলেন। আমরা হীনবল, ক্ষীণ তপস্যা আমাদের, হয়ত কোন তপস্যাও নেই, তবু তাঁদের তপস্যার ফল থেকে ভগবানের করুণা অনুভবের পূর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছি। করুণাময়ের আপন পর কেউ নেই, আগুন যে তপস্যা করেছে আর যে করেনি তাদের দুজনকে ভিন্ন ভাবে তাপ আলো দেয় না। মা ত ময়। সকলের সমান ভাবে মা, জ্ঞানীরও মা, অজ্ঞানীরও মা। জ্ঞানী ভক্ত এটা বুঝে আনন্দে থাকে। অজ্ঞানী এটা না বুঝে সদা ভয়ে থাকে। ভাইজী আমাদের মনের সব অবস্থার কথা জানতেন। তিনি জানতেন যে শিশু বাবা মার আশ্রয়ে থাকে কিন্তু শিশুর সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। আমরাও তেমনি তাঁর আশ্রয়েই আছি, তবু আমাদের সে বোধ নেই। মা যে বলতেন, "তিনি দূরে এই বোধই ত দুর্বুদ্ধি"। ভাইজী আমাদের এই দুর্বুদ্ধির কথা জানতেন, জানতেন আমরা মাকে আমাদের সাময়িক বিপদের ত্রাতা রূপে জেনে তাঁর কাছে যাই। ভাইজী জানতেন যে আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস নেই যে আকাশ বাতাস, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, মন, বুদ্ধি, অহং, সবার স্রষ্টা ও পালক এবং মা অভিন্ন। তিনি জানতেন যে মায়ায় আবরিত বুদ্ধি জীব সংসারে মানুষের উপর, অর্থের উপরই নির্ভরতা পোষণ করে, কিন্তু সমস্ত আশ্রয়ের যিনি মূল তাঁর খবর রাখে না। তাই বললেন, "মাকে আশ্রয় কর।" ফুল ফোটে, ফল হয় মূলের আশ্রয়ে। ফুল ফল তার খবর জানে না অথচ মূলের রসেই তারা ফোটে, মা আমাদের ময়। তিনিই বিশ্বমূল, তিনিই বিশ্বরূপ। তাই মাকে আশ্রয় করা মানে সর্ব্বময়কে আশ্রয় করা। সহজ সত্যটি বোধে এখন নেই তাই আরোপের সাধন। সাধন পরিপক্ক হলে পরমেশ্বরই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয় তা সহজে অনুভব হবে, বোধে বোধ হবে।

জয় ভাইজীর জয়*।

---

* শ্রাবণ শুক্ল ঝুলন দ্বাদশীর দিন পরম শ্রদ্ধেয় ভাইজীর নির্ব্বাণ তিথি শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ বিশেষ আশ্রমে নিয়মিত ভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

— সম্পাদক

মাতৃকা চতুর্থী

—শ্রী অমল কুমার রায়

আকাশ বাতাস মা মা ধ্বনিতে মুখরিত। 'জয় মা জয় মা জয় মা জয়।' শুধু জয় ধ্বনিই নয়, যেন এক আনন্দবার্ত্তা বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষে। অন্তেবাসীর বিহ্বল নয়নে তৃষ্ণা 'কে এই মা।!' জীবনী পড়েছে। অনেক লেখা, অনেক কাহিনী। কতক বিশ্বাস্য, বেশীর ভাগই অবিশ্বাস্য। এক হেঁয়ালীভরা জীবন, সবটাই যেন দুর্ভেদ্য কুহেলিকা। তাঁর প্রকট কালে সমস্ত বিশ্ব ঝুঁকে নুয়ে পড়েছে এই মা-এর চরণ তলে।

১৮৯৬ সালের বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে পূর্ব বাংলার খেওড়া গ্রামে যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল তার স্বরূপ কি ? এ জিজ্ঞাসা সেদিন থেকেই মানুষের মনে। যাঁরা মাকে দেখেছেন, সঙ্গ করেছেন, গুরু রূপে পেয়েছেন, মা যাঁদের অহৈতুকী কৃপা করেছেন শক্তিপাত করে তাঁরা সবাই কৃতার্থ হয়েছেন, কেউ কেউ সিদ্ধিলাভও করেছেন। কিন্তু "......যর্ততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বত:।" এ যুগের বিস্ময়কর দার্শনিক প্রবর ডা: গোপীনাথ কবিরাজও মার স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন ".....নিজ গুণে প্রকাশিত হও.....।" অধ্যাত্মিক মহাকাশে এক বিস্ময় এই আনন্দময়ী মা।

মা এর জন্ম আধিভৌতিক দৃষ্টিতে এক বিস্ময়। মা জন্ম পরিগ্রহ করেছেন কৃষ্ণপক্ষে কেন ? কেন চতুর্থীতে! এই জন্ম, এই জন্ম লগন, এক আর সব জীবাত্মার জন্মের মতন এক সাধারণ নৈমিত্তিক ব্যাপার। অন্তেবাসীর বিস্ময় ভরা কৌতূহল।

অন্তেবাসী আসন পেতেছে মা ধ্যান, মা জ্ঞান, মা জপ, মা জপ্য, মা উপায়, মাই উপেয়। বিস্ফারিত নয়নে বাইরের বিশ্ব কল্পনা মা-ময়, মুদিত নয়নে মা তৎময়। অন্তেবাসী ধীরে ধীরে ডুবে যায় মনের এক গভীর গহনে অন্ধকার রাজ্যে ".....সা নিশা পশ্যতো মুনে:.....।" মনে মা নাম, জিহ্বায় মা নাম...... ধীরে ধীরে জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। বৈখরীর উপাংশু জপও থেমে যায়...... অধ: ঊর্ধ্ব কুণ্ডলিনীতে যোগসূত্রের যেন টান ধরে-মানস জপে চলে মা-মা নাম-আহা কি মধুর, কি মিষ্টি যে নামের তরঙ্গ.......। আবার ফিরে আসে উপাংশুতে। এমনি করে উপাংশু আর মানসে বাক দোলে..... মন দোলে.......।

আসন থেকে উঠে অন্তেবাসী নিজের মনকে দেখে এ মন তেমন নয়। মনে লেগেছে রং। মা রং এ রাঙ্গিয়ে অন্তেবাসীর মনে সেই বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা মা কেন কৃষ্ণপক্ষকে অঙ্গীকার করলেন এই পৃথিবীতে অবতরণের কাল পটভূমিকা! আমার চোখের সামনে মা বিস্ময়কর বিশ্ব সেজে আমার সাথে প্রতিনিয়ত লীলা করে চলেছেন বলে কল্পজগতে আমি ছবি এঁকে চলেছি তাকে ছাপিয়ে মা-এর যে স্বরূপ তাকি সব সময়ই আমার চোখের আড়ালে থেকে যাবে! কোথা

থেকে এ বিশ্ব ভাসছে!

অন্তেবাসী ডুবে যায় ধ্যানে, শোনে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কণ্ঠে: "......নানাছিদ্র ঘটোদরস্থিত মহদীশ প্রভাভাস্বরং চক্ষুরাদি করণ দ্বারা বহি: স্পন্দনে.........."।

এ বিশ্ব যার ছটা 'বহি: স্পন্দনে' তিনি লুকিয়ে আছেন আমাদের চোখের আড়ালে তাই অন্ধকারে। কৃষ্ণপক্ষে তাঁর স্বভাব স্থিতি। আমাদের কাছে ধরা দিতে হলেও তাঁর অটল স্বভাব স্থিতি থেকে তিনি সরে আসেন না। কৃষ্ণপক্ষকে স্বীকার করেই তিনি তাঁর বিভূতিকে ছড়িয়ে দেন দিকে দিকে তাঁর অস্তিবাচক ব্রহ্মঘোষে যা আমরা মা-এর নিজমুখে উচ্চারিত হতে শুনেছি— "আমার আসা নাই যাওয়াও নাই!" মা কৃষ্ণপক্ষকে অঙ্গীকার করেই আমাদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন মানুষী তনুতে।

কিন্তু তিথিটি চতুর্থী কেন? অন্তেবাসীর জিজ্ঞাসা। অন্তেবাসী আসন পেতেছে। মাকে বুঝতে হবে, মাকে পেতে হবে বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে নয়, অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে। উপাংশু জপের উত্তরণ হয়েছে মানস জপে সবার আড়ালে, বহির্দৃষ্টিতে এটি অন্ধকারের শুরু। এটিকে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ ভাবনা কষ্ট কল্পনা নাও হতে পারে।

মহাজনেরা বলেন মাতৃকা ভিন্ন স্বরূপকে পাবার দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। এটি শাব্দিকের দৃষ্টিকোণ। এই দৃষ্টিতেই মাতৃকা আর স্বরূপকে সব চেয়ে স্বচ্ছ ভাবে দেখা যায়। এই মাতৃকা রহস্যই মা আনন্দময়ীর মর্ত্যলীলার হৃল্লেখা। মা-ই মাতৃকা। অক্ষরব্রহ্মের ক্ষরণ মাতৃকারূপে মাতৃকা শব্দের অর্থ মাতা-মা। যে অখণ্ড মহাসত্য জগৎকে প্রকাশ করছে তার স্বরূপভূতা শক্তিই মাতৃকা। মাতৃকা বিহীন প্রকাশ প্রকাশমান নয়। পূর্ণ পরমেশ্বরের যে স্বরূপ, যাকে পূর্ণ অহং বলা হয়, তার অনুভব মাতৃকা ভিন্ন হতে পারে না। এ কথা মহাজনেরা বলেছেন। যা কিনা খণ্ড অহং অর্থাৎ জীবের অহং বোধ তার মূলেও ঐ মাতৃকা। উভয়-এর যে বিশাল তফাৎ তা এই যে পূর্ণ অহং এ মাতৃকামণ্ডল অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্মের যে ক্ষরণ পশ্চাৎ বর্ণ মালায় অ-কার থেকে হ-কার তার সমষ্টিরূপে প্রকাশমান। কিন্তু জীবের অহং-এ আংশিক প্রকাশ।

সেই আংশিক প্রকাশমান স্থিতিতে অন্তেবাসী আসন পেতেছিল কৃষ্ণা প্রতিপদে। সেখানে মানস জপে প্রাণের যে স্পন্দন সেটি প্রাণ ব্রহ্ম যাকে উপনিষদ আমাদের চিনিয়েছেন 'প্রাক্ সংবিৎ প্রাণে পরিণতা।' চৈতন্যের সৃষ্টিমুখে ভাটিয়ে আসার প্রথম পরিণাম। তার স্পর্শে শিহরিত হয়ে উঠেছে অন্তেবাসী, তপ চলছে জোর কদমে। জপের তাপে মাতৃকার ঘুমন্ত বর্ণমালা জেগে উঠে অন্তেবাসীর চক্রে চক্রে গলে পরছে আর সেই 'সংবিৎ প্রাণের' সাথে মিশে ঊর্ধ্বগামী হয়ে উঠছে। ভূতাকাশ থেকে অন্তরে চিত্তকাশে বিদ্যুৎ ফেলছে জ্যোতির উদ্ভাস আর নাদের প্রাণমাতান অলৌকিক বংশীধ্বনি। জপ এসে পড়েছে বৈখরী পেরিয়ে মধ্যমার অবরসন্ধিতে। কালের নিরিখে এটিকে বলা যেতে পারে প্রতিপদ পেরিয়ে দ্বিতীয়া। চলছে তো সবার আড়ালে, জগতের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না সেই অন্ধকারে, সেই কৃষ্ণপক্ষে।

জাপকের উৎসাহের জোয়ার মধ্যমার বর সন্ধি পেরিয়ে জপ এসে পরেছে পশ্যন্তীতে। চিত্তাকাশের সব অন্ধকার ফিকে করে উপস্থিত হয়েছে চিদাকাশ। মা মন্ত্রটিও উধাও। ত্রিক দর্শনের 'চিত্তম্ মন্ত্র' চিন্তনীয়। মা আবির্ভূতা হলেন অন্তরে চিদাকাশে তাঁর ভুবন মন মোহিনী রূপটি নিয়ে। কালও এগিয়ে চলেছে দ্বিতীয়া থেকে তৃতীয়ায়। অন্তেবাসী ধন্য, আসন ছেড়ে উঠেছে। কোন এক অলৌকিক জগতে চলছিল তার সন্ধান মাকে পাবার তপস্যায় যা কি না এই লৌকিক জগতের অন্তরালে এক অন্ধকারের জগৎ সদাই কৃষ্ণপক্ষ। সেখানকার তৃতীয়া তিথিতে ধন্য মেনে অন্তেবাসী আসন ছেড়ে উঠে এসেছে এই লৌকিক জগতে, এই স্থূল বাস্তব জগতে, এই আলোর জগতে। অনেক সিদ্ধপুরুষ এই পাওয়াকেই চরম পুরুষার্থ মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। অন্তেবাসী এখানে কিন্তু মাকে পাচ্ছে না তত স্পষ্ট করে যা পেয়েছিল পশ্যন্তীতে ডুবে। এই জগৎ ব্যবহারে মাকে পেতে গেলে তাকে কল্পনাকে বাহন করতে হয় যদিও তা সত্যসংকল্প, তথাপি একটা প্রযত্নের অপেক্ষা থাকে। আমি চাই বা না চাই এই নিবেট বিশ্বটা যেমন আপনা থেকেই আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখা দেয়, ঠিক তেমনি করে এ বিশ্ব মা হয়ে আমার সামনে আপনা থেকে তো দাঁড়াচ্ছে না। কিছুটা বেদনা নিয়েই যেন এ জগৎটার প্রতি অন্তেবাসীর এক অনীহা উপস্থিত হয়।

অন্তেবাসী আবার আসন পাতে, ডুবে যায় কোন এক ধ্যান মগ্ন সমাধি স্থিতিতে, শোনে উপনিষদের নির্মম ব্রহ্মঘোষ— "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য:।" তোমার কর্ম নয় অন্তেবাসী, পুরুষাকার দিয়ে আমাকে তেমন ভাবে পাবে, আমি যাকে বরণ করি সেই আমাকে সেই ভাবে পায়......মামেকং শরণং ব্রজ। কাল পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, পড়েছে চতুর্থীতে অন্তেবাসীর কাতর প্রার্থনা 'শরণাগতোহং শরণাগতোহং শরণাগতোহং শরণং প্রপদ্যে।' চোখ মেলে চেয়ে দেখে চিদাকাশে পশ্যন্তী বাক নয়, এই ভূতাকাশে, অন্ধকারের আলোয়, পরাবাক্ স্বয়ং মাতৃকা কি না, মা আবির্ভূতা হলেন এই ধরণীর ধূলায় খেওড়া গ্রামে।

মা বলেন— 'আমার আসাও নাই যাওয়াও নাই।' এই আসা যা কি না, আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে, অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অন্তেবাসীর অনুভবে তা নিত্য, যখন বাক এর উত্তরণ তার চতুর্থপদে, কিনা, চতুর্থীতে এসে পৌঁছায়— বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী পেরিয়ে অতি অন্ধকারের সুড়ুঙ্গের পথ ধরে কি না, কৃষ্ণপক্ষে। এই পরাবাকেই তিনি ফিরিয়ে দেন অন্তেবাসীকে তার হারান সত্তা যা মাতৃকামণ্ডলীর পূর্ণ প্রকাশময়— তখন অন্তেবাসী তার স্বরূপস্থিতিতে মাকে পায় হৃদয় দিয়ে আর তাই-ই হয়ে যায়। মাতৃকা রহস্যের এমনই মহিমা।

আমরা বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীকে 'মাতৃকা চতুর্থী' বলে অভিহিত করে মাতৃকার স্বাক্ষর বহন করতে পারি না কি?

■

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী——

একবিংশ শতকে তাঁর জীবন ও বাণীর প্রভাব

—শ্রীমতী ফাল্গুনী সেনগুপ্ত

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

মায়ের পরিচয় মা নিজেই। মা যদি নিজে নিজের আত্মপরিচয় না দিতেন তবে কারো সাধ্য বা সাধনে সেই পরিচয় জানা সম্ভব ছিল না। মা বলেছেন——"এই শরীর কাহার নিকট হইতে সাধন পাইল? কে ইহাকে পথ বলিয়া দিল? দীক্ষা তো নিজেই নিজেকে দিল। পূজা, মন্ত্রজপ যাহা কিছু হইল সবই তো নিজের ভিতর হইতে আসিল, আগন্তুক কেহ আসিয়া ইহাকে তো কিছু বলিয়া গেল না। এই শরীরের সাধন সম্বন্ধে তো অনেকবার বলা হইয়াছে যে ইহা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়।"

পৃথিবীর জীবকুল ক্রমশ: একবিংশ শতকের দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ পৃথিবীর মানুষের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে——প্রথমটি আন্তর্জাতিকতার পথ আর দ্বিতীয়টি——আত্মহনন তথা ধ্বংসের পথ। নিশ্চিতভাবে আমরা দ্বিতীয়টির পরিবর্তে প্রথমটিকে বেছে নেব। আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে, মঙ্গলের জন্য প্রতিটি জাতিকেই আত্মত্যাগের পথটি গ্রহণ করতে হবে। জীবনের চরম তত্ত্ব উপনিষদ আমাদের জানাচ্ছে——

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ: কস্যাসিদ্ধনম্।"

সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের বাসস্থান। অন্যের ধনের প্রতি লুব্ধ না হয়ে ত্যাগের পথেই ভোগ করতে হবে। মা বলেছেন——"গুরু কি এতটুকু জিনিষ। মনে করো এই আকাশ বাতাস গুরু। যে দিকে যা দেখি সবই আমার গুরু। এইভাবে আমাকে জড়িয়ে আছেন। আমার হাড়, মাংস, আমার প্রাণবায়ুতেও গুরু। গুরু ছাড়া কিছুই নাই। গুরু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু ব্যাপিয়া আছেন।"

"শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী" একটি অচিন্ত্য, অকল্প ধ্বনি। ঐ "মা" নামের প্রভাব লোকালয়ে এবং লোকাতীতে চিরন্তন। মায়ের জীবন ও বাণী জীবের চলার পথের ঔষধ ও পথ্য। যতদিন এগিয়ে যাবে, মানুষ যত গভীরভাবে মাকে নিয়ে চিন্তা করবে ততই মানুষ ঐ নামের প্রভাব ও সম্ভাবনা থেকে ফুল ফল সমেত নানাভাবে কেবল আনন্দিতই হবে। ভগবানকে নিয়ে চিন্তা, ভগবানকে পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ, তা কি ভাষার দ্বারা ছন্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? তবু একথা আজ বলতেই হবে মায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাব অত্যন্ত সুফলদায়ক। খুব বেশী দূরে নয়——মায়ের চিন্তা করলে সামনের একবিংশ শতকে মানুষ হয়ত একটি চিরসুন্দর জীবনের

পথের সন্ধান লাভ করবে।

(১) "মা" শব্দটির উচ্চারণ সকলেই করে। মানুষের ভাষা বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু ভাব এক। মা বলেছেন "ভাষা ভাসা-ই।" ঐ ভাসা হলো অজ্ঞানতায় ভাসা। "মা" শব্দটিই ব্রহ্ম। ঐ শব্দে জগৎ মুগ্ধ হতে পারলে কোন ভাষার সীমা রেখা তাকে সীমিত করতে পারবে না। মায়ের অমৃতবাণী রয়েছে— "জগৎ ভাবময় আনন্দময়। সৃষ্টবস্তু সকলই ভাবের মূর্তি, আনন্দের মূর্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজেকে জাগ্রত করে তুলতে পারো, দেখবে ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র একই খেলা চলছে— আনন্দের খেলা। ঈশ্বর যে আনন্দময়। ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্তত: হাতড়ায়। তাই তো বুঝতে পারে না প্রকৃত তত্ত্ব।" একবিংশ শতকে সভ্যতার আর এক ধাপে এসে মানুষ যদি মায়ের বাণীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে তাহলে দেখতে পাবে, "সৃষ্টবস্তু সকলই ভাবের মূর্ত্তি।"

(২) মায়ের জীবনটাই একটা বাণীরূপ। কন্যারূপে, কুলবধূরূপে, তাঁর সংসারে চলা যেন এক অনাসক্ত অভিনয়। মায়ের আচরণ আমাদের শিক্ষা দেয় যে সমাজ সংসার সব কিছুকে স্বীকার করেই মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। মা বলেছেন— "এ শরীর তো সর্বদাই বলে যে ছোটবেলায় এ শরীরের গুরু ছিলেন বাপ-মা। পরে যখন বিবাহ দিলেন তখন বাপ-মা-ই বলিয়া দিলেন যে স্বামী গুরু। কাজেই বিবাহের পর স্বামীই গুরু হইলেন। তাহার পর জগতে যা কিছু সকলেই এ শরীরের গুরু। সেই অর্থে বলিতে পারি যে আত্মাই গুরু অথবা এই শরীরই এই শরীরের গুরু।" পরিবার জীবন থেকে সকলের মধ্যে নিজ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধকেই মায়ের জীবনে প্রকৃত সম্বন্ধ বলে মা দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সকলের আত্মা এক। সেই আত্মার সঙ্গেই মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে শিক্ষা লাভ করতে পারব। বিশ্ব হবে পরম আত্মীয়।

(৩) পৃথিবী প্রার্থনার স্থান। দ্বন্দ্বমূলক এই পৃথিবীতে একবিংশ শতক আসতে আসতেই কি আমাদের সকল দু:খ-দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যাবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— "যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ পরে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আৎকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলছে; বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারোর ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না।" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কত চুক্তি আর সম্মেলন হয়ে গেছে। তবুও পৃথিবীর বুক থেকে রক্তাক্ত যুদ্ধের অবসান ঘটেনি। এর মূল কোথায়? বিশ্বচৈতন্য আজও জাগরিত হয়নি। মা বলছেন— "তোমরা তো অভাবের স্বভাবে আছ। তোমরা যা কিছু নিয়ে আছ সবই অস্থায়ী। তাই দু:খ পাও। যা থাকে না, তাই নিয়ে থাকাই হচ্ছে অভাবের স্বভাব। দু:খ পাবে না কেন? সুযোগ পেলেই তো তোমরা মালিক হয়ে বস। মালিক না হয়ে মালী হও। তবেই আর ইহসংসারের দু:খ পাবে না।"

মা-চৈতন্যদায়িনী।

(৪) মা-ই পরাজ্ঞান। তাঁর কাছে ছোট বড় নেই। জ্ঞানী অজ্ঞান সকলের মা যে তিনি। তিনি সকলকে ডেকে বলেছিলেন, "তোরা কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস্? আমার ভিতরে আয়, অন্তর রাজ্যে প্রবেশ কর।" "মনের গেরুয়াই আসল সন্ন্যাস।" মা অভয় দিয়েছেন— "যত কঠিনই হোক অন্তর খুঁড়লে জল মিলবেই। দেখ না খেজুর গাছ প্রথমে কাটলেই কি আর রস বের হয়? কাটতে কাটতে ঝর্ ঝর্ করে রস পড়ে।"

(৫) আদর্শের পথ থেকে আজ মানুষের বিচ্যুতি ঘটে চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে মানুষ কোথায় দাঁড়াবে? বিশ্বকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে হলে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শকে পূর্ণ সার্থকতা দিতে হলে আজ মায়ের অমৃতবাণীই পাথেয়— "সর্বকর্মের মধ্যেই উদ্দেশ্যটা বড় রাখতে চেষ্টা করবে। ধ্যান যত বড় রাখবে ততই সেই জ্ঞান পাওয়ার আশা। তুমি আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধর— সিদ্ধকাম হবেই।"

(৬) বিশ্ব কর্মময়। কর্মের মধ্য দিয়েই ধর্মলাভ করা যেতে পারে। মা বলেছেন, "এইজন্য সাধন মার্গে যারা চলছে সর্বদা খেয়াল আমার ত্রুটি যেন না থাকে। সমস্ত কর্মের মধ্যে চেষ্টা। এতে কর্ম ক্ষয় হয়। মনে করো 'কর্মরূপে' তুমি আমার কাছে। কর্মকে পুরো করা। যে কর্ম নিয়েছি তা পূর্ণ করতেই হবে এই-ই আমার কর্তব্য। তখন ভগবানই ঐ কর্ম পুরা করে দেন। ফলদাতারূপেও ভগবান স্বয়ং। যার যেখানে যা প্রাপ্তি ভগবান তা সংযোগ করে রেখে দেন।" মা বলেছেন, "পারি না বলে দূরে সরে থাকতে নেই। করতেই হবে। মানুষের পক্ষেই সব সম্ভব।" এভাবে মায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাবে দুর্বল মানুষ আত্মবলে বলবান হতে পারবে।

(৭) বর্তমান সভ্য জগতের অস্ত্রসম্ভার ও রাজনৈতিক বেড়াজালে সাধারণ মানুষ বড় অসহায়। সমাজ অর্থনীতি সবই যেন এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধার শিকার। এক্ষেত্রে যুগে যুগে বিশ্বকে রক্ষা করেছেন স্বয়ং ভগবান। অসহায়ের সহায় ভগবান। মা বলেছেন, "শিশু ঘুমিয়ে পড়ে রয়েছে আর মায়ের সেদিকে কোন খোঁজ নেই এ কখনো হয়?" "কেবল শিশুর মতো চাই বিশ্বাস। অভ্যাসের দ্বারা গড়ে ওঠে বিশ্বাসের ভিত্তি। শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হলে সরল প্রার্থনা আসে। প্রার্থনা সত্যিকার ভাবে জাগলে কৃপা করে তিনি প্রকাশ পান ফলস্বরূপে।" চিরজাগ্রত বিশ্বাতীত পরম সত্যকেই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা বলেছেন, "নারায়ণ! পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।" নরের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল, সেই নারায়ণ। এভাবে মানুষ যখন আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই মানুষ এক পরম সত্তায় চিৎস্বরূপ।

(৮) "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।" যে বিদ্যা লাভ করলে মুক্তি লাভ করা যায় সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। কিন্তু ভগবান ছাড়া সেই বিদ্যা লাভ করা যায় না। মা বলেছেন— "বাইরের পুস্তক পড়া যায়, এ যে ভিতরের পুস্তক। নিজে পড়া সম্ভব নয়। গুরু তা পড়িয়ে দেন, যদি গুরুর মতো গুরু হন।" দার্শনিক প্রশ্নাদির উত্তর পেয়ে একদা দার্শনিক ডাঃ মহেন্দ্র সরকার

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — "মা আপনি দর্শন পড়েছেন?" মা উত্তর দিয়েছিলেন — "কেন বাবা?" ডা০ মহেন্দ্র সরকার পুনরায় বললেন — "এটা কি করে হয়?" মা উত্তর দিয়েছিলেন — "বাবা একটা বিরাট গ্রন্থ আছে। সব রকম জ্ঞানই তার অন্তর্গত। সেই গ্রন্থের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তাঁর কাছে তোমাদের বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের কিছুই অজানা থাকে না।" সুতরাং মা'কে জানলে সবই জানা যায়। মা বলেন, "এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।" তিনিই যে সর্বমঙ্গলা মা সে কথার স্পষ্ট দ্যোতনা এই বাণীর মধ্যে রয়েছে। মা আরও বলেছেন — "তাঁকে ডাকা, তাঁকেই পাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা মানুষের কর্তব্য। সব সময় তাঁরই কোলে তাঁরই বুকে 'মা'-টিরই মধ্যে।" মাকে পেলেই সব পাওয়া যায়। পৃথিবীর মানব সন্তান অমৃতের সন্তান। অমৃতময়ী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাকে নিশ্চয়ই মানবকুল লাভ করবে। মা আমাদের অমৃতবাণী দিয়েছেন — "তুমি আমাতে নিত্য আছই — প্রকাশিত হও।"

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিনী। মা'কে কিংবা মায়ের অচিন্ত্য প্রভাবকে প্রকাশ করতে পারে এমন কোনও ভাষা মানুষের জানা আছে বলে আমার মতো অধমের জানা নেই। মায়ের ভাষাতেই বলতে হয় — "ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না। কারণ স্বভাব বলতে গেলেই এসে পড়ে অভাব। ভাষার মধ্যে তাঁকে আনতে গেলেই তিনি হয়ে পড়েন খণ্ড। তবে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে বলা হয় সৎ- চিৎ- আনন্দ। তিনি আছেন তাই সৎ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাই চিৎ। আর এই সৎ এর জ্ঞান হলেই তিনি আনন্দ। সত্য বস্তু জানলেই আনন্দ। তাই সৎ-চিৎ-আনন্দ। কিন্তু স্বরূপত: তিনি আনন্দ ও নিরানন্দের ঊর্ধ্বে।" "মা ডাক ডাকার জন্য শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন হয় না।" দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করাই মানবের শেষ গন্তব্যস্থল।

একবিংশ শতক মায়ের ইচ্ছায় জগতে বয়ে আনুক এক অচিন্ত্য মঙ্গল। মা চিরকাল মধুর। মা বলেছেন — "এখন আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে আমি চিরকাল সেই একই আছি।" "চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, সবই চিন্ময়। আকার প্রকার প্রকাশ সবই চৈতন্যময়।" "ওঁ তৎসৎ"

* লেখিকার এই প্রবন্ধটি অখিল ভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৫০০০/- টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

"ধরায় যখন দাওনা ধরা হৃদয় তখন তোমায় ভরা"

— *চিত্রা ঘোষ*

জানুয়ারী, ১৯৬০

এলাহাবাদে অর্দ্ধকুম্ভে মার পদার্পণ ১৩.১.৬০। মা বিন্ধ্যাচল থেকে রেণুদির পিতা স্বর্গত নীরজবাবুর বাড়ীতে এলেন। মা নিত্য সকালে রেণুদিদের বাড়ী থেকে ১১ টা নাগাদ কুম্ভমেলায় আমাদের আশ্রমের ক্যাম্পে যান ও মেলায় সারাদিন ও রাত ৯ টা অবধি থেকে জর্জ্জটাউনে বিন্দুদা, বীথুদি, রেণুদিদের বাড়ীতে ফিরে আসেন। রেণুদির বাবা নীরজবাবু অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে দুপুরে ঘুমের মধ্যে মারা যান, তাই রেণুদির মা অচঞ্চলাদির ও পরিবারের সকলকে সান্ত্বনা দিতেই নিজের খেয়ালে মার গতিবিধির এই ব্যবস্থা। রেণুদির মায়ের নামটীও মারই দেওয়া, নামটীর সার্থকতা তাঁর চরিত্রে পরিস্ফুটিত।

আজ সকালে ৺নীরজবাবুদের গোলাপের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মা একটি ঘটনার কথা বলেন। নীরজবাবু যেদিন মারা যান এলাহাবাদে, সেদিনই দুপুরে মা বিন্ধ্যাচলে শোওয়া অবস্থায় রেণুদির বাবাকে শরীর ছাড়ার পর সূক্ষ্মে মার সামনে দেখেছিলেন। মা বললেন, "বাবাকে স্পষ্ট দেখলাম এ শরীরের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে যেন বলছে, "আমার জাগতিক এই কর্ত্তব্যটুকু বাকী আছে।" মা বললেন বাবার বলার মধ্যে এ জাতীয় ভাব, যে এটা হয়ে গেলেই যেন বাবার মুক্তি......।"

"এ শরীরটা বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ফোকস্ (মার বলা শব্দ) হয়ে বাবার ঘর, বাড়ী, স্ত্রী, সন্তানদের দেখছি। বাবা যেন ঘাড় ঘুরিয়ে এদের প্রতি কর্ত্তব্য এই ভাবে এ শরীরকে দেখিয়ে দিচ্ছে।" বিন্ধ্যাচলে যখন স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্রীমার কাছে রেণুদির মা দেখা করতে যান তখন প্রাইভেটে মা ওকে বলেছিলেন কী জাগতিক কর্ত্তব্য বাকী রয়ে গেল ? প্রথমটা অচঞ্চলাদি মনে করতে পারেন নি। পরে আবার মাকে এসে বলেছিলেন যে গত এক মাসের পেন্সন আসছে না বলে চিন্তিত ছিলেন এবং ক'দিন ধরে সে বিষয় নিয়ে মানাসিক দুশ্চিন্তা করছিলেন। সুস্থ মানুষ হঠাৎ তো মারা যান ঘুমের মধ্যে। মা এসব শুনে বলেছিলেন, "শীগ্গির তুমি বিন্দুকে ফোন্ করে ওটা পাবার ব্যবস্থা করতে বলো।" আজ বাগানে মা বেড়াতে বেড়াতে এ কথা আবার বলায় বিন্দুদার মা বলল যে মার কথায় বিন্দু অল্প চেষ্টায় ঐ টাকা যা এতদিন আটকে ছিল পেয়ে গেছে। যেদিন বিন্দু সন্ধ্যে বেলা ঐ টাকা ওর মাকে দিয়ে বলেছিল ওর বাবার উদ্দেশ্যে "তৃপ্ত হও" অমনি নাকি অচঞ্চলাদির শরীরের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুতের current pass করে গেলো। পরমানন্দ স্বামীও বাগানে তখন উপস্থিত ছিলেন। উনি এসব শুনেই বলে উঠলেন—"এই ঘটনার সময় আমি বিন্দুদের বাসায় বসেছিলাম এবং দেখলাম অচঞ্চলাদির চেহারা কেমন যেন বদলে গেলো। মা এসব শুনে বললেন, "৪২ বছরের বন্ধন মোহ মায়া connection সব cut off (তোমাদের কাছে শোনা শব্দ) হয়ে গেল। বন্ধনটা কেটে গেল তাই

অচঞ্চলামার শরীরে বিদ্যুতের শক্ ঝাঁকি লেগেছিল।"

রাতে মা আরো বললেন, "নীরজবাবা চিরকাল চেষ্টা করে গেছে এ শরীরের আদেশ পালন করে যেতে।" মা আরো বলে উঠলেন, "বড় মেয়ের বিষয় বাবাকে যে আদেশ এ শরীরের খেয়ালে বলা হয়েছিল বিনা দ্বিধায় তার পালন করেছিল। সব সময় এ শরীরকে বলতো নীরজবাবা, 'মা, তোমার আদেশ যেনো কখনো অমান্য না করি।'

সে রাতে মা আরো বলেছিলেন— "কাউকে দেখলে আনন্দ....কারুর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ, কারুর অপেক্ষা রেখে আনন্দ, এতে সাধকের বাধার সৃষ্টি হয়, বাধক। এক- কে নিয়ে যাত্রা পরমানন্দ-ব্রহ্মানন্দ-আত্মানন্দ নিরপেক্ষ আনন্দ লাভ করা। এক জায়গা খুঁড়তে খুঁড়তে জল পাওয়ার চেষ্টা করছো, জলের বদলে পাথর পেলে পাথর কী ভাবে সরাবে? কেউ এসে তোমাকে দেখিয়ে গেল এইভাবে সরাও। সাধনার জীবন শুষ্ক লাগে, কিন্তু চেষ্টা করে যেতেই হবে। যদি সত্যি এক লক্ষ্য তোমার থাকে তুমি যেখানে অপারক "তিনি" নিজে এসে পূর্ণ করে দেবেন। মহাপুরুষদের বাণীতে বিশ্বাস রাখা চাই। ঘোরাঘুরি না করে যতক্ষণ প্রকাশ না হয় পড়ে থাকা। নানা জায়গায় খুঁড়ে লাভ নাই—এক জায়গা খুঁড়তে খুঁড়তেই জল আসে—আসবেই।"

শ্রীশ্রী মা ও আমার স্মৃতিকথা

(দুই)

—শ্রীমতী সান্ত্বনা সেন

১৯৪২ সন। আমার মেয়ে ভবানীর বয়স যখন সাড়ে সাত বৎসর। তখন একবার শ্রীশ্রী মা ঢাকায় তাঁর রমণা আশ্রমে এসেছিলেন, কোন কারণে সে খবর পাই নি। পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলা একদিন সকাল ১০টার সময় এসে বললেন, আনন্দময়ী মা ২/৩ দিন হয় ঢাকায় তাঁর আশ্রমে আছেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করছিলেন, তোমরা কেউ দিল্লীর ডাক্তার জে.কে. সেনের মেয়ে কোথায় থাকে জান কি? সে এবার দেখা করতে এলো না। তাকে একটু খবর দিও আমার সাথে দেখা করতে।

আমি ঐ ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আজই শ্রীশ্রী মা চট্টগ্রাম রওনা হয়ে যাবেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন মতেই যেতে পারলাম না। মন খুব খারাপ লাগল। ভবানী স্কুলে, আর তার বাবা রুগী দেখতে গেছেন। বার বার মনে হতে লাগল হঠাৎ শ্রীশ্রী মা আমার খোঁজ করলেন কেন?

এই ঘটনার কয়েক মাস পর আমার মেয়ে ভবানী "টাইফয়েড" রোগে ২৯ দিন ভুগে আমাদের মায়া ছেড়ে চলে গেল। তখন আমার মনে হতে লাগল শ্রীশ্রী মা হয়ত এমন কোন নির্দ্দেশ দিতেন বা আশীর্ব্বাদ করতেন যাতে আমার ভবানীর অকালে চলে যেতে হত না।

আমার দাদা শিশির কুমার সেন ছিলেন I.C.S. অফিসার। এখনও সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। বয়স হ'ল ৯৩ বৎসর। তিনিও শ্রীশ্রী মার ভক্ত আর মণিবউদি শ্রী অরবিন্দের শিষ্যা ছিলেন।

ভবানীর মৃত্যুর একমাস পর আমার মার সাথে কাশীতে গিয়েছিলাম। দাদা তখন রেলের Auditor General। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য কলিকাতা হতে অফিস কাশীতে চলে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রী মা এলাহাবাদে (ঝুসী) একটা আশ্রমে ছিলেন। আমার বাবা কাশীতে এসে আমার মা ও আমাকে শ্রীশ্রী মা'র কাছে নিয়ে গেলেন। বাবা ভবানীর মৃত্যুর কথা জানালেন। শ্রীশ্রী মাকে অনুরোধ করলেন আমাকে দীক্ষা দেবার জন্য। যদি তাতে আমার শান্তি হয়।

শ্রীশ্রী মা বললেন, "ভবানী ফুল ছিল। তাকে ভগবানের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম তার কি যাবার সময় হয়েছিল? না চিকিৎসা বিভ্রাটে চলে যেতে হ'ল?

মা বললেন— সময় হয়েছিল।

এলাহাবাদে (ঝুসী) আশ্রমে আমরা প্রায় ১৫ দিন ছিলাম। একদিন রাত্রে কীর্ত্তনে আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু ভবানীর কথা মনে করে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। সেই সাথে বুকেও ব্যথা বোধ করছিলাম। হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রী মা ভাবের ঘোরে কীর্ত্তন করতে করতে পেছন দিয়ে এসে আমাকে স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শ পেয়ে আমার কি রকম একটা অনুভূতি হ'ল। মনে হল আমার অসহ্য কষ্টটা কেমন করে হঠাৎ কমে গেল।

আমাকে মন্ত্র দেবার আর কোন কথা হ'ল না। আমি ভাবলাম, আমার তো ভগবানের দিকে মন যায় না, তাই হয়ত শ্রীশ্রী মা আমাকে দীক্ষা মন্ত্র দিচ্ছেন না। উনি তো অন্তর্য্যামী।

রোজ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী মা একটা বড় ঘরে বসতেন। নানা রকম ভাল আলোচনা হত। ঐ সময়টা খুব ভাল লাগত। একদিন মা নিজের ঘরে যাবার সময় বলে গেলেন, "আগামীকাল ভোর ৫টায় স্নান করে আমার ঘরে চলে এসো।"

ঐ দিন (খুব সম্ভবত ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ সন) শ্রীশ্রী মা আমাকে দীক্ষা দিলেন। মন ভরে গেল। সেদিন শ্রীশ্রীমার এলাহাবাদ শহরে এক বাড়ীতে (সম্ভবতঃ সত্য গোপাল আশ্রম অ্যালেনগঞ্জ) সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ ছিল। মা আমাদের সবাইকে নিয়ে গেলেন। এর কিছুদিন পর দিল্লী ফিরে এলাম।

কয়েক বৎসর জপ মন্ত্র নিয়ে শুদ্ধভাবে থাকার পর আমাদের দ্বিতীয় মেয়ে রেবার জন্ম হল ১৯৪৬ সনে। পরমাসুন্দরী মেয়ে তার বাবা ঠাকুরমার মত।

রেবার যখন ৫ মাস বয়স। আমার মা দাদামণির কাছে ঢাকার এসেছিলেন। দাদামণি তখন ঢাকার জেলা জজ ছিলেন। সে সময় শ্রীশ্রী মা বেশ কয়েকদিনের জন্য ঢাকা রমণা আশ্রমে এসেছিলেন। মা, দাদামণি ও মণিবউদি প্রায়ই আশ্রমে যেতেন। আমিও রেবাকে নিয়ে ৬/৭ দিনের জন্য দাদামণির বাড়ী রমণাতে গেলাম এবং তাদের সাথে রোজই শ্রীশ্রী মার আশ্রমে যেতাম।

দাদামণির বাড়ী থাকাকালীন আমার বাবার একটা পত্র পেলাম দিল্লী হতে। বাবা লিখেছেন, "রেবাকে শ্রীশ্রী মার চরণে সমর্পণ কর।"

বাবার কথামত রেবাকে শ্রীশ্রী মার পায়ে দিলাম। শ্রীশ্রী মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার আমার কোলে দিলেন এবং বললেন, "তুই পালিস্।"

সেই থেকে মনে হয় শ্রীশ্রী মাই রেবাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর দেওয়া আশীর্ব্বাদী ফুল রেবার বিয়ে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কাছে রাখতাম — তারপর ওকে দিয়ে দিয়েছি।

১৯৪৮ সনের মে মাসে শ্রীশ্রী মার জন্মদিন দিল্লীতে বাবার হনুমান রোডের বাড়ীতে হয়েছিল। সে সময় ভাগ্যক্রমে রেবাকে নিয়ে আমিও দিল্লীতে ছিলাম। প্রায় একমাস শ্রীশ্রী মা

আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তখন তাঁর কত ভক্ত, রাজা মহারাজা, দীনদরিদ্র সবাইকে দেখছি। অনেক সাধু সন্ন্যাসীও এসেছিলেন। সোলন, পাতিয়ালা এবং নাভার মহারাজাদের কথা এখনও মনে আছে।

তখন আমার মেয়ে রেবার ২ বৎসর বয়স। ওকে একদিন খুঁজে পাওয়া গেল না। শ্রীশ্রী মাকে বলা হল। তারপর রেবাকে পাওয়া গেল সামনেই এক বাড়ীতে ছাগল দেখছিল।

শ্রীশ্রী মার জন্মদিনে শ্রীমাকে বেনারসী শাড়ী পরিয়ে মালা ফুল দিয়ে সাজিয়ে ১২০ রকমের ভোগ দেওয়া হোল। রান্না করা ৬০ রকম এবং ফল মিষ্টি ৬০ রকম।

১৯৫৩ সনে আমার মা'র মৃত্যু হয় তারপর হতে আমার বাবা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হন। ১৯৫৪ সালে অক্টোবর মাসে দিল্লী গিয়েছিলাম। সে সময় শ্রীশ্রী মা দিল্লী এসে ২/৩ দিনের জন্য বাবার বাড়ীতে তাঁর জন্য তৈরী বাগানের ঘরে থেকে গেলেন। তখন আমার দিদি শ্রীশ্রী মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — "আমার মার মৃত্যু হবার আগে আপনাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তখন আপনি মুখ ঢেকে মা'র সামনে থেকে চলে গিয়েছিলেন। মা কেন ঐ রকম দেখলেন।

শ্রীশ্রী মা উত্তর দিয়েছিলেন — "তোমার মাকে আমি ঈশারা করেছিলাম — এবার গুটাও। যাবার সময় হয়েছে।"

আনন্দময়ী মা যাবার দিন বাবাকে মার ঘরের সামনে আনা হয়েছিল। মা বাবার সাথে কথা বলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম — "বাবা ভাল হবেন না ?"

মা উত্তর করলেন, "তোমার বাবার সারবার ইচ্ছাত দেখা যায় না। ইচ্ছা হলে সেরে যেতো।"

এই শেষবার শ্রীশ্রী মা দিল্লীতে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন।

এরপর কলকাতা ফেরার সময় বাবাকে আমার সাথে কলকাতা নিয়ে এলাম। আসার সময় দিল্লী স্টেশনেও শ্রীশ্রী মার সাথে দেখা। ঐ ট্রেনেই উনি কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। রেবাকে নিয়ে মাকে প্রণাম করে এলাম।

আমার দাদামণি তখন কলকাতা High Court এর জজ। Invalid chair নিয়ে দাদামণি Howrah Railway Station এ এসেছিলেন। বাবাকে দাদামণির নূতন বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। শ্রীশ্রী মাও আগে এই বাড়ীতে একবার এসেছিলেন।

১৯৬৯ সালে রেবা কৃতিত্বের সাথে M.B.B.S. ডাক্তারী পাশ করল কলকাতা হতে। ১৯৭০ সালে ১৭ই জুন রেবার বিয়ে হল এক ডাক্তারের সাথে, ডা: অমিয় সেনের বড় ছেলে ডা: অমিত সেনের সঙ্গে।

রেবাকে আশীর্ব্বাদ করার জন্য আগেই শ্রীশ্রী মাকে চিঠি দিয়েছিলাম। ওর বিয়ের দিন গুরুপ্রিয়াদেবীর লেখা শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছল। খুবই আনন্দ হ'ল পত্র পেয়ে।

কিন্তু রেবার বাবা Passport পান নি বলে ঢাকা হতে আসতে পারলেন না। এই একটা কষ্ট সকলের মন ভারাক্রান্ত করেছিল।

১৯৭১ সন। Nov.-Dec. মাসে পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধ বেধে ছিল। তারপর থেকে আমার স্বামীর ঢাকা হতে কোন খবর পাচ্ছিলাম না। সংবাদে শোনা যাচ্ছিল ঢাকা শহরে অনেক অনেক বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের পাকিস্তানী সৈন্যরা হত্যা করেছে। তবে কি আমার স্বামীও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন?

সে সময় শ্রীশ্রী মা নিউ আলীপুরে এক বাড়ীতে এসেছিলেন। দুদিন ছিলেন। খবর পেয়ে সেই বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। শ্রীশ্রী মাকে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। আশা ছিল তিনি আমাকে চিনতে পারবেন। কিন্তু তিনি বোধহয় চিনতে পারলেন না। শ্রীশ্রী মাকে আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে ছিল, পারলাম না। তখন আমার মণিবউদি শ্রীশ্রীমাকে বললেন —— সান্ত্বনার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু বলতে পার মা! শ্রীশ্রী মা বিশেষ কিছু বললেন না। তাহলে আমার স্বামী কি আর ইহ-জগতে নেই? আমরা বাড়ী ফিরে এলাম।

২৭ শে আগষ্ট, ১৯৮২ সন। শ্রীশ্রী মা নিজলোকে চলে গেলেন। রেডিও, টিভি ও সংবাদ পত্রে সব জানতে পারলাম। আমার মেয়ে রেবাও ৪ দিনের অশৌচ পালন করল।

আমার দাদা শিশির সেন আর আমি আজও শ্রীশ্রী মার স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছি।

■

শ্রীমুখে শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীজীবন

—শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের জীবন আনন্দময়। এই অমৃতময় জীবনের ফল্গুধারা অজানা থেকে যেত। অনেক অজ্ঞাত বিচিত্র অলৌকিক তথ্য অজ্ঞাত থেকে যেত যদি তাঁর শ্রীমুখ থেকে নিজের পুণ্যজীবন কথা না বেরিয়ে আসত।

"বৈশাখ মাস বৃহস্পতিবার। রাত্রি অবসানের দিক দিয়া এ শরীরটা খেওড়ার এক খড়ের ঘরে তোদের দৃষ্টিতে প্রায় পূর্ব ও উত্তর কোণের দিকে মাথা। শরীর কিন্তু তোদের দেখায় মাটি স্পর্শ মাত্রই চিৎভাবে একটু বামে হেলিয়া যায়। তখনই এই শরীরের ঠাকুরমার আপন খুড়ীমা ধরিয়া তোলেন। কেবল তিনি একমাত্র ঐ সময়তে ঐ ঘরে ছিলেন। আর তো কেউ ছিল না।"

শ্রীশ্রী মায়ের মা এক মেয়ে মারা যাওয়ায় শিশু আনন্দময়ীর যাতে কোনরকম অমঙ্গল না হয় তাই তাকে তুলসী তলায় শুইয়ে রেখে ভগবানের নাম গান করতেন। মা বলছেন, "সর্বদা ভগবানের নাম করিত ও প্রথম দিন হইতেই এই শরীরকে তুলসী তলায় নিয়া দুই বেলা গড়াগড়ি দেওয়াইত। শরীর একটু বড় হইলে নিজেই যাইয়া গড়াগড়ি দিয়া আসিত। রংটা নাকি ধব-ধবে ছিল, তাই মা নাম দিয়াছিলেন, নির্মলা। আনন্দে ঠাকুরমা নাম দিয়া ছিলেন, তীর্থ বাসিনী।"

"আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না, তাই ছোটবেলায় আমাকে আটেলা-বেদিশা বলিত। আমাকে সকলে সোজা-সোজা বলে। একদিন আমি এক কলসী জল নিয়া কাঁখে করিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া মাকে বলিতেছি— মা, তোমরা যে আমাকে সোজা-সোজা বল, এই তো আমি বাঁকা হইয়াছি।"

"যখন প্রথম আমাকে স্কুলে পড়িতে দিল সেই স্কুলের যিনি মাষ্টার তিনি শরীরটার ঠাকুরদাদা হইতেন। একবার আমাকে অ-আ পড়াইয়া দিল। আর কি জানি কেমন করিয়া আমি তাহাতেই শিখিয়া ফেলিলাম। সেই দিনই ক-খ পড়া দিয়া দিল। পরদিন তাহাও শিখিয়া ফেলিলাম। এইভাবেই সব কেমন করিয়া হইয়া যাইত। স্কুলে আমি খুব কমই গিয়াছি। কারণ স্কুল দূরে ছিল।"

অসাধারণ মেধাবী আনন্দময়ী মা নিজের বিদ্যাচর্চার কথা শ্রীমুখে আরো বলেছেন, "একটা তামাশা এই যে আমি পড়িতামও না, কিন্তু মাষ্টারের কাছে পড়া দেওয়ার সময় ঠিক ঠিক হইয়া যাইত। অপরের কাছে আবার তেমন ভাবে পড়িতাম না। একবার একটা কাণ্ড হইল। একটা বই খুলিয়া একটু দেখিয়াই একটা পদ্য মুখস্থ হইয়া গেল। কি করিয়া কি হইত, কিছুই বলিতে পারি না। ইনস্পেকটার আসিয়াছে স্কুল দেখিতে। বই খুলিয়া দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই পদ্যটাই আমাকে বলিতে বলিল। আমি ফট্ ফট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম।"

"তোমাদের কাছে কি বলিব, যেমন আসন মুদ্রাগুলি আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে, তেমনি পড়াগুলি কি নামতাগুলিও সবই ঐভাবে আপনা আপনিই হইয়া গিয়াছে। যিনি শিক্ষক, তিনি স্কুলের নামের জন্য আমাদের চারজন মেয়েকে ক, খ ক্লাস হইতে কয়েক দিনের মধ্যেই নিম্ন প্রাইমারী ক্লাসে তুলিয়া দিলেন। আমি-ত স্কুলে প্রাই যাইতামই না। অনেক দিন পর স্কুলে যাইয়া দেখি মেয়েরা অনেক পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষকটি আমাকে সকলের সমান রাখিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেখানে পড়িতেছে আমাকেও সেই পড়া দিয়া দিল। ভগার ইচ্ছা দেখ, পড়াগুলি ঠিক ঠিক যেন কিভাবে হইয়া যাইত।"

শ্রীশ্রী মা তাঁর বিদ্যাচর্চার আরো তথ্য বলে গেছেন। মা জানিয়েছেন, "আমাকে মা বলিয়া গিয়াছেন যেখানে কমা বা দাঁড়ি আছে, সেখানে গিয়া থামিতে হয়। মার আদেশ, তাই আমি এক নি:শ্বাসে পড়িতে থাকিতাম। যদি মধ্যে স্থানে শ্বাস একটু পড়িয়া যাইত আমি আবার প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিতাম। এক নি:শ্বাসে পড়িয়া অতি কষ্টে শরীর বাঁকাইয়া দাঁড়ির কাছে গিয়া নি:শ্বাস ফেলিতাম। মার যে আদেশ।"

শ্রীশ্রী মা বললেন, "এ শরীরের বাবা প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে হরিনাম করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে একদিন এই শরীর বাবার নিকট শুইয়া আছে। গান শুনিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা বাবা হরি কি? তিনি বলিলেন, হরি ভগবানের নাম। এ শরীর বলিল, আচ্ছা তাঁহার নাম করিলে কি হয়? বাবা বলিলেন, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসেন। এ শরীর বলিল, তিনি আসিয়া কি করেন? বাবা বলিলেন, তোমাকে যদি আমার কোন দরকার হয় তখন তোমাকে ডাকিলে তুমি যেরূপ আস সেইরূপ তিনিও আসেন। যাহার যা ইচ্ছা তাঁহাকে সরল প্রাণে বলিলে তিনি তাহা পূরণ করেন।"

শ্রীশ্রী মা এ ব্যাপারে শিশু বয়সে বাবাকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন, "যেমন এ-শরীর বলিল, তাহাকে হরি বলিয়া ডাকিলেই তিনি আসিবেন? বাবা বলিলেন, হ্যাঁ। এ শরীর বলিল, তিনি কত বড়? বাবা বলিলেন, অনেক বড়। এ শরীর বলিল, ঐ যে মাঠটি আছে তাহাতে ধরিবে না? বাবা বলিলেন, না। তাঁহাকে হরি হরি করিয়া ডাকিলে তিনি আসেন, তখন দেখিবে তিনি কত বড়।"

"এ শরীরের সরল উন্মনা ভাব দেখিয়া সকলেই বোকা-টেলা-বেদিশা বলিত। এই শরীর আবির্ভাব হওয়ার পূর্বেই বাবা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন গেরুয়া বসনও নাকি পরিয়াছিলেন। হরিসংকীর্ত্তনে সময় কাটাইতেন। তাঁর এই বৈরাগ্য ভাবের সময়েই এই শরীরের আবির্ভাব হয়।"

শ্রীশ্রী মা জানিয়েছেন, তাঁর জন্মের সময় তাঁর ঠাকুরমার খুড়ীমা একমাত্র মায়ের কাছে ছিলেন, তিনি তাঁর জন্ম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। "ক'দিন পরের ঘটনা এই শরীরটা সেই সময়েতে যে ঘরে ছিল সেইখানে একদিন দেখা যায় যে ঘরের বাতিটি নিভিবার মত হইল। ঠাকুরমা হরিবোল হরিবোল করিতে লাগিলেন। মা তাড়াতাড়ি এই শরীরকে বিছানা হইতে বুকের ভিতর

লইয়া বাম হাতে চাপিয়া ধরিলেন।"

"ঠাকুরমার খুড়ীমাকে এ শরীর বড়মা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার কয়েকটি গরু ছিল, অনেক দুধ দিত। রোজ মাঠা (ঘোল) করা হইত। যখন ছোট্ট ন্যাংটা অবস্থায় এ শরীর একটা বাসন পেটের উপর চাপিয়া ধরিয়া খুব ভোরে তাহাদের বাড়ী যাইত। মাঠা হইলে তিনি প্রথম এ শরীরকে একটু মাঠা ও মাখন দিতেন। সে সময় এ শরীর খুব সুস্থ ও সবল ছিলত, কেহ কেহ তামাসা করিয়া বলিত 'চালকুমড়ো।"

এই প্রসঙ্গে অমৃতময়ী আনন্দময়ী মা এক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিয়েছেন — "একদিন বাসনটি পেটের উপর রাখিয়া এ শরীর মাঠার জন্য যায়, বড়মা দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, এইমাত্র মাঠা করিতে আরম্ভ করিলাম, আর তিনি নিবার জন্য পূর্ব হইতেই হাজির। নিত্যই মাঠা খায়। মাঠা পাবি না, যা। বিরক্তির ভঙ্গীতে এই কথা বলিলেন। তিনি তখন দেখেন কি তাঁহার মাঠা মন্থনের পাত্রটি ছেঁদা হইয়া সব দই পড়িয়া যাইতেছে। তখন তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, এ কি হইল আবার! সেদিন আর মাঠা হইল না। পাত্রে যাহা ছিল তাহা হইতে তাড়াতাড়ি এ শরীরটাকে ডাকিয়া কিছু দিলেন। তাহার পর হইতে এ শরীরের যাইতে দেরী হইলেও বড়মা ডাকিয়া মাঠা দিতেন।"

শ্রীশ্রী মা শিশু বয়সে অন্য বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মত কোনদিন কোন জিনিষের জন্য আবদার করেন নি। এমন কি ক্ষিদে বলেও কিছু ছিল না। কোন দিন বলেন নি, আমাকে কিছু খাবার দাও, আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে মা বলছেন, "খাওয়া পরা বা অন্যান্য বিষয়ে যখন যেরকম হইত তাহাতে এ শরীরের কোন ওজর আপত্তি ছিল না।"

"পাড়াতে পরিবার জিনিষ মল, চুড়ি ইত্যাদি ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করিতে আসিলে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার কাছে কত আবদার করিত। এ শরীরের সে দিকে খেয়ালও যাইত না। ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া কোন দিন মুখ হইতে বাহির হয় নাই। খাওয়ার সময় এ শরীরকে ডাকিয়া খাওয়াইতে হইত। অপবিত্র খাওয়া কিংবা অনাচার এ শরীরের সহ্য হইত না। এ সব ঘটিলে কোন অসুখ বিসুখ হইয়া পড়িত, তাই এই শরীরের মা খুব সাবধানে রাখিতেন।"

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা বলেছেন, কয়েক বছর ধরে কেউ যদি সত্য কথা বলে, কখনও মিথ্যা কথা না বলে, তাহলে সে হয় সত্যবাক, সে যা বলে তাই ফলে।

"সকলে জানত এ শরীরটা মিথ্যে কথা বলে না। কেউ কোন কথা যাচাই করতে চাইলে ডেকে জিজ্ঞেসা করত আর আমার জবাবই প্রকৃত বলে ধরে নিত।"

(ক্রমশ:)

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা

(দ্বাদশতম প্রকাশ)

—শ্রী প্রতিভা কুমার কুণ্ডু

গোবিন্দের জায়গা গোবিন্দপুরে অপূর্ব্ব লীলা করে মা যাত্রা করলেন। মায়ের গাড়ী ভাঁসাগ্রামে চলে গেল।

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা সত্য, চৈতন্য, আনন্দ ও প্রাণ। আমরা সকলেই শ্রীশ্রী মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি জ্ঞান, কর্মপ্রেরণা, ভক্তি, বিশ্বাস, সত্যসাধনা, আনন্দ, আধ্যাত্মিক চৈতন্য, স্নেহ, মমতা, কৃপা, করুণা, নিরাসক্তি, বৈরাগ্য ও আরও কত সাত্ত্বিক গুণ। আমাদের যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। মাতৃকৃপাপ্রদত্ত ঐরূপ অশেষ গুণাবলী আমরা যেভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব, আমরা তেমন তেমন ফললাভ করব বা করেছি।

১৯৯২ সনে আমেরিকার ক্যান্সাস সিটির হিন্দু মন্দিরে ১৩ই ও ১৪ই জুন নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অম্বুবাচী প্রবৃত্তির আগের সপ্তাহে। এবারও এই ১৯৯৭ সনে আমেরিকার কলোরেডো প্রদেশের ডেন্ভার শহরে ইস্কনের মন্দিরে শুভ নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোল ১৪ই ও ১৫ই জুন। অম্বুবাচী প্রবৃত্তির এক সপ্তাহ আগে।

বড় পুত্র রাজা ও বড় কন্যা ঊর্মি এই বছরের জানুয়ারী মাস থেকেই পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল, যাতে পদ্মা ও আমি আমেরিকায় যাই ও ওদের কাছে কিছুদিন থেকে আসি এবং আমাদের দুজনের যাতায়াত খরচ ওরাই বহন করবে। যথারীতি আমি একটাই শর্ত আরোপ করলাম, যদি কোথাও নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করা যায়, তবেই হতে পারে, নাহলে নয়। মাতৃকৃপায় সে-ব্যবস্থাটুকুও হয়ে গেল, খুব সহজেই। যোগাযোগ হতেই ডেন্ভারের ইস্কনের অধিকর্তা অপূর্ব্ব ও তাঁর স্ত্রী কমলিনী এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন ওদের মন্দিরে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান করাতে। যদিও নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানটি কি সে সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। ওঁরা দুজনেই আমেরিকান। আরও দশজন আমেরিকান ওখানে থাকে।

আমরা বরাবরই দেখে আসছি, কোনো সৎকাজে সঙ্কল্পটি যদি সৎ ও শুভ হয়, তাহলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ সৎকাজ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণে মায়ের কৃপাবারি বর্ষিত হয়। মাতৃসহায় আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ। যাত্রার অনেক আগে থেকেই শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা ও করুণা অনুভব করছিলাম। আমেরিকা, ক্যানাডা ও ইওরোপের অনেক দেশ আজকাল সহজে ভিসা দিতে চায় না। আমাদের নয়টি দেশের ভিসা পেতে তেমন কোনো অসুবিধে হোল না। একটি বিশেষ বিমান কোম্পানী আমাদের এয়ারটিকেটে বহু টাকা ছাড় দিল। এরূপ ছোটোখাটো অলৌকিক অথবা বুদ্ধির অগম্য ঘটনা অনেক ঘটেছে।

ঊর্মি ১৯৯২ সনের নামযজ্ঞের ভিডিও ক্যাসেট ও আমাদের শুভ নামযজ্ঞের একটা অডিও ক্যাসেট ডেন্‌ভারের ইস্‌কন মন্দিরে আগেই পাঠিয়েছিল। ওখানকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জি ও তাঁর পরিবার বর্গ ঐ ক্যাসেট দুটো বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে প্রায় দিন পনের আগে থেকেই রিহার্সাল ও দোঁহার দিচ্ছিলেন। ওঁদেরকে আমরা চিনি না বা কোনোদিন ওঁদের নামও শুনিনি। কিন্তু অলক্ষ্যে নামযজ্ঞের ব্যবস্থা যাঁর করাবার, তিনি তো করেই যাচ্ছেন। বিজয়বাবুর গানের গলা ভালো এবং ওনার স্ত্রীর ও শ্যালিকার গলাও ভালো।

১৩ই জুন শুক্রবার বিজয়বাবু আমাদের সবাইকে নিয়ে ওনার বাড়ীতে রাখলেন। ওদের ঠাকুরঘরটি চমৎকার। ওখানে গান ও কীর্ত্তন করলাম। ওদের আদরে ও আতিথেয়তায় আমরা খুবই সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

ডেন্‌ভার ইস্‌কনের একটি ছেলে, নাম প্যাট ও তার দুইজন সঙ্গী খুব ভালো খোল বাজাতে পারে ও নামও করতে পারে। প্যাট নামযজ্ঞের সম্পূর্ণ সময়টাই খোল বাজিয়ে ছিল। বাংলা ভাষা অল্প স্বল্প বুঝতে পারে। ছেলেটির ভাব খুবই উচ্চস্তরের।

১৪ই জুন শনিবার বিজয়বাবু আমাদের আবার ইস্‌কন মন্দিরে নিয়ে এলেন। ইস্‌কনের নিজস্ব গোবিন্দর রেস্টুরেন্ট আছে। সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার পাওয়া যায় ও হার্বাল চা পাওয়া যায়। আমরা সকলেই তিনবেলা চারবেলা ওখানেই খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ কোনো টাকা পয়সা নেন নি। শনিবার ও রবিবার যত ভক্ত এসেছিলেন, সবাই ওখানে খাওয়া দাওয়া করেছেন, কাউকেই টাকা পয়সা দিতে হয়নি। শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে ব্যবস্থা সবই স্বয়ং সম্পূর্ণ। আমাদের কোনো কিছুই করতে হচ্ছে না।

প্লাইউডের বাক্স দিয়ে তিন থাকের মঞ্চ অমর রাজা রথী সারথি ও ঊর্মি দুঘণ্টার মধ্যে বানিয়ে ফেলল। অতিশয় সুদৃশ্য হয়েছিল মঞ্চটি।

নামযজ্ঞের অধিবাসের শুরুতে আজকাল সঙ্কল্প করাই, "যা হয়ে যায়।" যদি নাম ভঙ্গ হয়ে যায়, যাবে। যদি কোনো অনিবার্য্য কারণে আগেই শেষ করে দিতে হয়, শেষ করে দেব। পূর্ব্বেই সেইমত সঙ্কল্প করা থাকলে কোনো কিছুই দোষনীয় হবে না।

এইবারের নামযজ্ঞে আমরা বাতাসা, সুন্দর আম্রপল্লব ও আস্ত বোঁটাশুদ্ধ পান পেয়েছিলাম। আর তো সমস্ত কিছুর জোগাড় আমাদের ছিলই! এমন কি শুকনো গোবর ও গঙ্গাজল পর্য্যন্ত। মন্দিরের অধিকর্ত্তা অপূর্ব্ব অধিবাসের মিষ্টি নিজে তৈরি করে দিলেন, চমৎকার ভারতীয় মিষ্টির মত। স্বাদেও হয়েছিল অতি সুস্বাদু।

ভালো হোক, মন্দ হোক, অধিবাসের গান গেয়ে ছিলাম। আমেরিকায়, মায়ের কোনো আশ্রমে নয়, শ্রীপ্রভুপাদের ইস্‌কন মন্দিরে খাস আমেরিকান সাহেব মেমদের নিয়ে বিনা খরচায় বা নামমাত্র খরচায় এই বিরাট নামযজ্ঞ করার সঙ্কল্প করাটাই তো অতি বড় ধৃষ্টতা। তবে যেখানে

মাতৃসহায় বড় আশ্রয়, বিশেষ অবলম্বন, সেখানে আমাদের দুশ্চিন্তা মূল্যহীন। মায়ের কৃপায় যা হয়ে যায় সেটাই ভালো।

সকালে ওদের নিজস্ব পাঠপূজার কার্য্যক্রম থাকে। সেইজন্য রবিবার আমরা ভোর ছটায় আরতি করে নাম ধরলাম খুব আস্তে আস্তে, অর্থাৎ খুব নীচু গলায়, প্রায় মনে মনে। সকাল দশটা পর্য্যন্ত। বেলা দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্য্যন্ত মন্দিরের ভক্তবৃন্দ নাম রক্ষা করল। দুপুর বারোটার মধ্যে শ্রীশ্রী মা, শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজী, পঞ্চ গোঁসাই, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রী প্রভুপাদের দ্বিপ্রহরের ভোগ নিবেদন করা হোল। মালসা ভোগ, ফল, মিষ্টি।

দুএকটি কথা বলতে ভুলে গেছি। শনিবার অধিবাসের গান গেয়ে নিজেই তৃপ্ত হচ্ছিলাম। নিজের গান শুনেই। 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম এই মহা মন্ত্রনাম, গুণ গায় দাস বৃন্দাবন' এই পদটা চারবার পাঁচবার গাইছিলাম, আর ভাবছিলাম, এই সময় শঙ্খধ্বনি হলে খুবই ভালো হোত। মন্দিরের বিগ্রহের সামনে পর্দা দেওয়া ছিল। ঠিক সেই সময় পর্দা সরিয়ে পূজারী শঙ্খহাতে বেরোলেন এবং ঊর্দ্ধমুখ হয়ে খুব জোরে জোরে তিনবার অপূর্ব্ব শঙ্খধ্বনি করলেন। আনন্দে শিহরণে আপ্লুত হয়ে গেলাম।

মন্দিরের বিগ্রহাদির মূর্ত্তি এবং সাজ-সজ্জা অতীব মনোরম। গৌর নিতাই এর মূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মূর্ত্তি। রবিবার ভোরবেলা মন্দিরের একজন মেম বৈষ্ণবী ঊর্মির কাছে ফল চাইতে এলো। মন্দিরে ভুলবশত: কোনো ফল রাখেনি। ঊর্মি নামযজ্ঞের ফলের থেকে একটা তরমুজ ও কয়েকটা কলা তার হাতে দিল। বলবার উদ্দেশ্য, আমরাও মন্দিরে কোনো ফল মিষ্টি দিইনি। ঠাকুর তাঁর নিজেরটা নিজেই চেয়ে নিলেন। এই ঘটনাটি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক, তা বলে বোঝানো যাবে না। শ্রীশ্রী মা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই বলতেন, "ঠাকুর জানান দিলেন।" আমরা ঐ তরমুজ কলা ইত্যাদি প্রসাদ পেলাম।

আরও একটি ছোট্ট ঘটনা বলতে ভুলে গেছি। মঞ্চে এইবার উপরে গোপালের ছবি দেওয়া হয়েছিল। রবিবার ভোরবেলা মঞ্চে যথারীতি লবণছাড়া মাখন ও নকুলদানা দেওয়া হয়েছিল। ভোগের পর প্রসাদ হিসেবে ঐ মাখন নকুলদানা মন্দিরের সকলের হাতে দেওয়া হোল। তাঁদেরকে মঞ্চের গোপালের ছবি দেখানো হোল ও বাল্যভোগের তাৎপর্য্য বোঝানো হোল। এবং ঐ সুস্বাদু মাখন নকুলদানা নিমেষে নি:শোষিত হোল। এরকম বাল্যভোগ এরা আগে কখনো দেখেননি। রবিবার দুপুরে মন্দির কতৃপক্ষ ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করলেন। সমস্ত রান্না অপূর্ব্ব একলাই করলেন। এমন কি লুচি পর্য্যন্ত করলেন। সত্যিই ওদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অতুলনীয়।

সন্ধ্যা ছটায় মন্দিরের দৈনন্দিন কার্য্যক্রম আছে। বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় নামযজ্ঞ শেষ করে দেওয়ার কথা। তিনটের সময় নগর ভ্রমণে বেরোলাম। মন্দিরের সকলেই বেরোলেন। আমরা তো ছিলামই। বিজয় ব্যানার্জির পরিবারবর্গও ছিলেন। মন্দিরের বৈষ্ণবী মেমরা তিন কিলোমিটার নগর পরিক্রমা করলেন। বড় রাস্তায় হুশ্ হুশ্ করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে গাড়ী চলছে,

তাতে তাঁদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রাস্তায় করতাল বাজিয়ে নাম করাতে কোনো লাজলজ্জাও নেই। সহজ সরল স্বাভাবিক সুন্দর একটি ভাব। অনেক দিন এ দৃশ্য মনে থাকবে।

রবিবার রাত সাড়ে আটটায় অপূর্ব্ব আমাদের সম্মানে ভাষণ দিলেন। আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, এ-রকম নামযজ্ঞ ওঁরা কখনো দেখেননি, ওঁদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে, আমরা আবার কবে আসব, আবার কবে নামযজ্ঞ হবে, ইত্যাদি। পরদিন সোমবার আমরা রওনা হয়ে চলে আসব। বৈষ্ণবী কমলিনী পদ্মাকে সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করলেন। মন্দিরের পর্দা বন্ধ ছিল, পদ্মা দুঃখ করল, ঠাকুর প্রণাম হোল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি আমেরিকান ছোট ছেলে দৌড়ে এসে পদ্মার হাতে দিল রাধাকৃষ্ণের একটি বড় ও একটি ছোট ছবি। ঠাকুর আবার "জানান" দিলেন। শুভ নামযজ্ঞে ইশ্বর-কৃপা পাওয়া যায়ই এবং যাবেও।

দুমাসের প্রবাসে আমার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল সৎসঙ্গ করা ও নাম করা। শ্রীশ্রী মায়ের অশেষ করুণায় সেই সঙ্কল্প সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। শুভ সূচনা নামযজ্ঞ দিয়ে হোল। এরপর রাজা ঊর্মির দুজনের বাড়ীতেই আমরা হনুমান চালিসা করলাম। গুড় ও ছোলাভাজাও পাওয়া গেল। ৪ঠা জুলাই অমর ক্যান্‌সাস সিটির হিন্দুমন্দিরে কৃষ্ণপূজা করাল ও প্রায় একশ জনকে দুপুরে অন্নপ্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করল। দক্ষিণ ভারতীয় পূজারীর ভাবটি একেবারে নিজস্ব ও অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। এক মিনিটও আসনে বসে পূজা করলেন না। প্রত্যেক বিগ্রহের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করলেন। গোপালের ও শিবের অভিষেক করলেন দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু দিয়ে। আরতির আগে থালাভর্ত্তি ফুল নিয়ে প্রত্যেকের সামনে গিয়ে নাম ও গোত্র বলালেন। একশজনের হয়ে উনি নটি বিগ্রহের সুন্দর আরতি করলেন। আরতির সময় টেপ বাজানোর নিয়ম ভঙ্গ করে আমি আরতির গান করলাম। তারপর আরও কয়েকটি গান করে হরে কৃষ্ণ নাম, হরি বোল ও প্রণাম মন্ত্র করলাম। সকলেই খুব আনন্দ পেল। এইবার এখানে যে নামযজ্ঞ হোল না, তাঁদের মনের সেই ক্ষোভ দূর হোল। আমার তো অসীম আনন্দ। প্রবাসে ঠাকুরের সামনে একশজনকে নিয়ে সৎসঙ্গ ও কীর্ত্তন।

ইওরোপে, আমস্‌টার্ডামে, জুরিখে, ইটালীর বেরগামোতে ইস্‌কনের মন্দিরে নাম করেছি ও প্রসাদ পেয়েছি। যেখানেই গেছি সেখানেই যথেষ্ট আদর যত্ন পেলাম। ইটালীর অসিসি শহর থেকে বারো কিলোমিটার দূরে সান প্রেস্তোতে শ্রী সত্যানন্দের (সুশীলদা) সাধনা আশ্রমে দুদিন ছিলাম। রাত্রে একঘন্টা ধ্যান ও আধঘন্টা আরতি হোত। সাধনা আশ্রমে, সেন্ট ফ্রান্সিসের, শ্রীশ্রীমায়ের, যীশুর, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। একশ বাইশ একর জমি নিয়ে ফলে ফুলে সুশোভিত পারিজাত কানন সদৃশ।

এরপর দক্ষিণ ফ্রান্সে ভূমধ্য সাগরের তীরে নীস্ শহরে দুদিন ছিলাম কুমারী এলিজাবেথ ফন্তানার বাড়ীতে। ওঁর ঠাকুর ঘর কি অপূর্ব্ব! রামকৃষ্ণদেব ও সারদা মায়ের ছবি। ধূপকাঠি জ্বলছে। অখণ্ড প্রদীপ জ্বলছে। দেওয়ালে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের ছবি। মাকে উনি দেখেন

নি, কিন্তু নানাসময়ে মায়ের কথা অনেক শুনেছেন এবং মায়ের সম্বন্ধে বইপত্র পড়াশোনা করেছেন। এত দূরদেশে এসেও শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতি উপলব্ধি করে স্বভাবতই আবেগে আপ্লুত হলাম।

নীসেও শিবানন্দ গিরিজীর ভক্তবৃন্দ প্রতি শুক্রবার সৎসঙ্গ করেন। এমনই ঘটনাচক্র, বৃহস্পতিবারে আমরা এলাম, পরদিনই সৎসঙ্গ। ঐ সৎসঙ্গে আমরা সাদরে আমন্ত্রিত ছিলাম। ঐ ভক্তবৃন্দের মধ্যে দুজন মায়ের সম্বন্ধে জানেন এবং কন্‌খলের জ্যোতিপীঠ দেখেছেন। ভজন ও কীর্ত্তন করলাম। পরে মায়ের বিষয়ে ওঁরা প্রশ্ন করলেন, বাদশা ও আমি যথাসাধ্য উত্তর দিলাম। চমৎকার সৎসঙ্গ হোল। পরে আমাদের সম্মানে রাত্রের প্রসাদ গ্রহণ। পরদিনই আমরা চলে যাবো শুনে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন।

পরদিন সকালে এলিজাবেথ ফন্তানার কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিলাম। মাত্র দুদিনের বন্ধন। উনি বললেন, ‘মনে হচ্ছে, স্বয়ং মা এসে চলে যাচ্ছেন। আপনারা এসেছেন, গোটা নীস্ শহর ধন্য।” এই সব কথার পর চোখের জল বাধা মানে না।

এইবারের মত প্রবাসকথার এইখানেই ইতি। পরের বার ধবলচীনার নামযজ্ঞের কথা শোনাবার ইচ্ছে রইল।

(ক্রমশঃ)

■

আশ্রম সংবাদ

১. রায়পুর আশ্রম (দেরাদুন) —

শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ কৃপায় এবং স্থানীয় মাতৃভক্ত শ্রী বি.পী. সিংহজীর সহযোগিতায় রায়পুর আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে গত ২০শে এপ্রিল, ১৯৯৭ শ্রী হনুমানজীর একটি অতি সুন্দর মর্ম্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কাজ দুইজন বিদ্বান বৈদিক পণ্ডিতের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নগর পরিক্রমায় কুমারী কন্যারা হাতে মঙ্গলকলস ও প্রদীপ নিয়ে সম্মিলিত হয়। সমবেত কীর্তন ও ভজন ইত্যাদিও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ভাণ্ডারাতে প্রায় ১৫০০ জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই উৎসবে স্বামী ভাস্করানন্দজী, ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দজী, স্বামী ভূমানন্দজী এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। আশ্রমের মূখ্য ভবন, শিব মন্দির ও তপালয় প্রভৃতির জীর্ণোদ্ধারের পর আবার নতুন করে নির্মাণ ও চুনকাম ইত্যাদি করায় ও আশ্রমের চতুর্দিকের স্বচ্ছতায় আশ্রমের রমণীয় শোভা সকলকে আকৃষ্ট করে।

শ্রীশ্রী মায়ের স্থূলরূপে অন্তর্ধানের পর রায়পুর আশ্রমে এই প্রথম বড় করে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২. রাজগীর ও পাট্না —

পাটনা হতে শ্রীমতী চিন্ময়ী দাশগুপ্তা লিখে জানিয়েছেন যে শ্রীশ্রী মার ১০১ তম জন্মোৎসব মা আনন্দময়ী আশ্রম, রাজগীর দ্বারা যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সহ ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

যেহেতু অধিকাংশ সক্রিয় ভক্তবৃন্দ পাটনা-নিবাসী, তাই ২রা মে, ১৯৯৭ হাথুয়া হাউসে শ্রীশ্রী মা যে ঘরে ১৯৭৬ এবং ১৯৮১তে পাটনাতে এসে বাস করে গেছেন এবং যে ঘর এখন সৎসঙ্গ হল রূপেই ব্যবহৃত হয়, সেই মাতৃপদরজপূত স্থানে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অর্চনা, কীর্তন, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়ে মাতৃনাম কীর্তন করেন। সকলকে প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

মা আনন্দময়ী আশ্রম, রাজগীরের তত্ত্বাবধানে এবং সন্ত কোলম্বাস স্কুল, পাটনার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পাটনার প্রায় ৩০টি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রী মায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরী (Quiz) প্রতিযোগিতা, শ্রীশ্রী মার চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা এবং ভক্তিসংগীত ও ভজনের প্রতিযোগিতা ১০ই মে রাখা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কালিদাস রঙ্গালয়ের রঙ্গমঞ্চে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত বালক বালিকাদের বিশেষ পুরস্কারের

দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। সকল প্রতিযোগিকে প্রমাণপত্র দেওয়া হয়। মোট ১৮টি পুরস্কার রাখা হয়েছিল। পুরস্কারে প্রমাণপত্র, আশ্রমের নাম অঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, শ্রীশ্রী মার সম্বন্ধে পুস্তক ও আশ্রমে নিত্য অনুষ্ঠিত স্তবস্তুতি প্রভৃতির পুস্তক দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলেন শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ, শ্রীমতী চিন্ময়ী দাশগুপ্তা প্রভৃতি। ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দজীর আর্থিক সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটি অনবদ্য হয়ে ওঠে।

২৪শে মে, ১৯৯৭ রাজগীর আশ্রমে অখণ্ড রামায়ণ পাঠ আরম্ভ হয়। পরদিন সন্ধ্যায় রামায়ণ পাঠ শেষ হয়। ২৫শে মে রাত ৩টা থেকে শ্রীশ্রী মার ১০১তম জন্মোৎসব পূজা, আরাধনা, ভোগ, আরতি, হোম ইত্যাদি ২৬শে মে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চলে। পরদিন ভাণ্ডারা হয়। সমবেত ভক্ত ও স্থানীয় আশ্রমের সাধু মহাত্মারা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তি ভাবধারার স্রোত সারা রাজগীরে প্রবাহিত হয়।

৩. তারাপীঠ —

বিলম্বে প্রাপ্ত সূচনায় জানা গেছে যে শক্তি সাধনার কেন্দ্র তারাপীঠেও শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ২৫শে মে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মতিথি পূজা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে ভাগবত পাঠ, দুই দিন ব্যাপী তারকব্রহ্ম নাম, মাতৃ প্রসঙ্গ আলোচনা, সাধু ভাণ্ডারা, কুমারী পূজা, যজ্ঞ ও জন জর্নাদনের সেবা এবং স্থানীয় মন্দিরের পূজা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শতাধিক মাতৃভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৯শে ও ২০শে জুলাই তারাপীঠ আশ্রমে গুরু পূর্ণিমা পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে জুলাই অধিবাস এবং ২০শে জুলাই শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, যজ্ঞ, ভাগবত পাঠ, নামযজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

৪. পুণা —

শ্রীশ্রী মায়ের পুণা আশ্রমেও গত ২০শে জুলাই গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা হয় এবং ভক্তদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মোরভী রাজপরিবারের শ্রী ময়ূর ট্রাস্টের পক্ষ হতে এবার এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

৫. কনখল

কনখলে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ২০শে জুলাই গুরুপূর্ণিমার পবিত্র পর্বে শ্রীশ্রী গুরু পূজা বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সাধু ভাণ্ডারা, ভজন, কীর্তন, পাঠ প্রভৃতি হয়েছিল।

১০ই আগষ্ট শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজী মহারাজের নির্ব্বাণ তিথি সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে গুরু পূজা, সাধু ভাণ্ডারা প্রভৃতি হয়। ১৫ই আগষ্ট ভাইজীর তিরোধান তিথি পূজা হয়।

আগামী ৮ই অক্টোবর হতে ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কনখল আশ্রমে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

৬. বারাণসী —

কাশী আশ্রমে গত ২০শে জুলাই গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী আনন্দজ্যোতির্মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা ও দিদিমার মন্দিরে শ্রীশ্রী গুরু পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

১০ই আগষ্ট শ্রী গিরিজীর নির্ব্বাণ তিথি উপলক্ষ্যে পূজা বিশেষ রূপে অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে ১৪ই আগষ্ট রাত বারোটায় ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকার পাদমূলে ৫০টি মোমবাতি জ্বালানো হয় এবং শঙ্খ, কাঁসর, ঘন্টা বাজানো হয়।

১৫ই আগষ্ট কাশীর মহারাজকুমারীরা পতাকা উত্তোলন করতে আসেন। এই উপলক্ষ্যে কন্যাপীঠের কন্যারা স্বদেশী গান ও বিভিন্ন কার্য্যক্রমের প্রদর্শন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মহারাজকুমারীও এতে অংশগ্রহণ করেন।

মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালেও স্থানীয় বিধায়ক শ্রী শ্যামদেব রায় চৌধুরী পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষ্যে হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়। আমেরিকাবাসী শ্রীশ্রী মায়ের কোনও অনুরাগী ভক্তের আগ্রহে ৫০টি গরীব বাচ্চাদের বস্ত্র, লাড্ডু ও ভোজন এবং ৫০ জন দরিদ্রনারায়ণকে চাদর ও দক্ষিণাসহ ভোজন দেওয়া হয়। স্বর্ণজয়ন্তীর উৎসবটিকে চিরস্মরণীয় করার জন্য হাসপাতাল পরিসরে ২০টি বৃক্ষরোপণও করা হয়।

১৪ই আগষ্ট হতে ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আনন্দজ্যোতির্মন্দিরে ঝুলনোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী গোপালজীকে প্রতি সন্ধ্যায় ঝোলানো হয়। বিশেষ পূজাও কীর্তন হয়।

১৫ই আগষ্ট ভাইজীর তিরোধান তিথি উৎসব হয়। ১৭ই আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে শ্রীশ্রী মায়ের স্বয়ং দীক্ষার প্রকাশ উপলক্ষ্যে ধ্যান ও কীর্ত্তন হয়।

২৫ শে আগষ্ট শ্রীশ্রী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষ্যে রাত্রিতে শ্রীশ্রী গোপালজীর মহা অভিষেক, শৃঙ্গার ও ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর হতে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মত এবারও ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। আয়োজক ছিলেন শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট

ভক্ত শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী ও আরো কয়েকজন মাতৃভক্ত। এবার ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জ্জী।

৭. বৃন্দাবন —

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ৬ই আগষ্ট হতে ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ এবং ছলিয়াজীর ঝুলনোৎসব এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে রাসলীলা, ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রী ছলিয়াজী ও শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণজীর ষোড়শোপচারে পূজা এবং ২৫শে আগষ্ট জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রী শ্রী ছলিয়া ও শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের এবং শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর হতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী রুদ্রদেবানন্দজী সুললিত সুমধুর বাণীর দ্বারা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।

উৎসব-সূচী

১. শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা	—	৭ই-১১ই অক্টোবর, ১৯৯৭
২. শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা	—	১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৭
৩. শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা ও অন্নকূট উৎসব	—	৩০শে এবং ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৭
৪. সংযম সপ্তাহ	—	৭ই-১৩ই নভেম্বর, ১৯৯৭

শোক-সংবাদ

১. শ্রীমতী ভক্তি সিকদার—

আমরা অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে জানাচ্ছি যে দিল্লী প্রবাসী একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত শ্রীমতী ভক্তি সিকদার প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ সনে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে চির আশ্রয় লাভ করেছেন।

তাঁর পরলোক গমনের সূচনা যথাসময়ে পত্রিকার কার্য্যালয়ে উপলব্ধ না হওয়ার জন্য ইতিপূর্বে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা সম্ভব হয়নি সেজন্য পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী বিশেষ দু:খিত।

১৯৭১ সালে তিনি প্রথম শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন লাভ করেন এবং পরের বছর শ্রীশ্রী মার আশ্রয় লাভে ধন্য হন। তারপর থেকে ধ্যান, জপ, সৎসঙ্গেই তিনি বেশী সময় অতিবাহিত করতেন। তাঁর মত ধর্মপরায়ণা, সত্যবাদী, নির্লোভ, স্বার্থহীন, পরোপকারী ও বিনয়ী মহিলা খুবই বিরল। তাঁর লেখা গ্রন্থ 'আমার জীবনে কৃপাময়ী মা' ভক্তসমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছে। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

২. শ্রীরামানন্দ শাস্ত্রীজী—

শ্রীশ্রী মায়ের তারাপীঠস্থিত আশ্রমের একনিষ্ঠ প্রাচীন সেবক শ্রীরামানন্দ শাস্ত্রী গত ৫ই জুন, ১৯৯৭ ভোর বেলা অতি শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রী মায়ের পাদপদ্মে চির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শোভাযাত্রা সহযোগে তারাপীঠস্থ উপস্থিত সাধু-সন্ত ও পরিচয়বৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সুসম্পূর্ণ হয়েছে। দীর্ঘ ৪০ বছরের অধিক তারাপীঠস্থ শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে শিব মন্দিরে পূজা পাঠে তিনি ব্রতী ছিলেন। ৯৫ বছর বয়সে পণ্ডিতজীর পরলোক গমনে আমরা এক বিশিষ্ট মায়ের সেবককে হারালাম। গত ৪০ বছরের অধিক কাল তিনি একদিনের জন্যও আশ্রমের বাইরে যান নি।

আমরা তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

৩. শ্রী হৃষিকেশ ঘোষ—

কলিকাতা নিবাসী পুরাতন মাতৃভক্ত শ্রী হৃষিকেশ ঘোষ গত ২৭শে জুন, ১৯৯৭ ৮২ বছর বয়সে সজ্ঞানে তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেছেন। ১৯৫৭ সনে তিনি তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী গোপা ঘোষ সহ বারাণসী আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা লাভ করেন। তিনি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের আজীবন সদস্য ছিলেন।

প্রার্থনা করি তাঁর স্বর্গত আত্মা চির শান্তিলাভ করুক এবং পরিবার বর্গের জীবনে শান্তি

নেমে আসুক।

৪. শ্রীমতী গৌরী মুখোপাধ্যায় —

শ্রীশ্রী মায়ের অতি প্রাচীন ভক্ত শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা এবং ৺হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী গৌরী মুখোপাধ্যায় ৯ই আগষ্ট, ১৯৯৭ শ্রীশ্রী মায়ের চরণে চির লীন হয়েছেন।

গৌরীদির শ্রীশ্রী মায়ের চরণে একনিষ্ট ভক্তি ছিল। গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও স্বামী, পুত্র, কন্যা থাকা সত্ত্বেও মায়ের আকর্ষণের টানে যেখানেই মায়ের উৎসব হত তিনি সব ফেলে মায়ের কাছে ছুটে চলে আসতেন।

স্বামীর দেহরক্ষার পর তিনি প্রতি বছর কয়েক মাসের জন্য কাশীতে চলে আসতেন। কন্যাপীঠের কন্যাদের খুবই স্নেহ করতেন। প্রতিবছর কাশীতে আসার জন্য কাশী আশ্রম ও কন্যাপীঠের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমরা তাঁর আত্মার অখণ্ড সুখ ও পরম শান্তি কামনা করি।

৫. শ্রীমতী নিরূপমা দেবী (মরণীদি) —

বাবা ভোলানাথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রী সীতানাথ কুশারী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রী মঙ্গলচন্দ্র কুশারী মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা আশ্রমবাসিনী মরণীদি ১০ই আগষ্ট কনখলে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে সজ্ঞানে মায়ের চরণে চিরশান্তি লাভ করেন।

দুইটি সন্তান আগে মারা যাওয়ায় তৃতীয় কন্যাটিকে তাঁর মা শ্রীশ্রী মায়ের চরণে অর্পণ করে দেন। মেয়েটির নাম রাখেন 'মরণী'। মরণীদি দুই বছর বয়েসেই মায়ের চরণে আশ্রয় লাভ করেন। ভোলানাথ মরণীদিকে কন্যারূপে বিশেষ স্নেহ করতেন। মরণীদিকে মা আর পিত্রালয়ে যেতে দেন নি।

১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসে মরণীদির বিবাহের পূর্বে বাবা ভোলানাথ মরণীদিকে দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করেন। মরণীদির পিতা মাতা এবং যাঁর সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয়েছিল, মাতৃভক্ত শ্রী কুলদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের গোত্র একই ছিল। তাই ভোলানাথ মরণীদিকে দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রী মা বলেন, "যার সঙ্গে যার নির্দিষ্ট আছে তা হবেই।"

বিবাহের পূর্বে তারাপীঠে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির সঙ্গে মরণীদিরও পৈতা হয়। পৈতার পর পাঁচদিনের দিন তারাপীঠে পবিত্র তীর্থে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে শ্রী কুলদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণ কিশোরের সঙ্গে মরণীদির বিবাহ হয়। বাবা ভোলানাথ স্বয়ং কন্যা দান করেন।

মরণীদি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেও মায়ের আদেশে প্রাচীন ঋষি পরম্পরায় প্রতিদিন যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি প্রদান প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতেন। বাড়ীতে অখণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল।

মরণীদির স্বামীর পরলোক গমনের পর শ্রীশ্রী মায়ের আদেশে প্রায় ৩০ বছরের উপর তিনি আশ্রমেই বাস করেন। কনখল আশ্রমে মরণীদি সর্ব্বদা হাসিমুখে সকলকে আদর করে পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

মাতৃভক্তদের হৃদয়ে সেবা পরায়ণা মরণীদি চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকবেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

৬. শ্রীমতী শিবানী সেনগুপ্ত —

কলিকাতাবাসী শ্রীশ্রী মায়ের ভক্ত শ্রী রবীন সেনগুপ্তের স্ত্রী শ্রীমতী শিবানী সেনগুপ্তা ৫৮ বছর বয়সে ২৬শে আগষ্ট সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কলিকাতাবাসী ভক্ত সমাজে শিবানীদি সকলেরই বিশেষ প্রিয় ছিলেন। শ্রীশ্রী মায়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁরা উভয়ে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থানে খেওড়াতে অনুষ্ঠিত আবির্ভাব মহোৎসবেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি এবং তাঁর পরিবারজনেরা সান্ত্বনা লাভ করুক মায়ের চরণে এই প্রার্থনাই জানাই।

আবশ্যক সূচনা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ একটি আবাসীয় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কন্যাপীঠের কন্যাদের দেখাশুনার জন্য আধ্যাত্মিক রুচি সম্পন্না ও সেবা পরায়ণা শিক্ষিতা মহিলা আবশ্যক যাঁহারা কন্যাপীঠের আদর্শ গ্রহণ করিয়া শিক্ষারতা বালব্রহ্মচারিণীদের সর্বপ্রকার সেবাভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আশ্রমোপযোগী আবাস এবং নি:শুল্ক ভোজনের ব্যবস্থার সহিত ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসারে ন্যূনতম মাসিক হাত খরচার ও সুবিধা থাকিবে।

অবিবাহিতা এবং সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক বন্ধনমুক্ত মহিলাদের প্রাথমিকতা দেওয়া হইবে।

উপর্য্যুক্ত সেবাকার্য্যে ইচ্ছুক মহিলারা অথবা তাঁহাদের অভিভাবকেরা সম্পূর্ণ বিবরণ সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে সম্পর্ক স্থাপন করুন —

সচিব
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ
ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১০০১

"হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।।"

—শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

- শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নামযজ্ঞের ক্যাসেট নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ :
  - শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
  - শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
  - মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা
- শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত দ্বিতীয় ক্যাসেট "আনন্দ সংগীত" প্রকাশনার প্রাক্‌পর্বে আছে। গায়ক — শ্রী জয়ন্ত পাঠক।

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, Maharashtra.

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth,
Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P.

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 310054+311794)

23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, U.P.

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●